মাসুদ রানা

সেই উ সেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

সেই উ সেন

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেই উ সেন-১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭৯

এক

প্যারিস। হোটেল হিলটন।

আগস্ট মাসের বাইশ তারিখ। পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছাকাছি নেমে ইতস্তত করছে প্রকাণ্ড সূর্যটা। সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

লম্বা কালো ঝকঝকে একটা সিট্রন ডি-এস নাইনটিন গ্যারেজ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। থামল রিসেপশন হলের দরজার সামনে। তরতর করে সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে নেমে এল একজন পোর্টার। গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কেতা দুরস্ত ভঙ্গিতে একটু ঝুঁকল সে, হাতল ধরে খুলল দরজাটা। গাড়ি থেকে নামছে রানা এজেন্সীর প্যারিস শাখার একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী এক্স মিলিটারি-ম্যান আঁদ্রে পল।

চেহারা আর ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত একটা সমন্বয় ঘটেছে আঁদ্রে পলের মধ্যে। ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা হলেও, ঠিক ততটা লম্বা বলে মনে হয় না তাকে। ব্যাকব্রাশ করা চুল সমতল মাথায় এমনভাবে সেঁটে আছে, জমাট আলকাতরার একটা স্তর বলে মনে হয়। অস্বাভাবিক চওড়া শরীর তার। ক্লিনশেভ, বিখ্যাত হিটলারী গোঁফ। কান দুটো প্রায় সেঁটে আছে খুলির সাথে। সাদা ট্রপিক্যাল স্যুট পরে আছে সে। গাড়ি থেকে নেমে পোর্টারের স্যালুটের উত্তরে স্মিত হাসল সে। ঘন ভুরু জোড়ার ভিতরে চোখের মণি দুটো সারাক্ষণ চঞ্চলভাবে কি যেন খুঁজে ফিরছে। পাঁচ সেকেন্ডে চারদিক দেখা হয়ে গেল তার।

'পিরো,' পোর্টারের নাম ধরে সম্বোধন করল আঁদ্রে পল, 'গাড়ির কাছ থেকে নোড়ো না।'

'ঠিক আছে, ক্যাপটেন!' সসম্ভ্রমে বলল পোর্টার। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেবার আগের দিন পর্যন্ত ক্যাপটেন আঁদ্রে পলের অধীনে চাকরি করেছে সে। আর সব সহকর্মীর মত তারও বিশ্বাস, ফ্রেঞ্চ সেনাবাহিনীতে আঁদ্রে পলের মত দুঃসাহসী, মেধাবী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক্যাপটেন তখনও ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।

সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে পল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল পোর্টার পিরোর। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপটেন। উনিশশো তেষট্টিতে জেনারেল দ্য গলের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে গুলি খেয়েছিল পল। স্রেফ তার একার অসমসাহসিকতার ফলে সিক্রেট আর্মি অরগানাইজেশনের নিখুঁত অ্যামবুশ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষার জন্যে পদক পেয়েছিল পল, কিন্তু শারীরিক ত্রুটিজনিত কারণে চাকরিটা

হারাতে হয়েছে তাকে। সব কথা মনে পড়ে গেল পোর্টার পিরোর। দুঃখ হয়।

ঠিক সেই সময় এলিভেটরে চড়ে ষোলো তলায় উঠছে আঁদ্রে পল। দুঃখ নেই, গর্বে প্রসন্ন হয়ে আসছে তার মন। এক মহানুভব বঙ্গ সন্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে আছে সে। চাকরিচ্যুত হয়ে বোকা বনে গিয়েছিল সে। তার আজন্মের সাধ, রোমাঞ্চকর কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাবে, সেই সাথে দেশের সেবা করবে। সেজন্যেই সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল সে। ধাপে ধাপে উঠেও যাচ্ছিল ক্রমশ, এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো তাকে।

উদ্‌ভ্রান্ত আঁদ্রে পল পাগলের মত রাস্তায় ঘোরে, ঘরে ফিরে চুপিচুপি কাঁদে। এভাবেই কেটে গেল কয়েকটা বছর। তারপর নৈরাশ্যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় এমনকি আত্মহত্যার কথাও একদিন সে ভাবল। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এল একটি চিঠি। রানা এজেন্সীর হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে। চিঠির শেষে এজেন্সীর চীফ স্বয়ং মাসুদ রানার নিজ হাতের স্বাক্ষর।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল আঁদ্রে পল। রানা এজেন্সীর নাম আগেই শোনা ছিল তার, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। চিঠি পড়ে চোখ কপালে উঠল। পরিষ্কার বুঝল, তার জন্ম-তারিখ থেকে শুরু করে জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনার কথা রানা এজেন্সীর ফাইলে সযত্নে টোকা আছে। শুধু তাই নয়, তার মনের আশা, স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সে নিজে যতটা না জানে, তার চেয়ে যেন বেশি জানে রানা এজেন্সী। চিঠির শেষ অংশটা পড়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সে। নতুন করে শুধু দেশের নয়, গোটা পৃথিবীর সেবা করার, রোমাঞ্চকর জীবন বেছে নেবার প্রস্তাব ছিল সেই অংশে, ছিল রানা এজেন্সীতে যোগ দেবার সাদর আমন্ত্রণ। কালবিলম্ব না করে চিঠিটার উত্তর লিখেছিল আঁদ্রে পল। মশিয়ে মাসুদ রানাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে লিখেছিল, 'আপনি আমাকে নবজন্ম দান করেছেন, আপনার এই মহানুভবতা চিরকাল মনে রাখব আমি। নিজেকে রানা এজেন্সীর একজন কর্মী ভাবতে পেরে আমি গর্বিত। আপনি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল আঁদ্রে পল। নিঃশব্দ পায়ে খানিকটা এগিয়ে করিডরের তেমাথায় দাঁড়াল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারদিক। ফাঁকা করিডর। আবার এগোল সে। অদ্ভুত একটা সতর্কতার ভাব ফুটে আছে তার চোখেমুখে, হাঁটার ভঙ্গিতে। একশো বত্রিশ নম্বর স্যুইটের সামনে থামল সে। রিস্টওয়াচ দেখার সময় আড়চোখে করিডরের দুটো দিক দেখে নিল আরেকবার। তারপর মাথা তুলে দরজায় নক করল পর পর দু'বার, একটু থেমে আবার পরপর তিনবার।

'কাম ইন,' স্যুইটের ভিতর থেকে ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

সিটিংরূমের দক্ষিণ দেয়ালে লম্বা জানালা, মখমলের পর্দা সরানো রয়েছে। জুতো, প্যান্ট আর শার্ট পরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। বাঁ হাতে সরু লম্বা একটা গ্লাস। পাইপ ধরা ডান হাতটা বুকের কাছে। জানালা দিয়ে দূরে, বহুদূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি। পাশেই একটা স্টেরিও থ্রী-ইন-ওয়ানে বোনি

এম-এর গান বাজছে, 'নো উওম্যান, নো ক্রাই।'

পায়ের শব্দে বহুদূর থেকে ফিরে এল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, মেঝেতে রাখা সুটকেস দুটোর পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে পল। মৃদু হাসল ও। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা টেবিলের সামনে।

ড্রয়ার থেকে পিস্তল ভরা হোলস্টারটা বের করে বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। পিস্তলটা খুব দ্রুত কয়েকবার হোলস্টার থেকে বের করে লক্ষ্য স্থির করল বাতির সুইচে। সন্তুষ্ট হলো হাতটা পিস্তলের বাঁটে ঠিক জায়গা মতই পড়ছে দেখে। তারপর রোজকার অভ্যাস মত স্লাইডটা আটবার টেনে একে একে আটটা বুলেট বের করে পরীক্ষা করল সে ইজেক্টার স্প্রিংটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। ম্যাগাজিন রিলিজটা টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল খালি ম্যাগাজিন। আবার স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা বুলেট ঢুকিয়ে আস্তে হ্যামারটা টেনে দিল রানা। ঠিক ফায়ারিং পজিশনে এনে রাখে ও সব সময় তার বিপদসঙ্কুল রোমাঞ্চকর জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু এই পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের ডাবল অ্যাকশন অটোমেটিক ওয়ালথার পি. পি. কে পিস্তলটা।

ম্যাগাজিনে সাতটা বুলেট ভরে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিল রানা। ক্যাচের সাথে আটকে একটা ক্লিক শব্দ হতেই সন্তুষ্টচিত্তে আবার শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল সে তার খুদে সাথীকে। এবার চারকোল গ্রে রঙের কোট গায়ে চাপাতেই কমপ্লিট হয়ে গেল স্যুট, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ল হোলস্টারটা। মুখ তুলে তাকাল সে পলের দিকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রানার রুটিন-প্র্যাকটিস লক্ষ করছে সে। কোন কথা না বলে সুটকেস দুটো তুলে নিল দু'হাতে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাভর্তি ঘন চুল ব্রাশ করে নিল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'লেটস গো।'

করিডর থেকে এলিভেটর পর্যন্ত রানার পাশে থাকল পল। ভাবভঙ্গিতে কোন রকম চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু চারদিকটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছে সে। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু সরে করিডরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল সে। রানা চড়ল এলিভেটরে। এবার দু'পা পিছিয়ে পলও ঢুকল ভিতরে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। চট করে নেমে দ্রুত এদিক ওদিক দেখে নিল পল। তারপর একপাশে একটু সরে গিয়ে পথ করে দিল রানাকে। এদিক ওদিক না তাকিয়ে সোজা রিসেপশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। পিছনে ছায়ার মত চলেছে পল।

কাউন্টারে স্যুইটের চাবি জমা দিল রানা, ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে বিল মেটাল। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা পরিচিত, তাই শুধু পেশাদারী ভদ্রতার খাতিরে নয়, আন্তরিকতার সাথে ব্যক্তিগত দু'একটা কুশল প্রশ্ন করল। এই ফাঁকে নিভে যাওয়া পাইপে অগ্নিসংযোগ করল রানা। 'রোম থেকে?' মেয়েটার প্রশ্নের উত্তরে বলল ও, 'ঠিক নেই তারপর কোথায় যাব। চরকির মত ঘুরে বেড়ানোই তো আমার কাজ।' তিনদিন আগে এখান থেকে ফোন করে এয়ার ফ্রান্সের রোম ফ্লাইটের টিকেট বুক করেছে রানার জন্যে পল। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল পলের, ভাবল রানা।

ঘুরে দাঁড়াল ও। দরজার দিকে এগোল। নিজের ভুলটা ধরতে পেরে পল মন খারাপ করে ফেলেছে, মুখ দেখে বুঝতে পারল ও। মৃদু হেসে বলল, 'যা হবার হয়েছে, ও নিয়ে ভেব না। তবে, আরও সাবধান হতে হবে আমাদের।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল পল। পোর্টার পিয়েরোকে যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সে। নিঃশব্দে হাত নেড়ে তাকে সরে যেতে বলল পল। চোখে শ্যেনের দৃষ্টি, চারপাশের সবকিছু দেখে নিচ্ছে। গাড়ির পাশে থামল সে। ব্যাক সীটের দরজা খুলে ধরল।

পাইপ টানতে টানতে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল রানা। হোটেলের মস্ত কংক্রিটের উঠানে ছায়া নেমে এসেছে। সাদা দেয়ালের শেষ মাথায়, প্রায় একশো ফিট উপরে, হলুদ রঙের পোঁচের মত দেখা যাচ্ছে বেলা শেষের রোদ। গাড়িতে উঠে বসল রানা। প্যারিসবাসীদের দিনটা আজ বড়ই কষ্টে কেটেছে, ভাবল ও। এত গরম অনেকদিন নাকি পড়েনি।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে পল। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল ও লম্বা কালো ডি-এস নাইনটিন সিট্রন। সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট এখন।

এভিনিউ দ্য ম্যারিগ্নি-এ পড়ল গাড়ি। পথের দু'পাশে সারিসারি নারকেল গাছ। সমতল, পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা। ফুটপাথ নেই, তাই পথচারী বিশেষ চোখে পড়ছে না। সামনে অসংখ্য গাড়ি। ভিউমিররে তাকাল পল। পিছনেও তাই। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাল আবার।

নারকেল গাছের আড়াল থেকে কালো ডি-এস নাইনটিন সিট্রনকে দেখতে পেয়েই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল হোন্ডা ফাইভ হানড্রেড স্পোর্টস মডেল মোটর সাইকেলে বসা লোকটার। দ্রুত রিস্টওয়াচ দেখল সে। আপন মনে মাথা নাড়ল লোকটা, ঠিক সময়ই রওনা হয়েছে মাসুদ রানা। ঝট্ করে তাকাল আবার। মাত্র বিশ গজ সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে সিট্রন। দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর স্টার্ট দিল মোটর সাইকেলে। সাদা ক্র্যাশ হেলমেটটা নেড়েচেড়ে ঠিকমত বসিয়ে নিল মাথায়। সরু পথটা দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে উঠে এল রাস্তায়। অনুসরণ করতে শুরু করল কালো সিট্রনকে।

আজ শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে শহর ছেড়ে প্যারিসবাসীরা পালাচ্ছে সৈকতের দিকে, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পরিবেশের লোভে। রাস্তায় যানবাহনের এত ভিড় সেজন্যেই। সন্দেহের উদ্রেক না করে সিট্রনকে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে না মোটর সাইক্লিস্টের।

গাড়ির স্পীড বাড়াল পল। পন্ট আলেকজান্ডার থ্রী-র দিকে তীর বেগে ছুটছে এখন। ব্রিজ পেরিয়ে এভিনিউ জেনারেল গ্যালিনি, তারপর চওড়া বুলেভার্ড দ্য ইনভ্যালিডে পড়ল সিট্রন। এই পর্যন্ত অনুসরণ করেই মোটর সাইক্লিস্টের যা জানার দরকার ছিল জানা হয়ে গেল। বুলেভার্ড দ্য ইনভ্যালিড আর রু দ্য ভারেনেস-এর মুখে পৌঁছে মোটর সাইকেলের স্পীড কমিয়ে আনল সে। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করাল দু'চাকার শক্তিশালী গাড়িটাকে। লাফ দিয়ে নেমেই হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেল একটা কাফের দিকে।

কাফেতে ঢুকে সোজা পিছন দিকে চলে গেল লোকটা। টেলিফোন বুদটা

এদিকেই। স্থানীয় একটা নাম্বারে ডায়াল করছে সে এখন।

মিউডন। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে জায়গাটা। একটা কাফেতে বসে মস্ত ভুঁড়িতে হাত বুলাচ্ছে প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি। লক্ষণটা ভাল নয়, কাফের বয়-বেয়ারা, ম্যানেজার, এমন কি কিছু খদ্দেরদেরও জানা আছে ব্যাপারটা। কুমতলব থাকলে, অথবা সাংঘাতিক কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করলে, বা কারও উপর প্রচণ্ড রাগ হলেই শুধুমাত্র ভুঁড়িতে হাত বুলায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি। নিয়মিত খদ্দেররা তাই কেটে পড়েছে, আর বয়-বেয়ারারা পারতপক্ষে এদিকে বড় একটা ঘেঁষছে না।

মাঝে মধ্যে বিয়ারের গ্লাসটা তুলে চুমুক দিচ্ছে জাঁ থেরি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না, শুধু কান দুটো সজাগ হয়ে আছে তার। ফোনের বেল বেজে উঠতেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে।

ক্র্যাডল থেকে রিসিভার তুলল বারম্যান। কানে ঠেকিয়ে এক মুহূর্ত শুনল, তারপর লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে ডাকার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গিয়েই অপ্রতিভ হলো সে। জাঁ থেরি এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে কাউন্টারের সামনে। প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সে রিসিভারটা। সেটা কানে না ঠেকিয়ে কটমট করে তাকিয়ে থাকল বারম্যানের দিকে। তাড়াতাড়ি বারের অপর প্রান্তে চলে গিয়ে টেলিভিশন সেটটা অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বারম্যান।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনল লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি। বলল, 'বেশ ভাল, ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। বিয়ারের বিল আগেই পরিশোধ করেছে। সোজা হেঁটে বেরিয়ে এল কাফের বাইরে।

পেভমেন্টে পৌঁছে থামল জাঁ থেরি। বগলের তলা থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বের করল। এবং অত্যন্ত সাবধানে দু'বার ভাঁজ খুলল সেটার।

রাস্তার অপর পারে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। জানালার বাইরে মুখ বের করে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কাগজের ভাঁজ খোলাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল একটা মেয়ে। সড়াৎ করে মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে জানালার পর্দা ফেলে দিল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল অপেক্ষারত বারোজন ডানপিটে চেহারার লোকের দিকে। 'রুট নাম্বার টু ধরে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে মাসুদ রানা,' এক নিঃশ্বাসে বলল মেয়েটা।

বারোজনের মধ্যে পাঁচজনের বয়স অল্প, আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে। খুন-খারাবিতে এরা এখনও নতুন হলেও, সাহসের দিক থেকে একেকজন বয়স্কদের কয়েকগুণ। চেয়ারে বসে ছটফট করছিল এতক্ষণ, মেয়েটার কথা শেষ হতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একসাথে পাঁচজন।

বাকি সাতজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। এরা কেউ ওদের মত নার্ভাস হয়ে পড়েনি। এই ষড়যন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্বে সিনিয়রদের মধ্যে রয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরির পরই, সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড, লেফটেন্যান্ট (প্রাক্তন) ডে লা পেত্রো। লোকটা বেঁটে। গোটা মাথা জুড়ে টাক।

কামরার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক জর্জ আঁতিন। বয়স পঁয়ত্রিশ। কাঁধ দুটো মস্ত, চারকোনা চোয়াল। ইউনিয়ন কর্সের একটা স্তম্ভ বলে মনে করা হয় তাকে।

ডান চোখের মণিটা অপেক্ষাকৃত ছোট বলে আদর করে তাকে ট্যারা বলে ডাকা হয়।

কামরা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে খিড়কী দরজার দিকে ছুটছে বারোজনের দলটা। দরজার কাছ থেকে সামান্য দূরে ছয়টা গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। এর প্রত্যেকটি হয় চুরি, নয়তো বেনামে ভাড়া করা। ছুটে গিয়ে ওরা সবাই টপাটপ উঠে পড়ল গাড়িগুলোতে।

সাতটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি নিজেই তিনটে দিন কঠোর পরিশ্রম করে প্ল্যানটাকে সাজিয়েছে। তার প্রথম কাজ ছিল অ্যামবুশের জায়গা নির্বাচন। সেটা খুব সহজেই বেছে নেয়া গেল। তারপরই শুরু হলো কঠিন ঝামেলার কাজগুলো। কোন্ অ্যাঙ্গেলে গুলিবর্ষণ করতে হবে এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত চলমান গাড়ির দূরত্ব আর গতির উপর। গাড়িটা কত দূরে থাকবে তাও মোটামুটি নিখুঁতভাবে আন্দাজ করা গেল। কিন্তু গতি কি হবে তা জানতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে ওদেরকে। রানাকে ছেড়ে ওর শিষ্য আঁদ্রে পল সম্পর্কে সম্ভাব্য তথ্য যোগাড় করতে হয়েছে জাঁ থেরিকে। অবশ্য পরিশ্রমটা একেবারে বৃথা যায়নি। আঁদ্রের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পেরে লাভবানই হয়েছে সে। ফাঁকা রাস্তায় ঘণ্টায় ষাট মাইলের কমে গাড়ি চালায় না আঁদ্রে পল। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় আনুমানিক ষাট মাইল ধরেই প্রয়োজনীয় হিসেব করা হয়েছে। তার পরের সমস্যা, গাড়িটাকে থামানো। এই কাজে ফায়ার-পাওয়ারের ডিগ্রী কি হবে তাও হিসেব করে বের করে নিয়েছে জাঁ থেরি। কোন কাজে খুঁত রাখা তার স্বভাবে নেই, সেজন্যেই এত বড় দায়িত্বটা চাপানো হয়েছে তারই কাঁধে।

অ্যামবুশের জায়গা হিসেবে এভিনিউ দ্য লা লিবারেশনকে বেছে নিয়েছে সে। দীর্ঘ সরল রেখার মত সোজা রাস্তাটা। এই রাস্তাটাই এগিয়ে গিয়ে মিলিত হয়েছে শহরতলি পেটি-ক্লামার্টের প্রধান ক্রস-রোডগুলোর সাথে।

প্ল্যানটা সাজিয়েছে সে এই ভাবে:

লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ রাইফেলধারী কিছু লোক সহ প্রথম দলটি গুলি বর্ষণ শুরু করবে গাড়ির উপর, গাড়িটা ক্রস-রোডগুলোর দুশো গজ এদিকে থাকতেই। রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা বেডফোর্ড ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকবে, দলটা সেটার পিছনে গা ঢাকা দিয়ে গুলিবর্ষণের ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করবে। প্রত্যেককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অগ্রসরমান গাড়ির দিকে খুব নিচু অ্যাঙ্গেলে গুলি ছুঁড়তে হবে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরির ক্যালকুলেশন অনুযায়ী বেডফোর্ড ভ্যানের পাশে সিট্রন পৌঁছবার আগেই একশো পঞ্চাশটা বুলেট গাড়ির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মাসুদ রানা সিট্রনের ফ্রন্ট সীটে বা ব্যাক সীটে যেখানেই বসুক, কিছু আসে যায় না, কম করেও ডজনখানেক বুলেট আহত করবে তাকে। তাছাড়া, সিট্রন তো দাঁড়িয়ে পড়বেই।

সাবধানতা অবলম্বনে জাঁ থেরির জুড়ি ত্রিভুবনে নেই। এত কিছুর পরও খানিক দূরের একটা সাইড রোডে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে সে দ্বিতীয় দলটাকে। কয়েকশো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা টপকে সিট্রন যদি ছুটে পালাবার চেষ্টা করে সফল হয়,

তখন এই দ্বিতীয় দলটা গলিমুখ থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসে পথরোধ করবে সিট্রনের, গাড়ি দিয়ে গাড়ি ঠেকাবে। গাড়িতে আরেকজন থাকবে, তার কাজ ক্লোজ রেঞ্জ থেকে রানাকে আহত করা। অবশ্য, তার কোন দরকার হবে না, জানে সে। প্রথম অ্যামবুশ থেকে রেহাই পাবার কোন আশা সিট্রনের নেই।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই গোটা প্ল্যানটা সফল হবে, সাথে সাথে আহত রানাকে নিয়ে ছুটে যাবে সবাই পিছন দিকের একটা সাইড রোডে। সেখানে ওদেরকে বুকে তুলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে তিনটে গাড়ি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরিকে নিয়ে দুটো দলের সর্বমোট জনসংখ্যা তেরোয় দাঁড়াল। সিগন্যাল দেয়ার গুরু দায়িত্বটা নিজের হাতে রেখেছে জাঁ থেরি।

আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। যার যার পজিশনে পৌঁছে গেছে গ্রুপ দুটো। প্রথম গ্রুপটার কাছ থেকে একশো গজ পিছিয়ে একটা বাসস্ট্যান্ডের পাশে হাতে খবরের কাগজ নিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে জাঁ থেরি।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল খবরের কাগজ নেড়ে সিগন্যাল দেবে প্রথম কমান্ডো লীডার সার্জেন্ট (প্রাক্তন) বেনেকে। বেডফোর্ড ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাইফেলধারীদেরকে সে-ই গুলি বর্ষণের অর্ডার দেবে। তার পায়ের কাছে ঘাসের উপর এক সারিতে শুয়ে আছে তারা।

দ্বিতীয় কমান্ডো দলে মাত্র দু'জন রয়েছে। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ডেলা পেত্রো এবং বৃষস্কন্ধ জর্জ আঁতিন। দু'জনই দুশো লোকের সমান। যদি প্রয়োজন হয় নিজেদের গাড়িটাকে চালিয়ে সিট্রনের সামনে চলে যাবে তারা। গাড়িটা চালাবে ডেলা পেত্রো। পাশে সাব-মেশিনগান হাতে তৈরি থাকবে জর্জ আঁতিন।

মধ্য প্যারিস পিছনে ফেলে শহরতলি পেটি-ক্লামার্টের প্রায় যানবাহনহীন রাস্তায় উঠে এসে গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল আঁদ্রে পল। ঘণ্টায় এখন প্রায় ষাট মাইল স্পীড।

ঠিক আটটা বেজে সতেরো মিনিটে পেটি-ক্লামার্টের একটা রাস্তা, এভিনিউ দ্য লা ডিভিশন লেক্লার্কে সিট্রন প্রবেশ করল সত্তর মাইল স্পীডে।

ওদিকে এক মাইল সামনে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি নিজের মস্ত একটা ভুল বুঝতে পেরে মনে মনে হায় হায় করছে। অ্যামবুশের সময় নির্ধারণ করার জন্যে হাতের কাছে পাওয়া একটা পঞ্জিকার সাহায্য নিয়েছে সে। তাতে পরিষ্কার লেখা আছে আগস্ট মাসের বাইশ তারিখে সন্ধ্যা নামে আটটা পঁয়ত্রিশে। মাসুদ রানার ফ্লাইট আটটা চল্লিশে, এটা জানা থাকায় সিগন্যাল দেবার জন্যে লাইটার বা টর্চ ব্যবহার করার কথা ভাবেনি সে, কেননা ফ্লাইট ধরার জন্যে এই রাস্তা দিয়ে রানা যখন যাবে তখন দিনের আলো থাকার কথা।

কিন্তু নেই। আটটা দশেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝতে পারছে জাঁ থেরি। হাতের কাছে যে পঞ্জিকাটি ছিল, সেটা এ-বছরের নয়, সম্ভবত গত বছরের।

ভুল যা হবার হয়ে গেছে, এখন তা আর শোধরাবার নয়। আটটা বেজে

আঠারো মিনিটের সময় জাঁ থেরি দুটো হেডলাইট দেখতে পেল। এভিনিউ দ্য লা লিবারেশন ধরে সত্তর মাইল বেগে তার দিকে ছুটে আসছে। আবছাভাবে গাড়িটাকে কালো সিট্রন বলে মনে হলো তার। যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল সে, উন্মত্তের মত হাতের কাগজটা নেড়ে সিগন্যাল দিল। শরীরের কাঁপুনিটা থামছে না তার। সার্জেন্ট বেনেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না সে, তার মানে সার্জেন্ট বেনেও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। আশঙ্কায় ধড়াস ধড়াস করে বুকের ভিতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।

একশো গজ দূরে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছে সার্জেন্ট বেনে। গলাটাকে লম্বা করে দিয়ে দূরের বাসস্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়ানো জাঁ থেরির অস্পষ্ট মূর্তিটাকে আরও ভালভাবে লক্ষ করতে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। 'কর্নেল কি সিগন্যাল দিলেন, নাকি চোখের ভুল?' কাউকে নয়, আপন মনে প্রশ্নটা করল সে। প্রস্তুতির কোন সুযোগ পেল না বেচারা, হঠাৎ করেই দেখল দুটো হেডলাইট তীরবেগে বাসস্ট্যান্ডের পাশ ঘেঁষে ছুটে আসছে। হকচকিয়ে গিয়ে আরও দু'তিন সেকেন্ড দেরি করে ফেলল সার্জেন্ট বেনে, তারপর চিৎকার করে উঠল, 'ফায়ার!'

সিট্রন তখন একবারে সামনে চলে এসেছে, গুলিবর্ষণ শুরু হলো। নব্বই ডিগ্রী কোণ থেকে সত্তর মাইল বেগে ধাবমান একটা গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি করছে ওরা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য ভেদ করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করল ওরা। বারোটা বুলেট আঘাত করল সিট্রনকে। প্রায় সবগুলোই পিছন থেকে ছুটে এসে লাগল গাড়ির গায়ে। দুটো টায়ার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ভিতরে সেলফ-সিলিং টিউব থাকলেও আচমকা প্রেশার কমে যাওয়ায় ধাবমান গাড়িটা কাত হয়ে গেল একদিকে, সেই সাথে সামনের চাকা পিছলাতে শুরু করেছে। এই চরম সঙ্কটে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাল আঁদ্রে পল। আশ্চর্য মনোবল লোকটার, থামল না, দক্ষ হাতে চালিয়ে নিয়ে চলল টালমাটাল গাড়িটাকে।

কর্সিকানদের একজন যখন সিট্রনের টায়ার ফুটো করছে, বাকিরা তখন পলায়নপর গাড়ির পিছনের জানালায় গুলি ছুঁড়ছে। কয়েকটা বুলেট গাড়িটার ধাতব আচ্ছাদন ফুটো করে ঢুকল ভিতরে। একটা বুলেট জানালার কাঁচ চুরমার করে দিয়ে ঢুকে পড়ল, বেরিয়ে গেল সিলিং ফুটো করে, সিকি ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারেনি রানার নাকের চকচকে ডগাটা।

প্রথম গুলির শব্দ শুনেই পিছন দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল আঁদ্রে পল, 'গেট ডাউন!'

'যা ভেবেছিলাম!' বিদ্যুৎবেগে শোল্ডার হোলস্টার থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে পিছন দিকে তাকিয়েছিল রানা। এমনি সময়ে বিন্‌ন্‌ শব্দে বাতাস কেটে নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

ফাস্ট-মোশন ছায়াছবির মত ঘটে যাচ্ছে সব। রানাকে সাবধান করে দিয়েই শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ফেলেছে পল। একহাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইলটা পোষ মানছে না কোনমতে, অবিরাম গা ঝাড়া দিচ্ছে। বাঁ দিকে বিপজ্জনক ভাবে পিছলাতে শুরু করল গাড়িটা, যে কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে

পারে। খুবই ধীরে যেদিকে স্কিড করছে সেই দিকে হুইল ঘুরাল খানিকটা, সেই সাথে আস্তে করে চাপ বাড়াচ্ছে অ্যাকসিলারেটর পেডালের উপর। আরও কিছুটা পিছলে বাঁ পাশে সরল সিট্রন, তারপর সামলে নিল যেন অনেকটা অলৌকিক ক্ষমতা বলে। রিভলভারটা কোলের উপর ফেলে দু'হাত দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরল পল। বাঁক ঘুরেই আবার তুফানের মত ছুটতে শুরু করল গাড়ি। সামনে ইন্টার-সেকশন। সাইড রোড এভিনিউ দ্য বয়-র পাশ ঘেঁষে যাবে পল। ইউনিয়ন কর্সের দ্বিতীয় কমান্ডো দল ওখানে অপেক্ষা করছে।

এভিনিউ দ্য বয়।

গলি মুখে স্টার্ট দেয়া গাড়িতে বসে আছে ডেলা পেত্রো এবং জর্জ আঁতিন। বিদ্যুৎবেগে সিট্রনকে ছুটে আসতে দেখে হকচকিয়ে গেল ওরা। কথা ছিল গলিমুখ থেকে বেরিয়ে সিট্রনের পথ রোধ করবে, কিন্তু তা করতে গেলে ধাক্কা খেয়ে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাবে ওদের গাড়ি। হাতে সাব-মেশিনগান নিয়ে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আঁতিন, জানালা দিয়ে কোমর পর্যন্ত গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে।

চোখের পলকে কাছে চলে এসেছে সিট্রন। সাব-মেশিনগানের নল ঘুরিয়ে গুলি করছে সে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল সিট্রন, একটা বুলেটও স্পর্শ করতে পারল না গাড়িটাকে।

বাঁক নিয়ে তুমুল গতিতে একটানা ছুটে যাচ্ছে সিট্রন। ভিউমিররে একবারের বেশি তাকাল না আঁদ্রে পল। একটা বোতাম টিপে ওয়্যারলেস সেটটা অন করল সে। রানা এজেন্সীকে ঘটনাটার কথা জানিয়ে ছোট্ট একটা নির্দেশ দিল। তারপর অফ করল সেটটা।

গাড়ির ভিতর জমাট নিস্তব্ধতা। ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে বসে আছে রানা। থমথম করছে মুখের চেহারা। ঠোঁট জোড়া চেপে আছে পরস্পরের সাথে। হাতে এখন পিস্তলের জায়গায় টোবাকো পাইপ। কিন্তু আগুন ধরাবার কথা ভুলে বসে আছে।

কম কথার মানুষ আঁদ্রে পল চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। ঠাণ্ডা মেজাজের লোক সে, কিন্তু এখন চেহারা দেখে মনে হচ্ছে চাপা আক্রোশে ছটফট করছে তার ভিতরটা।

সোজা এয়ারপোর্ট টারম্যাকের এক ধারে গিয়ে থামল সিট্রন। সাথে সাথে চারদিক থেকে দশ পনেরো জন স্বাস্থ্যবান, সুবেশ, তীক্ষ্ণ চেহারার লোক দ্রুত এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলল গাড়িটাকে। এরা সবাই রানা এজেন্সীর প্যারিস শাখার কর্মী।

দরজা খুলে যেতে গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হলো রানা। চেহারায় সেই থমথমে ভাব কোথায় উধাও হয়ে গেছে। মৃদু হাসি ওর মুখে। নামার সময় কোলের উপর জমে থাকা একগাদা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল টারম্যাকে।

'মাসুদ ভাই আপনি...'

একসাথে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা চারদিক থেকে উচ্চকিত হয়ে উঠল। হাত তুলল রানা। অমনি চুপ হয়ে গেল সবাই। পরমুহূর্তে বিস্ময়ে হতভম্ব করে দিল সবাইকে রানা। এইমাত্র যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটে গেল সে বিষয়ে নয়, সামনে যাকে

দেখছে তাকেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে একে একে সবার কুশল জেনে নিচ্ছে ও।

বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ওদের। তারপর সবাই প্রতিবাদের সুরে মুখ খুলল। কিন্তু রানা কথা বলতে যাচ্ছে দেখে নিজেরাই আবার চুপ করে গেল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'এইবার নিয়ে পাঁচবার হলো। এবার এর একটা বিহিত না করলেই নয়, এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে আমি একমত।' তারপর মুচকি হেসে একটু রসিকতা করল; 'যাই বলো, সোজাসুজি গুলি ছুঁড়তে পারে না ওরা।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ব্যস্ত ভাবে বলল, 'পরে সব জানতে পারবে। ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে।'

কথা শেষ করে এগোল রানা। সরে গিয়ে পথ করে দিল ওরা। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল না কেউ। রানাকে ঘিরে রেখে কাস্টমস-এর শেডের দিকে এগোচ্ছে সবাই। রানার পাশেই রয়েছে আঁদ্রে পল। তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। বলল, 'ধন্যবাদ, পল, আজ তোমার জায়গায় আর কেউ গাড়ি চালালে কি হত বলা যায় না।'

অদম্য আবেগে শরীরটা শিরশিরিয়ে উঠল আঁদ্রে পলের। মশিয়ে রানার কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে মাথা নিচু করে ফেলল সে। চোখে তার পানি এসে গেছে।

দুই

২৫ আগস্ট। সকাল দশটা।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। সাততলায় মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বার। টপ সিক্রেট মীটিং চলছে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ইতিহাসে আজকের এই মীটিংটা নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে মীটিং কল করে সোহেল, কিন্তু আজকের এই মীটিং ডেকেছেন স্বয়ং চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত হাই অফিশিয়ালরা এতে অংশ গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং আমেরিকার অপারেশন্যাল চীফ জাহেদ, ইউরোপের অপারেশন্যাল চীফ সলিল, হেডকোয়ার্টারের স্পেশাল এজেন্টদের চীফ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপারেশন্যাল চীফ সোহানা, এবং বিভিন্ন এলাকার দুই অপারেশন্যাল চীফ হাসান এবং তিমির। এছাড়া রয়েছে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল এবং মেজর জেনারেল রাহাত খানের বিশেষ আমন্ত্রণে বিভিন্ন বিষয়ের ছ'জন বিশেষজ্ঞ। এদের সাথে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের বাছাই করা প্রতিভাবান বারোজন স্পেশাল এজেন্ট: রূপা, পাশা, শাহেদ, জিয়া, শান্তি, শিউলী, রাশেদ, তারেক, শহিদ, মামুন, প্যাটেল এবং পারভিন।

আজকের এই টপ সিক্রেট মীটিংয়ের আলোচ্য বিষয়: মাসুদ রানার নিরাপত্তা

এবং ইউনিয়ন কর্স।

হাই অফিশিয়ালদের সাথে এক সারিতে সোহানা এবং সোহেলের মাঝখানে বসে আছে রানা।

কাগজ নাড়াচাড়ার খসখসে আওয়াজ হচ্ছে কামরার ভিতর। এইমাত্র চীফের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা প্রত্যেককে একটা করে ফাইল পড়তে দিয়েছে। প্রতিটি ফাইলের উপর লেখা: চীফ অভ ইউনিয়ন কর্স: কাপু উ সেন।

একটা ফাইল খোলা অবস্থায় মেজর জেনারেলের সামনেও রয়েছে। কিন্তু সেটা তিনি পড়ছেন না। তাঁর ডান পাশে বসা কালো ফ্রেমের চশমা পরিহিত একজন বিশেষজ্ঞের সাথে নিচু গলায় কথা বলছেন তিনি। আসলে কথা বলছেন বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক, মেজর জেনারেল শুনছেন এবং কদাচ উপর-নিচে মাথা নাড়ছেন।

ফাইল খুলে কামরার বাকি সবাই পড়ছে বা পড়ার ভান করছে। উপস্থিত অনেকেরই আগেই পড়া আছে কাপু উ সেনের ফাইল।

ফাইলে সম্ভাব্য সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ঢোকানো আছে। সেগুলো এভাবে সাজানো হয়েছে:

উ সেন

জন্মস্থান: তৎকালীন ফ্রেঞ্চ উপনিবেশ ভিয়েতনাম।

জন্ম তারিখ: উনিশশো তেইশ সাল, ১ জানুয়ারি।

বৈবাহিক অবস্থা: চিরকুমার।

জাতীয়তা: ফ্রেঞ্চ। তবে নকল নামে মার্কিন এবং অন্য কয়েকটি দেশেরও নাগরিক।

মাতা-পিতা: মা ভিয়েতনামী, বাবা ফ্রেঞ্চ—একজন কর্সিকান (ইউনিয়ন কর্সের আঞ্চলিক শাখা-প্রধান পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত)।

চেহারার বর্ণনা: সাড়ে ছয় ফিট লম্বা। সরু কোমর। মস্ত কাঁধ, কিন্তু আড়ষ্ট। পিঠটা খাড়া। চেহারায় বয়সের ছাপ নেই। প্রকাণ্ড মাথায় ঘন পাকা এলোমেলো চুল।

শারীরিক ক্রটি: দুই চোখই অন্ধ। চোখে অত্যন্ত গাঢ় সবুজ রঙের সানগ্লাস, হ্যান্ডেল থেকে একটা সরু তার বেরিয়ে থাকে, সেটা কোট বা শার্টের বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। অন্ধ হলেও লাঠি ব্যবহার করে না বা দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করে না। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক মানুষের মতই সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করতে পারে। একটা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে চোখ দুটো হারাবার পর থেকে গাঢ় সবুজ রঙের চশমাটা ব্যবহার করছে সে। ওটা দিয়ে দেখতে পায় না, কিন্তু বাদুড়ের মত শুনতে পায়। চশমাটা আসলে একটা সাউন্ড ট্র্যান্সমিটার যন্ত্র। এর মেকানিজম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। রেঞ্জ আশপাশের দশ গজ পর্যন্ত। দশ গজের মধ্যেকার প্রত্যেকটা জিনিস থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে বীমগুলো ফিরে আসে তার বাম কানের পাশে বসানো একটা রিসিভারে। রিসিভারটা আবার সরু তার দিয়ে যুক্ত করা আছে তার পকেটে রাখা একটা মিনিয়েচার অ্যাম্পলিফায়ারের সাথে। সব বস্তুর ঘনত্ব সমান নয়, তাই দেয়াল, চেয়ার, টেবিল, কাঁচ, তরল পদার্থ,

মানুষ—প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে চিনতে কোন অসুবিধে হয় না তার। যে কোন অভিজ্ঞ ড্রাইভারের মত যানবাহনে ঠাসা প্যারিসের রাস্তায় ফুল স্পীডে গাড়িও চালাতে পারে সে। চক্ষুষ্মান মানুষের চেয়ে কিছু বেশি সুবিধে পাচ্ছে সে। চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার শ্রবণশক্তি বেড়ে গেছে চারগুণ। তাছাড়া, তার কাছে রাত্রি বা অন্ধকার বলে কিছু নেই। রাতের ঘন অন্ধকারেও কে কোথায়, বা কি কোথায় আছে সব পরিষ্কার টের পায় সে। এ ধরনের আরও অনেক সুবিধে ভোগ করে।

কাঁধ দুটো আড়ষ্ট এবং পিঠটা খাড়া হওয়ার কারণ: অডন্টয়েড প্রসেসকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্যে মাথার পিছন দিকে চামড়ার নিচে স্টীল প্লেট আছে।

শিক্ষা জীবন: ইউরোপে লেখাপড়া শিখেছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফ্রেঞ্চ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

কর্মজীবন: সেনাবাহিনীতে থাকতেই বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইউনিয়ন কর্সে যোগ দেয়। কাপু অর্থাৎ ইউনিয়ন কর্সের চীফ হবার সাধ পূরণ না হওয়ায় বাপ চেয়েছিল ছেলে যেন একদিন কাপু হতে পারে, বাপের এই ইচ্ছা পূরণ করার যোগ্যতা এবং উদ্যম দুই-ই ছিল উ সেনের মধ্যে। তাই ইউনিয়ন কর্সের তৎকালীন কাপুর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল পদমর্যাদা ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইউনিয়ন কর্সের শাখা প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে ফ্রান্স ত্যাগ করে সে।

একটানা দীর্ঘ দশ বছর ধরে বার্মা, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং হংকঙে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে উ সেন। আনুমানিক হিসেবে জানা যায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর প্রায় তেরো হাজার লোককে এই দশ বছরে খুন করেছে সে। তার আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন গুপ্ত সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। উ সেনের নেতৃত্বে দশ বছরে এই এলাকা থেকে ইউনিয়ন কর্স আয় করে কয়েক হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ড্রাগস, মেশিনারী, সোনা, জুয়েলারী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—প্রধানত এই সব জিনিস স্মাগল করত উ সেন। ব্যবসায় সুবিধের জন্যে সে একটা সমুদ্রগামী জাহাজের বহর গঠন করেছিল। এই সময় কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে উ সেন ইউনিয়ন কর্সের প্রতিনিধিত্ব করছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে তৎকালীন কাপু প্যারিস থেকে অভিনন্দন বাণী পাঠায় এবং ইউরোপ ও আমেরিকা জয় করার জন্যে তার ঘাড়ে নতুন দায়িত্ব চাপায়।

ইউরোপে মাত্র দু'বছর ছিল উ সেন। এই স্বল্প সময়েই প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর সবগুলো মাথাকে গুঁড়ো করে দেয় সে, এবং ড্রাগ ও সোনা স্মাগলের ব্যবসায় ইউনিয়ন কর্সের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করে। এরপর তাকে আরও গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় আমেরিকার বেআইনী ব্যবসার বাজার দখল করতে।

জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয় উ সেন এই আমেরিকাতে। শক্তিমদমত্ত ইটালীর সিসিলীয় পরিবারগুলোর সংস্থা Unione Siciliano অর্থাৎ বিশ্ব-কুখ্যাত মাফিয়ার অপারেশন্যাল হেডকোয়ার্টার এই আমেরিকাতেই। উ সেন আমেরিকায় পা দিতে না দিতেই মাফিয়া পরিবারগুলোর সাথে সরাসরি রক্তক্ষয়ী সংঘাত বেধে যায় ইউনিয়ন কর্সের। উ সেন টিকতে পারবে তা ভুলেও আশা

করেনি কেউ। কিন্তু মাত্র শ'দুয়েক লোক নিয়ে প্রচণ্ড সাইক্লোনের মত মাফিয়া পরিবারগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। কল্পনাতীত ধূর্ততা ও নিখুঁত পরিকল্পনার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক হাজার মাফিয়া সদস্যকে বেমালুম গায়েব করে ফেলে সে। জানা যায়, তার নিজের দুশো লোককে সে কোন বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি নিতেই দেয়নি। আসলে আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাফিয়ার বিরোধী গ্রুপগুলোকে একত্রিত করে মাফিয়ার বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে উসকে দেয় উ সেন, এবং নেপথ্যে থেকে আশ্চর্য দক্ষতার সাথে তাদেরকে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করে।

অপ্রত্যাশিত বিপদ দেখে হকচকিয়ে যায় মাফিয়া পরিবারগুলো। হামলার প্রথম দফাতেই তাদের অকল্পনীয় ক্ষতি হয়ে গেছে, যা কোন দিন পূরণ হবার নয়। ঠিক এই সময় আসে উ সেনের সন্ধি প্রস্তাব।

উ সেন সব ক'টা মাফিয়া পরিবারকে আলোচনা বৈঠকে বসতে বাধ্য করে। তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করার মত ক্ষমতাধর কেউ তখন বেঁচে নেই, প্রায় সব ক'টা পরিবারের ডন এবং ক্যাপরেজিমিদেরকে আগেই খতম করে ফেলেছে সে। বৈঠকে আমেরিকায় ইউনিয়ন কর্সের ব্যবসাগত অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মাফিয়া এবং ইউনিয়ন কর্সের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন সমাধা হয়।

এই সময়েই ইউনিয়ন কর্সের হেডকোয়ার্টারে উ সেনকে নিয়ে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। মাফিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের খবর প্যারিসে পৌঁছতেই পরবর্তী কাপু হিসেবে উ সেনের পদোন্নতি একরকম নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

পরের বছর অভিষেক অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন কর্সের পরিচালকমণ্ডলীর সর্বসম্মতি-ক্রমে উ সেন কাপু নির্বাচিত হয়। পরিচালকমণ্ডলীর সবার অনুকূল রায় পেয়ে কাপু নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য শত বছরের ইতিহাসে আর কারও হয়নি, একমাত্র ব্যতিক্রম উ সেন।

মাসুদ রানার সাথে উ সেনের বিরোধ: উ সেন তখন বার্মায় ইউনিয়ন কর্সের শাখা-প্রধান। পাকিস্তানের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা পেয়ে 'মুসলিম গেরিলা ফৌজে'র অস্ত্রশস্ত্র, রসদ এবং যোদ্ধা সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল সে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে বার্মায় পাঠানো হয় রানাকে। ঘটনার নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ষড়যন্ত্রটাকে ব্যর্থ করে দেয় রানা। আহত উ সেন রানাকে সাবধান করে দিয়ে এই কথা ক'টি বলে:

'মাসুদ রানা, তুমি মস্ত ক্ষতি করলে আমার। পৃথিবীর যেখানেই থাকো, যত সাবধানেই থাকো, বাঁচতে পারবে না তুমি আমার হাত থেকে। প্রস্তুত থেকো, আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর পর হোক—প্রতিশোধ নেব আমি।'

ইউনিয়ন কর্স: ফ্রান্সের একটা দ্বীপ কর্সিকা বা কর্স, এই দ্বীপের অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত গুপ্ত সংগঠনের নাম ইউনিয়ন কর্স। এই সংগঠনের জন্ম কবে তা সঠিক জানা নেই কারও। তবে অপরাধ জগতের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা বয়সের দিক থেকে মাফিয়ার চেয়ে ইউনিয়ন কর্স অনেক প্রাচীন।

উ সেনের নেতৃত্বে ইউনিয়ন কর্স: বর্তমান কাপু সিংহাসনে বসার পর তিন বছর গত হতে চলেছে। এই তিন বছরে সংগঠনকে সে এগিয়ে নিয়ে গেছে বিশ বছর। দলের অভ্যন্তরে গত দশ বছর ধরে দানা বেঁধেছিল কোন্দল, উ সেন তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত কোন্দলের সুষম মীমাংসা করে দলটাকে শতধা বিভক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তার সাংগঠনিক প্রতিভার তুলনা হয় না। প্যারিসে ইউনিয়ন কর্সের নামে মাত্র এক লাখ সদস্য ছিল, সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এদেরকে কাজে লাগানো যায়নি। উ সেন কাপু হবার পর এদের সংখ্যা দ্বিগুণে উন্নীত করে এবং এলাকা ভাগ করে দিয়ে প্রতি দশ হাজার সদস্যের জন্য একজন করে লীডার নিযুক্ত করে। এই দুই লক্ষ সদস্যের বেশির ভাগই পুলিস, মিলিটারি অথবা কাস্টমসে চাকরি করে। ফ্রেঞ্চ পুলিস বাহিনীতে কর্সিকান অর্থাৎ ইউনিয়ন কর্সের সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। একই অবস্থা সেনাবাহিনীতেও।

কাপু হিসেবে উ সেনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। এদিকটায় ইউনিয়ন কর্স দুর্বল ছিল। উ সেন অত্যন্ত কৌশলে সংগঠনের লোকদের সরকারী প্রশাসনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অনুমান করা হয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের সেক্রেটারি, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তা পর্যায়ে ইউনিয়ন কর্সের নিজস্ব লোক রয়েছে। ফ্রান্সের দূত হিসেবে বিদেশে যারা রয়েছে তাদের মধ্যেও একটি বড় সংখ্যা উ সেনের লোক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সবচেয়ে শক্তিশালী গুপ্ত দল বলতে এখন ইউনিয়ন কর্সকেই বোঝায়। মাফিয়া পরিবারগুলোর সম্মিলিত শক্তির চেয়েও এই সংগঠনের শক্তি বেশি। বিশ্বের সর্বত্র মাফিয়া এখন ইউনিয়ন কর্সের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছে। তাদের একচেটিয়া প্রতিপত্তি কোথাও নেই আর।

কাপু উ সেনের ক্ষমতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার উপায় নেই। কারও কারও মতে স্বদেশে সে তাদের প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান। সরকার উৎখাতের কোন চেষ্টা এখন পর্যন্ত সে করেনি, করার দরকারও নেই, কেননা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করছে সে প্রয়োজনের তুলনায় তাই যথেষ্ট। তবে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করলে তার সফল হবার সম্ভাবনাই বেশি।

বাংলাদেশে ইউনিয়ন কর্সের তৎপরতা: তৎপরতা আছে বলে আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রায় একই সময় পড়া শেষ করে যার যার ফাইল বন্ধ করে নড়েচড়ে বসল সবাই, মুখ তুলে তাকাল চীফের দিকে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনে বসা সোহেলের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপটা তার কপালের দিকে তুলে বললেন, 'তুমি বলো, সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে।'

তৈরি হয়েই ছিল সোহেল। মৃদু কণ্ঠে নিজের ধারণা প্রকাশ করল, 'স্যার, আমার ধারণা, সরকারীভাবে এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। আমরা ফ্রান্স সরকারকে ব্যাপারটা জানাতে পারি, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। ফ্রান্স সরকারের সমস্ত দফতরের হোমরাচোমরাদের মধ্যে উ সেনের লোক আছে। তারা

ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবে না, ধামাচাপা দিয়ে রাখবে। আমি মনে করি সমস্যার একমাত্র সমাধান উ সেনের মৃত্যুর মধ্যে নিহিত। লোকটা যদ্দিন বেঁচে থাকবে, রানার বিপদ কাটবে না। উ সেনকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়া বি.সি.আই-এর পক্ষে সম্ভব। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক দিক ভেবে দেখতে হবে আমাদেরকে।'

'যেমন?' রাহাত খান পাইপে অগ্নিসংযোগ করছেন।

'লোকটাকে নিশ্চিহ্ন করতে কম করেও তিন মাস সময় লাগবে আমাদের,' অত্যন্ত সাবধানে, ভেবেচিন্তে কথা বলছে সোহেল। 'এই তিনমাসের বেশিরভাগটাই ব্যয় হবে প্ল্যান পরিকল্পনায়। একাজে প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব যোগ্য লোককে দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ অন্তত তিন মাস বি.সি.আইকে খুঁড়িয়ে চলতে হবে।'

মেজর জেনারেল রাহাত খান জাহেদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

'রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কিছু করা যায় কিনা…' চীফকে এদিক ওদিক মাথা নাড়তে দেখে মাঝ পথে চুপ করে গেল জাহেদ।

'আমাদের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে,' রাহাত খান বললেন, 'তা সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে, দায়িত্বটা বি.সি.আই-এর নেয়া উচিত,' বলল জাহেদ। 'আমারও বিশ্বাস এই সঙ্কট থেকে রানাকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় উ সেনকে সরিয়ে দেয়া।'

'তুমি?' সোহানার দিকে তাকালেন রাহাত খান।

'সমস্যার একমাত্র সমাধান সম্পর্কে সোহেল এবং জাহেদ যা বলল তার সাথে আমি একমত,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা, পরমুহূর্তে তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। 'কিন্তু, স্যার, বি.সি.আই-কে সব কাজ ফেলে দিয়ে উ সেনের পিছনে লাগতে হবে, এ ধারণা আমি সমর্থন করি না। বারোজন স্পেশাল এজেন্টের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মী হিসেবে আমি বলতে পারি, ওদের সাহায্যে উ সেনকে সরিয়ে দিতে দুই মাসের বেশি লাগবে না আমার।'

রাহাত খানের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না, তিনি নিঃশব্দে বি.সি.আই-এর ইউরোপ এলাকার অপারেশন্যাল চীফ সলিল সেনের দিকে তাকালেন।

সলিল সাথে সাথে বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে, স্যার। সকলের সাথে সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে একমত হয়ে বলছি, রানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটা পরিচালিত হচ্ছে ইউরোপ অর্থাৎ আমার এলাকা থেকে, তাই সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। সোহানার সাহায্য নেব আমি, সময় নেব ওই দু'মাস।'

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এলাকার অপারেশন্যাল চীফের দিকে তাকালেন রাহাত খান।

তিমির বলল, 'মরণ বাড় বেড়েছে উ সেন। কিন্তু আস্তানা থেকে ওকে বের করা মুশকিল। ধৈর্য ধরে মাস কয়েক অপেক্ষা করলে হয়তো বাগে পাওয়া যাবে। ওকে বাইরে পেলে প্রথম সুযোগেই আমার গ্রুপ ধ্বংস করতে পারবে, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

হাসান বলল, 'দু'মাস সময় পেলে আমিও পারব।'

'রানা?' রাহাত খান বললেন।

খাড়া পিঠের চেয়ারে যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে রইল রানা, এক চুল নড়ল না। 'আমার ওপর উ সেনের এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশ,' মৃদু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'এর সাথে আমি বি.সি.আই-কে জড়াতে চাই না।'

রানার কথা শেষ হতেই কামরার চারদিক থেকে বিস্ময় মেশানো প্রতিবাদের গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

'বুঝতে ভুল করছিস তুই,' অধৈর্যের সাথে বলল সোহেল, 'বি.সি.আই-এর একজন সদস্যের বিরুদ্ধে লাগা মানে বি.সি.আই-এর বিরুদ্ধে লাগা…'

গুঞ্জনের মধ্যে সলিলেরও কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'উ সেন তার ইউনিয়ন কর্সের সমস্ত শক্তি নিয়ে তোর পিছনে লেগেছে, এ থেকেই প্রমাণ হয় শুধু তোকে নয়, বি.সি.আইকেও চ্যালেঞ্জ করছে সে।'

'আর ব্যক্তিগত আক্রোশ হলেই বা কি,' বলে উঠল সোহানা, 'শয়তানটাকে শায়েস্তা করার জন্যে আমাদের সবাইকে উঠে পড়ে লাগতে হবে, তা নাহলে…'

'ওর বোধহয় আরও কিছু বলার আছে।'

রাহাত খানের গলা শুনে সাথে সাথে নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভিতর। রানার দিকে তাকিয়ে সবাই সজাগ হয়ে উঠল।

মৃদু একটু হাসল রানা। তারপর বলল, 'আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে সবাইকে উদ্বিগ্ন দেখে গর্ব ও কৃতজ্ঞ বোধ করছি। ধন্যবাদ।' একটু বিরতি নিল ও।

রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে সোহেলের। নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভাবছে সে, সাংঘাতিক কোন ঝুঁকি নেবার মতলব এঁটেছে শালা। নিজের ঘাড়ে সমস্ত বিপদ তুলে নেবার সর্বনেশে প্রবণতাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আবার। কি যেন ভেবে শিউরে উঠল সোহেল। ভাবল, যেভাবেই হোক, ঠেকাতে হবে রানাকে। অন্তত উ সেনের ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে দেয়া যাবে না ওকে।

'আবার বলছি আমি, আমার ওপর এটা উ সেনের ব্যক্তিগত আক্রোশ,' বলল রানা। 'আমার এই কথার স্বপক্ষে প্রমাণও আছে।'

'প্রমাণ আছে?' ভুরু কুঁচকে উঠল সোহেলের।

'আছে,' বলল রানা। 'আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে সে পাঁচবার। প্রতিবারই ছুটিতে থাকার সময় আক্রান্ত হয়েছি আমি। প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পরে বি.সি.আই-এর কাজ নিয়ে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, সিসিলি এবং প্যারিসে গেছি আমি, এসব জায়গায় ইউনিয়ন কর্সের শক্তিশালী আস্তানা রয়েছে, অথচ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ওরা আমার ওপর হামলা করেনি। কিন্তু যেই কাজ শেষ করে ছুটি নিয়েছি, অমনি আক্রমণ এসেছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয়?'

রানার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে মাথা ঝাঁকিয়ে সোহেল বলল, 'ঠিক আছে, না হয় তোর ওপর উ সেনের এটা ব্যক্তিগত আক্রোশই, কিন্তু তাই বলে বি.সি.আই. তোকে কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না, একথা ভাবছিস কেন?'

আবার মৃদু হাসল রানা। বলল, 'এই ভাবনার পক্ষেও যুক্তি আছে আমার।'

চ্যালেঞ্জের সুরে সোহেল বলল, 'কি যুক্তি বল্!'

আপন মনে পাইপ টানছেন রাহাত খান। চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছেন

সিলিঙের দিকে। কিন্তু কান দুটো সজাগ, কে কি বলছে শুনছেন তিনি।

'সবার কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, সমস্যাটার সমাধান করতে বি.সি.আই-এর কমপক্ষে দুই থেকে তিন মাস সময় লাগবে,' মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। 'দুঃখের বিষয়, এত সময় উ সেন আমাকে দিচ্ছে না।'

'মানে? পরিষ্কার করে...'

'আগামী অক্টোবরের পঁচিশ তারিখে ইউনিয়ন কর্স তার নতুন কাপু নির্বাচন করবে,' বলল রানা। 'এবারও হয়তো উ সেন আগামী তিন বছরের জন্যে নির্বাচিত হবে। কিন্তু কাপু নির্বাচনের আগে যে রকম খুনোখুনি হয় প্রতিবার, এবারও তাই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কে বাঁচবে, কে মরবে কেউ বলতে পারে না আগে থেকে। তাই মেয়াদ শেষ হবার আগে কি কি কাজ সারতে হবে তার একটা তালিকা সে বহু আগেই তৈরি করে রেখেছে বলে আমার বিশ্বাস। সেই তালিকার সব শেষ কাজটা সম্ভবত আমাকে খুন করা। তার মানে, আগামী পঁচিশে অক্টোবরের আগেই যা করার করতে হবে। কিন্তু বি.সি.আই-এর পক্ষে তা সম্ভব নয়, একথা আমরা জানতে পেরেছি একটু আগেই সহকর্মীদের মুখ থেকে।'

সোহেল, সোহানা, জাহেদ, সলিল এবং কামরায় উপস্থিত স্পেশাল এজেন্টরা রানার কথা শুনে বোকা বনে গেল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না কেউ। কি বলবে, ভেবেই পাচ্ছে না ওরা।

'এর চেয়েও বড় যুক্তি আছে আমার,' বলল রানা। এখন আর ঠোঁটে হাসি নেই ওর। গম্ভীর হয়ে উঠেছে চেহারা, কণ্ঠস্বর ভারী শোনাচ্ছে। 'বি.সি.আই-এর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, ইউনিয়ন কর্সের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ বাধানো উচিত হবে না আমাদের। এই গুপ্ত সংগঠনটিকে সি.আই.এ. সহ পৃথিবীর সমস্ত ইন্টেলিজেন্স বিভাগ এড়িয়ে চলে, ঘাঁটাবার ঝুঁকি নেয় না। সে-ঝুঁকি আমাদেরও নেয়া উচিত হবে না। ভয় পেয়েছি, তাই এসব কথা বলছি, ব্যাপারটা তা নয়। ইউনিয়ন কর্সকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি বি.সি.আই-এর আছে। শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব, এ ব্যাপারেও আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু জিতব কিসের বিনিময়ে? দেখা যাবে ইউনিয়ন কর্সকে দমন করা গেছে, কিন্তু আমাদেরকে হারাতে হয়েছে ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা অনেক এজেন্টকে, স্পেশাল এজেন্টদের বেশিরভাগই মারা গেছে, অফিসাররা গায়েব হয়ে গেছে। খুব কম করে বলছি আমি। ক্ষতির পরিমাণ এর শতগুণ বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা।' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার একার নিরাপত্তার জন্যে বি.সি.আই-কে এতবড় বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিতে আমি রাজি নই।'

সবাই চুপ। কামরার ভিতর পিন পতন স্তব্ধতা।

চিকন ধোঁয়া ছাড়ছেন রাহাত খান সিলিঙের দিকে। কাঁচাপাকা ভুরুর ভিতর থেকে একজোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনে বসা অফিসারদের উপর পড়ল। একে একে সবগুলো থমথমে মুখের দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি ফিরে এসে এবার স্থির হলো রানার মুখের উপর। কিছুই বললেন না তিনি, কিন্তু রানা তাঁর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল। চীফ জানতে চাইছেন ওর আরও কিছু বলার আছে কিনা।

'সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বি.সি.আই. যদি মাঠে নামে,' বলল রানা,

'ইউনিয়ন কর্সকে কেটেছেঁটে অর্ধেক করে দেয়া সম্ভব, তবে তাতে সময় লাগবে কয়েক বছর। কিন্তু যতই ক্ষতি করি না কেন আমরা, সে-ক্ষতি পূরণ করতে খুব বেশি সময় লাগবে না উ সেনের। সুতরাং, ইউনিয়ন কর্সের বিরুদ্ধে লেগে লাভ নেই। লাগতে হবে উ সেনের বিরুদ্ধে। কিন্তু,' একটু থেমে বলল রানা। 'উ সেনের কাছে পৌঁছানো এক কথায় অসম্ভবই। পৃথিবীর সবচেয়ে ওয়েল প্রটেকটেড ব্যক্তি এখন সে। তার কাছাকাছি যেতে হলে কয়েক শো ট্রেনড দেহরক্ষীর লাশ ডিঙিয়ে যেতে হবে। এক ডজন স্পেশাল এজেন্টের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

রানা থামতেই গম্ভীর গলায় বলল সোহেল, 'মনে হচ্ছে তোর নিজের কোন প্ল্যান আছে।'

'আছে,' বলল রানা। 'এক ডজন বা কয়েক ডজন স্পেশাল এজেন্টের পক্ষে যা সম্ভব নয়, একজন এজেন্টের পক্ষে তা সম্ভব। ব্যাখ্যা করছি। ধরা যাক, একই উদ্দেশ্য নিয়ে দুটো দল একই দিকে এগোচ্ছে। একটা দলে মাত্র একজন, অপর দলে অসংখ্য লোক রয়েছে। কোন দলটা শত্রুর চোখে ধরা পড়বে?' থামল রানা, কিন্তু কেউ জবাব দিচ্ছে না দেখে নিজেই উত্তরটা দিল, 'ধরা পড়বে দ্বিতীয় দলটা। কেননা অসংখ্য লোক গা ঢাকা দিয়ে বেশিক্ষণ শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু একজন লোক পারে। বুদ্ধি করে চললে ফাঁক ফোকর দিয়ে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেক কাছে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব।'

'সেই একজন বুদ্ধিমান লোকটা নিশ্চয়ই তুই?' রাগ সামলাতে না পেরে সোহেলের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা।

অমায়িক হাসল রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ঠিক ধরেছিস।'

'দিস ইজ ম্যাডনেস!' মেজর জেনারেল রাহাত খানের উপস্থিতি ভুলে প্রায় চিৎকার করে উঠল সোহেল। 'তুই স্রেফ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিস।'

গমগম করে উঠল রাহাত খানের কণ্ঠস্বর, 'তোমার প্ল্যানটা আর একটু ব্যাখ্যা করো, রানা।'

থমকে গেল সোহেল। চীফের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করছে সে। চীফ রানাকে কথা বলতে উৎসাহ দিচ্ছেন, ভাবছে সে, তার মানে ওর প্ল্যানের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। হাউ অ্যাবসার্ড! রানা পাগল হয়েছে বলে কি…ওকে যে কোনমতেই একা ছেড়ে দেয়া যায় না তা কি উনি বুঝতে পারছেন না?

সোহেল একা নয়, কামরার সবাই হতবাক হয়ে গেছে।

'দেয়ার ইজ নো ম্যান ইন দি ওয়ার্ল্ড হু ইজ প্রুফ এগেনস্ট অ্যান অ্যাসাসিন'স বুলেট,' শুরু করল রানা। 'বাইরে খুব কম বেরোয় উ সেন। তবে আততায়ীর একটা বুলেট পৃথিবীর যে কোন লোককে খুন করতে পারে, এ-কথা আমি আগেই বলেছি। তাকে খুন করা সম্ভব। কিন্তু খুন করার চেয়ে কঠিন নিরাপদে সরে আসা। সেজন্যে নিখুঁত পরিকল্পনা দরকার। আঘাত হানার সময়, আঘাত হানার পদ্ধতি, তারপর এস্কেপ রুট নির্বাচন—এসব আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। পরিকল্পনাটাকে নিখুঁত করার স্বার্থেই মাত্র একজন লোকের ঘাড়ে সবটা দায়িত্ব থাকা উচিত। তাতে ভুল হবার ভয় কম, আর ভুল হলেও তা ধরা পড়া মাত্র তার

পক্ষে সংশোধন করে নেয়া সম্ভব, একাধিক লোক হলে যা সম্ভব নয়।' একটু হাসল রানা, তারপর রাহাত খানের চোখে চোখ রেখে দুম করে একটা প্রশ্ন করে বসল, 'স্যার, আমাদের আজকের এই মীটিং সম্পর্কে বাইরের আর কেউ জানে?'

কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে দুই সেকেন্ড রানাকে দেখলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'না।'

'সেক্ষেত্রে,' বলল রানা, 'এই কামরায় উপস্থিত রয়েছেন যাঁরা তাঁরা ছাড়া বাইরের আর কেউ যেন এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে। আজকের মীটিংয়ের সমস্ত সিদ্ধান্ত, ডোশিয়ার, ফাইল নষ্ট করে দিতে হবে। উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলছি, এখানে যা কিছু আলোচনা হচ্ছে বাইরে বেরুবার সাথে সাথে সব ভুলে যাবেন।'

গোগ্রাসে গিলছে সবাই রানার কথা।

'কিভাবে কি করব তার প্ল্যান আমিই তৈরি করব, অপারেশনেও যাব আমি একা,' নিচু গলায় কথা বলছে রানা, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সবাই ওর থমথমে ভারী কণ্ঠস্বর। 'এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানাব না আমি—স্যার, এমন কি আপনাকেও নয়। এক কথায় আমি অদৃশ্য হয়ে যাব।'

উপস্থিত সকলের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। বলে কি রানা! মেজর জেনারেল রাহাত খানকেও নিজের প্ল্যান জানাতে চায় না ও! এত বড় কথা মুখ থেকে বেরোল কিভাবে! কড়া ধমক দেবে বস্, এই ভেবে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে সবাই।

স্পেশাল এজেন্টদের সারি থেকে একটা সপ্রতিভ কণ্ঠস্বর দৃঢ় ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'মাসুদ ভাইকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাপোর্ট করি। আমার ধারণা শুধু এভাবেই সম্ভব হতে পারে কাজটা।' কথাটা বলল রূপা, অসমসাহসী এবং ভাবাবেগশূন্য বলে যার খ্যাতি আছে।

'অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আমার সাথে কারও কোন রকম যোগাযোগ থাকবে না,' বলল রানা। 'এরপর সম্ভাব্য দুটো খবর পেতে পারেন আপনি, স্যার। এক, উ সেন নেই। দুই, আমি নেই।'

সবাই স্তব্ধ।

'বলে যাও,' মৃদু গলায় বললেন রাহাত খান।

'উ সেনকে আমি বিশ্বাস করি না,' বলল রানা, 'আমি তার দিকে রওনা হয়েছি এ খবর যদি আগেভাগে পেয়ে যায় সে, আমাকে ঠেকাবার জন্যে অত্যন্ত নীচ একটা কৌশল অবলম্বন করবে। সেই কৌশলটা কি হবে, তা আমি এখনই অনুমান করতে পারি।' একটু থামল রানা, ইতস্তত করল খানিক, তারপর বলল, 'স্যার, আপনাকে সে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করতে পারে। তার জানা আছে, একমাত্র এই দুঃসংবাদ পেলেই আমি প্ল্যান বাতিল করে ফিরে আসব দেশে। আমাকে মাফ করবেন, স্যার, তবু বলছি, সম্ভাব্য দুটো খবরের একটা না পাওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা কয়েকগুণ জোরদার করতে হবে আপনাকে।'

নিমেষে চোখ খুলে গেল সকলের। রানার স্পর্ধা দেখে নয়, ওর সতর্কতা লক্ষ করে। ইউনিয়ন কর্স যে কী ভয়ঙ্কর একটা শক্তি তা যেন এই প্রথম পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করছে ওরা।

'তোমাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে?' সোহেলের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল।

গভীর চিন্তান্বিত সোহেল চীফের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল। রানাকে বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, তাই চীফের কাছে ধরনা দিল ও, বলল, 'স্যার, এ ব্যাপারে বি.সি.আই-এর একটা দায়িত্ব আছে। ও যাই বলুক, আমরা সে-দায়িত্ব পালন করব। প্ল্যানিং এবং অপারেশন ওর নিজের, সে-সম্পর্কে যদি কাউকে কিছু জানাতে না চায়, ঠিক আছে, জানতে চাইব না—কিন্তু বি.সি.আই-এর সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করা চলবে না ওর। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়...'

'কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেবে না,' বলল রানা। 'বিপদ যদি হয়, এখান থেকে হবে। আমি কোথায়, কি করতে যাচ্ছি এ কথা প্রকাশ না হলে সব ঠিক থাকবে। এখানে কেউ যদি মুখ না খোলে, আমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না।'

'কিন্তু গোপনে যোগাযোগ থাকলে ক্ষতিটা কি?' সোহানার অসহিষ্ণু প্রশ্ন।

'কোন যোগাযোগই শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না, সেটাই আমার ভয়,' বলল রানা।

'কিন্তু শত্রুপক্ষের মুভমেন্ট সম্পর্কে তোকে জানতে হবে না?' ঝট্ করে রানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল সোহেল।

'তা নাহলে,' পিছনের সারি থেকে বলল বিশাল ছাতি রাশেদ, 'আপনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য কাউকে সাথে নিন।'

সলিল সায় দিয়ে বলল, 'ওটা আমার এলাকা, আমি সাথে থাকলে সবার চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারব ওকে।'

রেগে উঠে সোহানা বলল, 'এত কথা না বলে নিয়ম অনুসারে যা হওয়া উচিত তাই হোক। বিশেষ গুরুতর পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান সবসময় তার স্পেশাল এজেন্টদের ওপর নির্ভর করে এসেছে। আজ কেন তার ব্যতিক্রম হবে?'

'পরিস্থিতি গুরুতর আমার জন্যে,' বলল রানা, 'প্রতিষ্ঠানের জন্যে নয়।' সকলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এবার সে-ও সরাসরি মেজর জেনারেল রাহাত খানের শরণাপন্ন হলো, 'স্যার, এই কাজটায় আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাব বলে আশা করি। অফিশিয়াল নির্দেশ দিয়ে আমার গতিবিধি যদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেটা আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ারই সামিল হবে।'

রাহাত খান গম্ভীর মুখে তাকালেন সোহেলের দিকে। অদ্ভুত একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তিনি। মুখ দেখে বোঝা না গেলেও ঝগড়াটা তিনি উপভোগ করছেন সন্দেহ নেই।

'অফিশিয়াল নির্দেশকে এত ভয় পাবার কিছু নেই,' শেষ পর্যন্ত রানাকেই অনুরোধের সুরে বলল সোহেল, 'তোর যা খুশি করবি, কেউ বাধা দেবে না—তবু যোগাযোগ একটা থাকা দরকার।'

মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ঠিক আছে। আমার লন্ডনের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার দেব আমি। কখন দেব, এখনই তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ইমার্জেন্সী ছাড়া কোন অবস্থাতেই এই নাম্বারে ফোন করা চলবে না। ওই ঠিকানায় ডাকে একটা চিঠি পাঠাবি,

চিঠিতে এমন একটা ফোন নাম্বার দিবি যে নাম্বারে ফ্রান্সের যে-কোন জায়গা থেকে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারি আমি। এই ফোনটার সাথে টেপ-রেকর্ডার রাখার ব্যবস্থা করবি, যাতে কোন ইনফরমেশন দিলে তা টেপ হয়ে যায়। ফোনের ধারে যে থাকবে, আমার সাথে যোগাযোগ করার কোন সুযোগ সে পাবে না, দরকার হলে এবং আমার নিজের সময়মত আমিই যোগাযোগ করব।' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল, 'ফোনের ধারে কে থাকবে তা এখনই আমাকে জানিয়ে দে। তবে সে যেই হোক, আমি তাকে আমার মুভমেন্ট, পরবর্তী পদক্ষেপ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানাব না।'

'ঠিক আছে,' মেনে নিল সোহেল। রানার কাছ থেকে এইটুকু আদায় করতে পেরেই খুশি ও। 'কিন্তু তবু শেষ আরেকবার আমি তোকে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, একা যাওয়াটা কি তোর উচিত হচ্ছে? তুই রাজি হলে আমরা একশো এজেন্টকে তোর হাতে…'

'না। ভেবে চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি,' বলল রানা।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল।

সলিল বলল, 'নকল কাগজপত্র দরকার হবে তোর, এ ব্যাপারে আমি তোকে সাহায্য করতে পারি।'

'নিজেই যোগাড় করব,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ।' সোহেলের দিকে ফিরল। 'ফোনের কাছে কে থাকবে?'

'আমি,' গলা বাড়িয়ে বলল সোহানা।

হাত দিয়ে না হলেও কথার চড়টা ঠাস করে মেরে বসল রানা, 'না।'

নিমেষে কালো হয়ে গেল সোহানার মুখ। সাথে সাথে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটল কামরার উপস্থিত আর সবার মধ্যেও।

এক সেকেন্ডের জন্যে কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

রাগে লাল হয়ে উঠেছে রাশেদের মুখটা।

অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ! কেউ কথা বলছে না।

থমথমে গলায় সোহেলই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'তাহলে তুই-ই যাকে ইচ্ছা বেছে নে।'

'রূপা,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

আলোচনার আর কিছু বাকি নেই, মীটিংয়ের এবার সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। চীফ কিছু বলবেন, এই আশায় অপেক্ষা করছে সবাই।

পাইপে আগুন ধরিয়ে রাহাত খান সোহেলের দিকে তাকিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাতটা সামান্য একটু নাড়লেন।

'আজকের মীটিং এখানেই শেষ,' বলল সোহেল।

সবাই চেয়ার ছাড়ছে। রানাও।

'বসো,' চীফের ভারী গলা শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। অপরাধীর মত ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল ও।

সবাই কামরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শুকনো মুখে একা বসে আছে রানা। ঢোক

গিলছে। ভাবছে, না জানি কোন্ পয়েন্টে ধরে বসে বুড়ো।

পাঁচ মিনিট পর হাসিমুখে চীফের কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। আউটার অফিসে টেপ-রেকর্ডার ছেড়ে দিয়ে আজকের মীটিংয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করছে ইলোরা। রানার পায়ের শব্দে মুখ তুলে মৃদু হাসল, কিন্তু কথা না বলে আবার মন দিল কাজে।

কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। সামনে সোহানা পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোল আবার। করিডর ফাঁকা, আর কেউ নেই।

হাত বাড়িয়ে রানার শার্টের আস্তিন ধরে ফেলল সোহানা।

'দাঁড়াও।'

বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। কিন্তু মুখ ফেরাল না। বলল, 'ছাড়ো!'

'না,' নিচু গলায় বলল সোহানা। 'আমার কথা আজ শুনতে হবে তোমাকে।'

মুখ ফেরাল রানা। 'তোমার স্বামী যদি···' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা।

অবরুদ্ধ কাঁপা গলায় বাধা দিল সোহানা, 'ভুল বুঝেছিলাম, সে-ভুল আমার ভেঙেছে, কিন্তু তোমার ভুল ভাঙবে কবে?'

'কিসের ভুল?' রূঢ় গলায় বলল রানা।

'সালমার সাথে ওভাবে তোমাকে মিশতে দেখে···কিন্তু সে-ভুল আমার ভেঙে গেছে। জেনেছি, ওকে তুমি নিজের বোনের মত স্নেহ করো।' আরও কি যেন বলতে চাইছে সোহানা, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

'তোমার ভুল ভাঙুক, না ভাঙুক তাতে আমার কিছু এসে যায় না,' কঠোর কণ্ঠে বলল রানা। 'বিয়ে থা হয়ে গেছে, এবার সংসারের দিকে একটু মন দেয়াটাই তোমার জন্যে মঙ্গল বলে মনে করি।' কথাটা বলে নিজের কামরার দিকে এগোল রানা। থেমে দাঁড়াল আবার। 'তাছাড়া, তোমার দেওরের সংখ্যাও তো কম নয়। আমাকে ওই দলে না টানলেও চলবে।'

'সবাই আমাকে ভাবী বলে ডাকে, কিন্তু কেন? সে-প্রশ্ন একদিনও তো জিজ্ঞেস করোনি কাউকে?'

সোহানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এখনও রানা। 'কেন?' নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল ওর মুখ থেকে।

'এখনও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে তোমার?' নিচু গলায় বলল সোহানা। 'কোথায় গেল তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি? নাকি সব জেনেও না জানার ভান করছ? তোমার জীবনে যদি আর কেউ এসে থাকে, সে-কথা পরিষ্কার করে বললেই তো পারো। তাহলে অন্তত ওদেরকে ভাবী বলতে নিষেধ করে দিয়ে প্রতিদিন অপমান হওয়া থেকে বাঁচতে পারি।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিস্ময়ের একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা। এক সেকেন্ডের জন্যে চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। কোথায় যেন মস্ত একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ঘুরল ও।

নেই, চলে গেছে সোহানা অদূরেই তার কামরা, দরজায় পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা কাঁপছে। পাথরের মূর্তির মত সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রানা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত এগোল সেদিকে।

কামরার কাছে পৌঁছে দাঁড়াল ও। দ্রুত করিডরের দু'দিক দেখে নিল। কেউ লক্ষ করছে না ওকে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ভিতরে।

ডেস্কে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে সোহানা। ডেস্কের উপর এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে কালো চুল, মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে তাতে।

নিঃশব্দ পায়ে ভিতরে ঢুকল রানা। কোন শব্দ না করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সোহানার পাশে।

অদম্য আবেগে পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে সোহানার।

একটা হাত বাড়াল রানা, কিন্তু ইতস্তত করে সেটা ফিরিয়ে নিল আবার। নাম ধরে ডাকতে গিয়ে আবিষ্কার করল, গলা বুজে আছে, বুকে সাহসেরও বড় অভাব। আবার হাত বাড়াল ও। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে হাতটা।

মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়েই চমকে উঠে মুখ তুলল সোহানা।

'আমাকে মাফ করো,' সোজাসাপ্টা ক্ষমা চাইল রানা। 'ভুল বুঝে হোক, না বুঝে হোক, অন্যায় করেছি, ...লক্ষ্মী, এবারটি আমাকে মাফ করে দাও।'

সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে চোখের পানির সাথে লেপটে আছে ক'গাছি চুল। চেহারা থেকে দ্রুত খসে পড়ছে ম্লানিমার ছায়া, আশ্চর্য উজ্জ্বল একটা হাসি ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

চিবুক ধরে উঁচু করল রানা শিশির ভেজা তাজা ফুলের মত মুখটাকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে চোখের পানি মুছছে সে সোহানার—যেন সব দুঃখ মুছে দিতে পারবে ও।

আসলে কেউ কি পারে তা কোনদিন?

বেলা এগারোটা।

নীল ডাটসান নিয়ে রওনা হলো রানা। মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকারই মস্ত এক বিল্ডিংয়ের সাততলায় ওর গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান 'রানা এজেন্সী—প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার্স'। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চার কামরার একটা স্যুইটে সাজানো অফিস। অফিস সেক্রেটারি সালমা, শাখা প্রধান গিল্টি মিয়া, তত্ত্বাবধায়ক ও নিজে।

অনেকদিন পর মনটা আজ ভাল ওর। সোহানা ওরই ছিল, আজও আছে, চিরকাল থাকবে—এটা উপলব্ধি করার পর থেকে অদ্ভুত এক পুলকে শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর। সব গোলমাল আর ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। ওকে যেদিন বি.সি.আই. থেকে এক বছরের জন্যে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো সেদিনই ভুল বোঝাবুঝিটা চরমে পৌঁছেছিল। ওর অফিসরুমে রাশেদকে নিয়ে যে নাটকটা সেদিন করেছিল সোহানা তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। 'নাম্বার ওয়ান পাগলী!' ভাবছে রানা, 'ও ভেবেছিল আমাকে অবহেলা করলেই আমি ওর দিকে নতুন করে আকৃষ্ট হব।' তাতে হিতে বিপরীতই ঘটেছিল। মন উঠে গেছে সোহানার, এই ধরে নিয়েছিল রানা। যাক বাবা, আসল কথা জানা গেছে, হারানো লক্ষ্মী আবার ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু, এবার হয়তো সোহানা বজ্র আঁটুনি দিয়ে সম্পর্কের গিঁটটাকে শক্ত করে বেঁধে নিতে চাইবে, এই যা একটু দুশ্চিন্তার কথা। আবার কি না কি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়, এই ভেবে ভয় পাচ্ছে ও। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'অদৃশ্য হও আর যাই হও, আমাকে সাথে নিতে হবে। মরলে দু'জন মরব একসাথে।'

মাথায় হাত বুলিয়ে যুক্তি তর্কের অবতারণা করে শেষ পর্যন্ত একটা আপস রফা করা গেছে। দুই শর্তে রানার সাথে যাবে না সোহানা। শর্ত দুটো হলো—এক, উ সেনের বিরুদ্ধে এই জীবন মরণ যুদ্ধে মরা চলবে না রানার। দুই, নির্দিষ্ট একটা তারিখের মধ্যে ওর কাছে ফিরে আসতে হবে।

মস্ত দালানটার সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে শিস দিতে দিতে নামল। রাইফেলধারী দারোয়ান কপালে হাত তুলে আদাব করল ওকে। মাথাটা একটু নুইয়ে মৃদু হেসে ধাপ ক'টা টপকে এলিভেটরের দিকে এগোল রানা। এলিভেটরে চড়ে রিস্টওয়াচ দেখল ও। ছয় মিনিট দেরি হয়ে গেছে পৌঁছতে ওর। ঢাকায় যখন থাকে ও, ঘড়ির কাঁটা ধরে এগারোটার সময় রানা এজেন্সীর অফিসে আসে প্রতিদিন একবার। এক মিনিট দেরি হলেই গিল্টি মিয়া আর সালমা ধরে নেয় বস্ আজ আসবেন না। আজ ওকে দেখে দু'জনেই খুব অবাক হবে, এই ভেবে মুচকি হাসল রানা।

সাততলায় উঠে এল এলিভেটর। লম্বা করিডর। বাঁ দিকে সবশেষ দরজার মাথায় ঝকঝকে পিতলের উপর খোদাই করা 'রানা এজেন্সী—প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার্স'।

দরজা ঠেলে পুরু কার্পেটে মোড়া ঘরে ঢুকতেই ডোর-বেলের মিষ্টি টুং-টাং একটা আওয়াজ হলো। হাফ হাতা সাদা শার্ট, হালকা নীল জিনসের সরু-পা প্যান্ট পরে সালমার চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগের সাথে একটা প্যাডে কি যেন লিখছে রানা এজেন্সী ঢাকার শাখা-প্রধান গিলটি মিয়া। সালমাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভিতরের একটা কামরা থেকে ভেসে আসছে চুড়ির মৃদু টুং-টাং, তার সাথে অস্পষ্ট একটা পুরুষ কণ্ঠ।

ডোর-বেলের শব্দে মহা বিরক্ত হয়ে গজ্‌গজ্ করে উঠল গিলটি মিয়া, 'যা ভেবেচি। শুব কাজে বাদা...' মুখ তুলে রানাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সরল দুই চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, পরমুহূর্তে প্যাড থেকে হ্যাঁচকা টানে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। কাগজ ধরা হাতটা উঠে গেল কপালে, 'আ-আদাব, স্যার। আ-আমি ভেবেচিলুম...'

সালমার টেবিলের সামনে দাঁড়াল রানা। পাইপটা অ্যাশট্রেতে ঠুকে ছাই ঝাড়ছে। 'শুভ কাজটা কি, গিলটি মিয়া?'

'জী?' ঢোক গিলল গিলটি মিয়া। হড়বড় করে বলল, 'কিচুই নয়, স্যার। এই মানে, বিয়ে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কিছু নয় মানে বিয়ে?' উপর নিচে মাথা দোলাল একবার ও। 'আচ্ছা, এ্যাদ্দিনে তাহলে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল গিলটি মিয়া। পরমুহূর্তে সড়াৎ করে জিভটা ঢুকিয়ে নিল মুখের ভিতর। 'ভুল বুজচেন, স্যার। আমার লয়, বিয়েটা সালমা বেগমের।' কথা

শেষ করে ভয়ে ভয়ে ভিতরের কামরার দরজার দিকে তাকাল সে।

'সালমার সাথে আর একজন রয়েছে ওখানে—কে?' জানতে চাইল রানা।

অপরাধীর মত মুখ করে রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া। 'পাশের আপিসের লোক, স্যার। বয়স আপনার চেয়ে কিচু কম, দেখতে রাজপুত্তুর, আপনি আপিসে না থাকলে সালমা বেগমের কাচে ভিক্ চাইতে আসে।'

'ভিক্ষা চাইতে আসে? মানে?'

মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল গিলটি মিয়ার। ইতস্তত করছে। তারপর বলল, 'মানে···স্যার, ঠিক বুজিয়ে বলতে পারচি না—প্রেম না কি ছাই যেন বলে, সেইটা চাইতে আসে আর কি। আড়াল থেকে শুনতে পেলুম, সালমা বেগম রাজি হয়েচেন, তাই···' নিজের হাতে ধরা প্যাডের কাগজটার দিকে বোকার মত তাকাল সে।

'কি ওটা?' গিলটি মিয়ার হাত থেকে কাগজটা টেনে নিল রানা। চোখের সামনে মেলে ধরতে দেখল আঁকাবাঁকা অক্ষরে তাতে লেখা রয়েছে: শুভ বিবাহ॥ কেনাকাটার ফর্দ॥ তালিকার শীর্ষে লেখা: বিয়ের শাড়ি, একখানা জামদানী=২৫০০.০০·(আড়াই হাজার টাকা), তার নিচে লেখা: গহনা (স্বর্ণের দোকান বন্ধ, তাই রাঙার মার কাচ থেকে কিচু গহনা ধার হিসেবে চেয়ে লিতে হবে।)

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'রাঙার মা গহনা পাবে কোথায়?'

অনাবিল সকৌতুক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গিলটি মিয়ার মুখ। সংক্ষেপে জানাল, 'আচে।'

'আছে মানে?'

'হে-হে,' হাসছে গিলটি মিয়া। 'আপনার কাচ থেকে বাজার খরচার টাকা চেয়ে লিয়ে জমায়, হাজার টাকা হলেই আদ-ভরি করে সোনা কিনিয়ে লেয় আমাকে দিয়ে। সোহানাদির সাতে আপনার বিয়ে দেবে কিনা, তাই···'

আরে, সবিস্ময়ে ভাবল রানা—ভিতরে ভিতরে এতদূর এগিয়ে গেছে এরা! সবাই তো জানত, শুধু ওরই কিছু জানা ছিল না। আশ্চর্য!

গালভর্তি হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে গিলটি মিয়া। মুখে গাম্ভীর্য টেনে এনে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'নাও, আমি এসেছি বলে পিলে দুটো চমকে দাও ওদের।'

সুড় সুড় করে এগিয়ে গেল গিলটি মিয়া। দরজা দিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল, তারপর এগোল রানার চেম্বারের দিকে। সালমা আর তার প্রেমিক সেখানেই মগ্ন হয়ে আছে নিজেদেরকে নিয়ে।

সালমার সুরেলা গলার অস্পষ্ট হাসি শুনতে পাচ্ছে রানা। তারপরই শোনা গেল খুক্ করে গিলটি মিয়ার কাশির আওয়াজ।

মুচকি একটু হেসে পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল রানা। লাইটার জ্বালল। পাইপে আগুন ধরাতে যাবে, বুম্‌ম্ করে বিকট বিস্ফোরণ হলো। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা। দড়াম করে ধাক্কা খেল গিয়ে ছয় হাত দূরের দেয়ালের গায়ে। কানে তালা লেগে গেছে। গোটা বিল্ডিংটা থরথর করে কাঁপছে এখনও।

হুড়মুড় করে ধসে পড়ে গেছে একদিকের দেয়াল। ধুলোবালি উড়ছে কামরার ভিতর, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। অস্পষ্ট ভাবে যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে গিলটি মিয়ার গোঙানির শব্দ।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। এক হাত দিয়ে ঘাড়টা ডলছে। পার্টেক্সের পার্টিশনগুলো ভেঙেচুরে স্তূপের আকারে জড় হয়ে আছে সামনে। দুটো কামরার কিছুই অবশিষ্ট নেই। শ্রবণশক্তি ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। টলতে টলতে করিডরের দরজার দিকে এগোল ও। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথার ভিতর। প্রথম কাজ দরজাটা বন্ধ করা।

দরজা বন্ধ করার সময় অসংখ্য লোকের শোরগোল, চেঁচামেচি কানে ঢুকল ওর। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে খ্যাঁচ করে ব্যথা লাগল ঘাড়ে। এগোল ধ্বংস স্তূপের দিকে।

পাশের দেয়ালটা ধসে পড়েছে, ওপাশে নির্জন কামরা দেখা যাচ্ছে একটা। রানা এজেন্সীরই ভাড়া নেয়া কামরা ওটা, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওটা ব্যবহার করা হয় না। ওটা যে রানা এজেন্সীর কামরা, ওরা তিনজন এবং বিল্ডিংয়ের ম্যানেজার ছাড়া আর কারও জানা নেই।

দ্বিতীয় কামরার ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। দ্রুত হাতে ইঁট, বালি, পার্টেক্সের টুকরো সরিয়ে ফেলল, তারপর টেনে হিঁচড়ে বের করল অজ্ঞান গিলটি মিয়াকে। মাথা ফেটে গেছে তার। বুকে এবং পাঁজরে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে সে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে হাসপাতালে না পাঠাতে পারলে বাঁচানো যাবে না।

সালমা আর তার পাণি প্রার্থী যুবকটিকে পরীক্ষা করার দরকার নেই। পার্টেক্সের পার্টিশন সরিয়েই বুঝে নিল রানা, সালমার ঘাড় মটকে গেছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে তার। যুবকটিকে চেনার কোন উপায় নেই। খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়েছে তার। দেয়াল ধসে পড়ে থেঁতলে গেছে মুখ, চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রইল রানা। দ্রুত কি যেন ভাবল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে এল প্রথম কামরায়।

ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে দেখল ডায়াল টোন রয়েছে এখনও। দ্রুত একটা বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করছে ও।

অপর প্রান্ত থেকে সোহেল আহমেদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল রানার কানে, 'ইয়েস?'

'রানা। রানা এজেন্সীতে এইমাত্র একটা টাইম বম্ব ফেটেছে। সালমা নেই। আরেক লোক, মনে কর আমি, নেই। গিলটি মিয়াকে এক্ষুণি হাসপাতালে পাঠানো দরকার। আমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি, প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করবি তুই।'

সোহেলকে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে খটাশ করে ক্রাডলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা। শেষবারের মত দেখে নিল সালমা ও গিলটি মিয়ার মুখ। গাল দুটো কুঁচকে উঠছে দেখে ঝট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

এবং সেই মুহূর্ত থেকে লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেল ও।

পাঁচ মিনিট পর দুটো অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল মস্ত বিল্ডিংটার সামনে।

হাসপাতালের ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন লোক লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। স্ট্রেচার নিয়ে ছুটল তারা এলিভেটরের দিকে।

রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের মধ্যে একজন বিদেশীকেও দেখা যাচ্ছে। বিস্ফোরণের শব্দে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে সে-ও। লোকটা ইউরোপীয়ান, হাতে একটা ক্যামেরা। দর্শকরা তাকে সাংবাদিক বলেই ধরে নিল।

স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হচ্ছে আপাদ মস্তকে চাদরে ঢাকা লাশ। বিদেশী সাংবাদিক দুটো লাশেরই ছবি তুলল। গিলটি মিয়া বেঁচে আছে তখনও, কিন্তু জ্ঞান নেই। মারা যায়নি বলে চাদর দিয়ে ঢাকা হয়নি তাকে। বিদেশী লোকটা আহত গিলটি মিয়ারও ছবি তুলল একটা।

লাশ দুটো অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো। হুশ করে বেরিয়ে গেল সেটা। তার পিছু নিল দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সটা। এটায় গিলটি মিয়া আছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

তিন

ইটালি। ঐতিহাসিক রোম নগরীর অভিজাত এলাকার ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় রানা এজেন্সীর ব্রাঞ্চ। দোতলায় শাখা-প্রধান কন্টেসা (সাবেক) মারদাস্ত্রোয়ানি মোনিকা আলবিনো থাকে। মোনিকার সাথেই থাকে ইস্পাত কঠিন পেশীর অধিকারী বিশালদেহী গরিলা সাবাদগনা ম্যাটাপ্যান। ম্যাটাপ্যানও রানা এজেন্সীর কর্মী। মোনিকার সাথে তার সম্পর্ক বাপ-বেটির মত। কোন রকম আপদ বিপদের আঁচ যাতে মোনিকাকে স্পর্শ করতে না পারে সেজন্যে মোনিকার শৈশব থেকে গত ত্রিশটা বছর সে ছায়ার মত সাথে লেগে আছে তার সাথে।

আজ সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখ। গত একটা হপ্তা রানা এজেন্সীর এই শাখায় তালা ঝুলছে, কাজকর্ম সব বন্ধ। যে-সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, সব বাতিল করে দেয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে শাখা-প্রধান মোনিকা অসুস্থ।

অফিস বন্ধ হলেও রানা এজেন্সীর কর্মচারীদের আনাগোনা আরও নিয়মিত হয়েছে এই ক'দিন। ভোর পাঁচটার সময় একদল ঢোকে বাড়িতে, আরেকদল বেরিয়ে যায়। আবার বিকেল পাঁচটায় আসে একদল, একটু পরই বেরিয়ে যায় আগের দলটি—এভাবে পালাক্রমে গোটা বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে প্রায় ত্রিশ জন স্বাস্থ্যবান, সুবেশ, কঠোর চেহারার সশস্ত্র যুবক। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগার কোন কারণ নেই। ওদের প্রিয় 'দৈত্য শিশু' ম্যাটাপ্যান ভাই পাহারা দেবার জন্যে এমন সব জায়গা বেছে প্রত্যেকের দাঁড়াবার ব্যবস্থা করেছে যে বাইরের কেউ, এমন কি প্রতিবেশীরাও তাদের অস্তিত্ব টের পায় না। হঠাৎ কেন এই কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা, এ-সম্পর্কে এজেন্সীর কর্মীরাও কিছু জানে না। অবাঞ্ছিত কৌতূহল প্রকাশ করা স্বভাব নয় এদের কারও। তাই এ সম্পর্কে তারা ম্যাটাপ্যান বা মোনিকাকে কোন প্রশ্ন করেনি। এই ক'দিন ম্যাটাপ্যানকেই

শুধু দেখতে পাচ্ছে তারা. মোনিকাকে খুব কম—মাঝে মধ্যে দেখা যায়। কোন একটা গোপন রহস্য আছে. এর বেশি কিছু জানে না কেউ। জানতে চায়ও না।

আসল রহস্য মাসুদ রানা। ছদ্মবেশ নিয়ে মোনিকার আস্তানায় উঠেছে ও। গত মাসে প্যারিস থেকে রোম হয়ে ঢাকায় যাবার সময় মোনিকাকে ইউনিয়ন কর্স এবং বর্তমান কাপু উ সেন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে এমন সব বই এবং পত্র-পত্রিকার একটা তালিকা দিয়ে গিয়েছিল ও। বিস্তর ঘোরাঘুরি করে প্রচুর বই এবং পত্রিকা সংগ্রহ করেছে মোনিকা। রানার তালিকার বাইরেও যেখানে ওদের সম্পর্কে যা পেয়েছে, যোগাড় করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ বই ও পত্রিকা নিজে পড়ে ইউনিয়ন কর্স এবং তার বর্তমান কাপু উ সেন সম্পর্কে যেখানেই কোন তথ্য দেখেছে সে, লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে রেখেছে। এতে অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেছে রানার। সারাদিন বিছানায় শুয়ে-বসে দাগ দেয়া লাইনগুলো পড়ে যাচ্ছে ও। মাঝে মধ্যে নোট করছে। ওদিকে মোনিকারও ছুটি নেই। পত্রিকার স্তূপের মধ্যে বসে দিনের মধ্যে বারো ঘণ্টা পড়ছে, দাগ দিচ্ছে।

রানার অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করে প্রথম দিকে ঘাবড়ে গিয়েছিল মোনিকা। কাজের ফাঁকে কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে সে। কখনও অস্থিরভাবে পায়চারি করে। আড়াল থেকে একবার দেখে ফেলেছে মোনিকা, প্রচণ্ড আক্রোশে হিংস্র হয়ে উঠেছিল রানার মুখের চেহারা। দুম্ করে টেবিলে ঘুসি মেরে বিড়বিড় করে বলছিল, 'তোমার রক্ত পান করতে পারলে আমার শান্তি হত। খেয়ে-দেয়ে তাজা থাকো উ সেন, আমি আসছি।' কথা প্রায় বলেই না রানা। একবারও তাকে হাসতে দেখেনি মোনিকা। ভয়ে ভয়ে একবার জিজ্ঞেস করেছিল সে, 'ঠিক কি করতে চাইছ তুমি, রানা?'

'আমার জীবনে উ সেন একটা সমস্যা। উপড়ে ফেলতে চাই।' এর বেশি কিছু বলেনি ও।

চার তারিখ রাতে শেষ হলো কাজ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দু'জন। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেনি রানা। উ সেন সম্পর্কে বিশেষ নতুন কিছু জানতে পারেনি ও। ইউনিয়ন কর্সের কাপু সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে হলে লন্ডনে যেতে হবে ওকে। যাবার ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে। ম্যাটাপ্যানকে দিয়ে আজ রাতের লন্ডন ফ্লাইটের টিকেট বুক করানো হয়েছে। প্যাসেঞ্জার হিসেবে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে ও—সান্তিনো ভ্যালেন্টি, একজন ইটালিয়ান, ট্যুরিস্ট হিসেবে লন্ডনে যাচ্ছে।

লন্ডনে কোন হোটেলে উঠবে না রানা। চিঠির মাধ্যমে লন্ডনের একটা এজেন্সীর সাহায্যে প্যাডিংটনের প্যারেড স্ট্রীটের একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে ও। এই রোম থেকে চিঠি পাঠিয়ে আরও একটা কাজ সেরে রেখেছে। রয়্যাল লাইব্রেরী সহ লন্ডনের বেশ কয়েকটা বড় লাইব্রেরীকে অনুরোধ করেছে, লন্ডনে ওর সদ্য ভাড়া নেয়া বাড়ির ঠিকানায় তারা যেন পৃথিবী কুখ্যাত গুপ্ত সংগঠনগুলো সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত বই-পত্র পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর নামে বই-পত্রের দাম হিসেবে কিছু কিছু টাকা চেকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে ও।

চার তারিখ রাত এগারোটায় লন্ডন এয়ারপোর্টে নামল রানা। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেল প্যাডিংটন এলাকার প্যারেড স্ট্রীটে, ভাড়া করা সেই বাড়িতে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বাড়িটার গেটের পাশে লেটার বক্সের সামনে দাঁড়াল রানা। ফোকর দিয়ে ভিতরে হাত ঢোকাতেই চাবির গোছাটা পাওয়া গেল।

ছোট্ট বাড়িটা। হালকা কিন্তু দামী আসবাবপত্রে ছিমছামভাবে সাজানো। পরদিন সকালের ডাকেই অধিকাংশ লাইব্রেরী থেকে পত্র-পত্রিকা এসে পৌঁছল। টেলিফোন ব্যবহার করে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সব আনিয়ে নিল রানা স্থানীয় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে। মাছ ধরার জন্যে হুইল, রড ও আর্টিফিশিয়াল বেইটের একটা দামী সেট এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু জিনিসও আনাল। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ নতুন ভাড়াটের সাথে পরিচয় করতে এলে রানা তাদেরকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে দিল কয়েকদিনের মধ্যেই আইসল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবে সে, উদ্দেশ্য: মৎস্য শিকার।

লন্ডনের এই বাড়িটা ছেড়ে প্রথম দিকে প্রায় বেরোলই না রানা। একটানা ক'দিন পড়াশোনা করে ইউনিয়ন কর্স এবং তার কাপু সম্পর্কে যা কিছু জানল সে, সব স্মৃতির মধ্যে গেঁথে রাখল সযত্নে, প্রয়োজনের মুহূর্তটিতে যাতে মনে পড়ে যায়।

কিন্তু বিষয় দুটো নিয়ে এত পড়াশোনা করেও অদৃশ্য হবার পর থেকে যে প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজছে তার কোন হদিস পায়নি ও। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হপ্তা পেরিয়ে গেল, কিন্তু এখনও ঠিক করতে পারেনি—আঘাতটা কখন, কোথায় এবং কিভাবে হানবে ও।

সবশেষে, দশ তারিখ সকালে, নোটবুকটা নিয়ে বসল ও। গত চোদ্দ-পনেরো দিন ধরে যা পড়াশোনা করেছে তার সারাংশ এতে টোকা আছে। গভীর মনোযোগের সাথে নোটবুকের পাতাগুলো পড়তে পড়তে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা তারিখের কথা মনে পড়ে গেল ওর। সাথে সাথে পানির মত সহজ উত্তরটা ধরা দিল ওর মগজে। এতগুলো দিন নষ্ট হবার আগেই কেন এত সহজ একটা ব্যাপার ওর মাথায় আসেনি ভেবে নিজেকে একটু তিরস্কার করল ও। কিন্তু উত্তরটা পাবার আনন্দে নিজেকে মাফও করে দিল সাথে সাথে।

প্রতি বছর অন্তত একটা দিন ইউনিয়ন কর্সের কাপুকে জনসমক্ষে বের হতেই হবে। খারাপ আবহাওয়া থাকুক, শারীরিক অসুস্থতা হোক, ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি থাকুক, সেদিন কাপুকে লোকে লোকারণ্য একটা অনুষ্ঠানে আসতেই হবে। গত তিনশো বছরে প্রায় একশো কাপু এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম পালন করে এসেছে, ব্যতিক্রমের কোন দৃষ্টান্ত নেই। এরপর রানার প্রস্তুতি পর্বে যুক্ত হলো প্র্যাকটিক্যাল প্ল্যানিং এবং গ্রাউন্ড ওয়র্ক।

কখন?

কোথায়?

একই সাথে উত্তর পাওয়া গেছে দুটো প্রশ্নের। এবার তৃতীয়, শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে রানা:

কিভাবে?

বিদ্যুৎ চমকের মত কোন ধারণা হঠাৎ মাথায় এসে পড়বে, এরকম কিছু আশা করা এক্ষেত্রে বৃথা। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একের পর এক চুরুট পুড়িয়ে ছাই করছে রানা, ফ্লাস্ক ভর্তি উত্তপ্ত কফি

শেষ করছে, আর ভাবনা চিন্তা করছে। এক এক করে কয়েক ডজন পদ্ধতির কথা ভাবল ও, খুঁটিয়ে বিচার করল প্রত্যেকটি, তারপর এক এক করে বাতিল করে দিল সবগুলো। বাতিল করল বটে, প্রতিটি পদ্ধতির পছন্দসই কিছু অংশ কাজে লাগবে ভেবে মনের একধারের একটা কুঠুরিতে জমা করে রাখল। সেই ক্ষুদ্র অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে, তার সাথে আরও কিছু যোগ করে শেষ পর্যন্ত নিটোল একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলল ও। নানান দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্ল্যানটা নিয়ে ভাবল ও। কোন খুঁত পেল না কোথাও। গোটা ব্যাপারটা খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। কখন? কোথায়? কিভাবে? উত্তর মিলে গেছে তিন প্রশ্নেরই।

'উফ্!' স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে উঠল ও। ধীরে ধীরে কালো হয়ে গেল মুখের চেহারা। মনে পড়ে গেছে রক্তাক্ত গিলটি মিয়ার চেহারাটা। হুড়মুড় করে ফিরে এল কতদিনের কত কি রাজ্যের স্মৃতি। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে, কিছুই জানা নেই ওর। বেঁচে আছে গিলটি মিয়া? মনে হয় না। বড় দুর্বল শরীর তার। পরক্ষণে ভাবল, মার খাওয়া শরীর, বেঁচে যেতেও পারে। হঠাৎ লজ্জা পেল রানা। নিজেকে শাসাল, এ্যাই, কি হচ্ছে, ভাবাবেগে আক্রান্ত হচ্ছ কেন? ভিজে চোখের দুই কোণ মুছল রানা। ঢাকা ছাড়ার পর থেকে গিলটি মিয়া সম্পর্কে কোনরকম ভাবনা চিন্তার অবকাশ দেয়নি সে নিজেকে। কারণ গিলটি মিয়ার সূত্র ধরে মনে পড়বে সালমার কথা। মনে পড়বে সালমার প্রেমিকের কথা। তাতে মন খারাপ হয়ে যাবে, দুর্বল হয়ে পড়বে ও। কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। নিজেকে ভাবাবেগ মুক্ত রাখার স্বার্থেই মন থেকে ওদের কথা মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে ও।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল রানা। ধীরে ধীরে চেহারা বদলাচ্ছে আবার ওর। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল মুখে। চোখ দুটো নিষ্পলক। সাদা দেয়ালের গায়ে নিবদ্ধ। হাত দুটো আপনা আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। টকটকে লাল মুখের রঙ। ধীরে ধীরে মৌন একটা আক্রোশ ফুটে উঠল দুই চোখের দৃষ্টিতে। বিড় বিড় করে বলল রানা, 'যত নিরাপদেই তুমি থাকো, উ সেন, আমি আসছি।'

কাপু উ সেন সম্পর্কে একচুল ভুল ধারণা নেই রানার। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যক্তি এখন সে। আমেরিকার নিহত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নিরাপত্তা প্রহরা প্রায় নিখুঁত ছিল, কিন্তু পুরোপুরি নিখুঁত ছিল না। সেই সামান্য একটু খুঁতের কারণেই উনিশশো তেষট্টি সালে সাধারণ এক আততায়ী ডালাসে তাঁকে খুন করতে সমর্থ হয়। ইউনিয়ন কর্স এ সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ, প্রাপ্ত তথ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আততায়ীর হাতে নিহত বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা প্রহরা সম্পর্কে যা কিছু জানার সবই জানা আছে কাপু উ সেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের। শুধু তাই নয়, বর্তমান বিশ্বের জীবিত রাষ্ট্রপ্রধানদের সর্বশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর পায় তারা এবং যেটা নিখুঁত বলে মনে হয় সেটাকে উ সেনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে যোগ করে নিতে মুহূর্তমাত্র দেরি করে না। আরেকটা ব্যাপারে রানা সচেতন। তা হলো ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী ছাড়াও উ সেনকে সম্ভাব্য আততায়ীর বুলেট থেকে রক্ষা করার জন্যে ফ্রেঞ্চ পুলিস, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ, সিক্রেট সার্ভিস, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সদা প্রস্তুত হয়ে আছে। বিস্ময়কর এবং

অবিশ্বাস্য শোনালেও এই তথ্যের মধ্যে একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তার নিরাপত্তা প্রহরার চেয়ে কয়েকশো গুণ কড়া প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে কাপু উ সেনের। কারণটা সহজেই অনুমেয়—শত্রুর সংখ্যা সীমা নেই কাপুর। কেবল বাইরে নয়, ঘরেও রয়েছে তার শত্রু।

যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের মনে হবে, এই যখন পরিস্থিতি, উ সেনকে হত্যা করার পরিকল্পনা পাগল ছাড়া আর কেউ করবে না। এবং সেই পাগলের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

কিন্তু নিজেকে রানা পাগল বলেও মনে করছে না, মরতেও রয়েছে ওর ঘোর আপত্তি; ও ভরসা করছে পরিস্থিতির অনুকূল দিকটার উপর। এই অনুকূল দিকটাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ও। এক, ওর অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইউনিয়ন কর্স কিছুই জানে না। দুই, নির্বাচিত দিনে ক্ষমতার গর্বে গর্বিত, শক্তিমদমত্ত কাপু কয়েক শতাব্দীর রীতি অনুযায়ী নিরাপদ দুর্গ ছেড়ে কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও বাইরে বেরিয়ে আসবে, বিপদের যত বড় ঝুঁকিই থাকুক না কেন।

ক্যাস্ট্রাপ কোপেনহেগেন থেকে আগত SAS-এর প্রকাণ্ড যাত্রীবাহী বিমানটা ধীরে ধীরে থামল লন্ডন এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবনের সামনে। আরও কয়েক সেকেন্ড শোনা গেল ইঞ্জিনের বিকট গর্জন, তারপর আস্তে আস্তে তাও থেমে গেল। চাকা লাগানো সিঁড়ি দুটো ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বিমানবন্দর কর্মীরা। বিমানের দোরগোড়ায় সে দুটো লাগানো হলো। দরজা খুলে হাসি মুখে বেরিয়ে এল এয়ারহোস্টেস। সার বেঁধে বেরিয়ে আসছে আরোহীরা। এয়ারহোস্টেসের পাশ ঘেঁষে নামার সময় মুখস্থ বুলি শুনে সৌজন্যের মৃদু হাসি ফুটছে প্রত্যেকের মুখে।

উঁচু অবজারভেশন টেরেসে এক মাথা সোনালী চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যবান, সুবেশ এক ইটালিয়ান। গাঢ় রঙের চশমাটা ঠেলে কপালে তুলে দিল সে, চোখের সামনে একটা বিনকিউলার তুলল।

এটা নিয়ে আজ ছয়টা বিমানের আরোহীদের দূর থেকে এভাবে লক্ষ করছে সান্তিনো ভ্যালেন্টি ওরফে রানা। অবজারভেশন টেরেসে আরও অনেক লোক অপেক্ষা করছে সদ্য আগত আরোহীদের মধ্যে থেকে নিজেদের আত্মীয়, বন্ধুদের চিনে নেবার জন্যে, রানার আচরণ তাই কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করছে না।

একটু নিচু হয়ে বিমানের দরজা টপকে আলোয় বেরিয়ে এসে সিধে হলো আট নম্বর আরোহী। লোকটাকে দেখেই শরীরের পেশীতে একটু টান পড়ল রানার, লোকটাকে অনুসরণ করে সিঁড়ির নিচে পর্যন্ত নেমে এল ওর দৃষ্টি। পোশাক দেখে মনে হলো আরোহী ডেনমার্কের একজন ধর্মযাজক। ডগ কলার লাগানো গ্রে রঙের ক্ল্যারিক্যাল স্যুট পরনে। লোহায় ধরা মরচের মত রঙ চুলের, মাঝারি করে ছাঁটা, কপাল থেকে পিছন দিকে পরিপাটিভাবে ব্রাশ করা। বয়স অনুমান করল রানা—বাইশ। তবে মুখের চেহারা সজীব, আরও অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছে। দীর্ঘদেহী, সরু কোমর, কাঁধ দুটো চওড়া। প্রায় রানার মতই কাঠামো শরীরের।

আরোহীরা পাসপোর্ট আর কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্সের জন্যে অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে

লাইন দিচ্ছে। চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল রানা। পাশ থেকে ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে খুলল। বিনকিউলারটা ব্রীফকেসে ভরে আবার বন্ধ করল সেটা। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নামল মেইন হলে।

পনেরো মিনিট পর ডেনিশ পাদ্রী কাস্টমস্ হল থেকে বেরিয়ে এল মেইন হলে। একহাতে হ্যান্ডব্যাগ, অপর হাতে সুটকেস। তাকে রিসিভ করার জন্যে কেউ আসেনি। সোজা হেঁটে এসে ব্যাঙ্কের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল সে চেক ভাঙাবার জন্যে।

একটা বুকস্টলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ব্রীফকেসটা পায়ের সামনে রেখে সামনে মেলে ধরেছে একটা দৈনিক পত্রিকা, পড়ছে না, রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে ডেনিশ ধর্মযাজকের দিকে। ব্যাঙ্ক কাউন্টার থেকে সরে এসে মেইন হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা। কাগজটা ভাঁজ করে বগলের নিচে ঢুকিয়ে রাখল রানা। ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে অনুসরণ করল পাদ্রীকে।

এয়ারপোর্ট ভবন থেকে বেরিয়ে সোজা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল লোকটা। তার পিঠ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে একটা ওপেন স্পোর্টস মডেল গাড়ির সামনে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে ব্যাকসীটে রাখল ব্রীফকেসটা। উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। ঘাড় ফেরাতেই দেখল একটা ট্যাক্সিতে চড়ছে পাদ্রী।

ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিল, নাক ঘুরিয়ে ছুটল কিংসব্রীজের দিকে। অনুসরণ করছে রানা।

হাফমুন স্ট্রীটের ছোট্ট কিন্তু সুদৃশ্য একটা হোটেলের সামনে থামল ট্যাক্সি। সেটার পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল স্পোর্টস কার। কয়েক মুহূর্ত পর কার্জন স্ট্রীটের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পার্কিং লট দেখে গাড়ি থামাল রানা। ব্রীফকেস হাতে নিয়ে নামল ও। পিছনের বুটে ব্রীফকেস রেখে তালা লাগিয়ে দিল। ছোট হোটেলটায় হেঁটে ফেরার পথে শেফার্ড মার্কেটের বুক-শপ থেকে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডের দুপুর সংস্করণ কিনল একটা। হোটেলের রিসেপশন হলে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট লাগল ওর।

একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে রানা। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে। তারপর সিঁড়ির মাথায় দেখতে পেল ডেনিশ ধর্মযাজককে। নিচে নেমে এসে রিসেপশনিস্টের হাতে কামরার চাবি তুলে দিল সে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা একটা হুকে গলিয়ে দিল চাবির রিঙটা। চাবির গোছাটা দুলছে। ধীরে ধীরে থামল সেটা। এখন রানা পরিষ্কার পড়তে পারছে চাবির নম্বরটা—সাতচল্লিশ।

একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকছে ধর্মযাজক।

বসেই আছে রানা। এক দুই করে আরও পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। কাউন্টারের সামনে একজন গেস্টের সাথে কথা বলছে রিসেপশনিস্ট। গেস্ট লোকটা স্থানীয় একটা থিয়েটার হলের ঠিকানা, অনুষ্ঠান-সূচী এবং অনুষ্ঠানের সময় জানতে চাইছে। তাকে অপেক্ষা করতে বলে মেয়েটা ভিতরের কামরায় চলে গেল তথ্য সংগ্রহ করতে। এই সুযোগে চেয়ার ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল রানা।

দোতলার সাতচল্লিশ নম্বর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মাথার কাছে

সামান্য একটু বাঁকানো এবং দু'ভাগ করা দু'ইঞ্চি লম্বা একটা ইস্পাতের টুকরো বের করল সে। ফুটোয় সেটা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক ক'বার ঘোরাতেই ক্লিক করে খুলে গেল তালা।

কামরায় ঢুকেই বেডসাইড-টেবিলের উপর পাসপোর্টটা দেখল রানা। পাশেই মানিব্যাগ এবং ট্র্যাভেলার্স চেকের ফোল্ডার পড়ে রয়েছে। পাসপোর্টটা তুলে পকেটে ভরে নিয়ে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে করিডরে বেরিয়ে এল ও। টাকা পয়সা ছোঁয়নি। ও আশা করছে, কিছুই চুরি যায়নি দেখে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ধর্মযাজককে বোঝাবার চেষ্টা করবে পাসপোর্টটা সে অন্য কোথাও হারিয়েছে।

ঘটলও তাই। মাথাভর্তি সোনালী চুল বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ইটালিয়ানকে ধর্মযাজকের কামরায় ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি কেউ। লাঞ্চ সেরে আধঘন্টা পর নিজের কামরায় ফিরল ধর্মযাজক, কিন্তু টেবিলে পাসপোর্ট আছে কি নেই তা সে লক্ষই করল না, বিকেলে শহর দেখতে যাবার সময় হুঁশ হলো তার। কামরার সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও যখন পাসপোর্টের কোন হদিস মিলল না। নিচে নেমে এসে ম্যানেজারকে সে জানাল ব্যাপারটা। ম্যানেজার সব শুনে বলল টাকা পয়সা যখন সব ঠিক আছে, তাহলে মনে করতে হবে কামরায় চোর ঢোকেনি, পাসপোর্ট আপনি অন্য কোথাও হারিয়ে এসেছেন। তাই হবে, আত্মভোলা পাদ্রী মনে মনে ভাবল। পরদিন সে ব্যাপারটা জানাল ডেনিশ কনস্যুলেট-জেনারেলকে। এখান থেকে তাকে কিছু ট্রাভেল ডকুমেন্টস দেয়া হলো, যার সাহায্যে ভ্রমণ শেষ করে পনেরো দিন পর কোপেনহেগেন ফিরে যেতে পারবে সে। কনস্যুলেট-জেনারেলের একজন কেরানী অভিযোগের খাতায় লিখল Sankt Kjeldskirke, Copenhagen-এর Pastor Per Benson তার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছেন। ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল। সেদিন ১৪ সেপ্টেম্বর।

দু'দিন পরই একই ধরনের আরেকটা ঘটনা ঘটল। এবার পাসপোর্ট হারাল একজন আমেরিকান ছাত্র। নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে একটা প্লেন নামল হিথরো বিমানবন্দরে, থামল এয়ারপোর্টের ওসেনিক বিল্ডিংয়ের সামনে। প্লেন থেকে নেমে কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে মেইন হলে ঢুকে সোজা সে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কের কাউন্টারে চলে এল ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙাবার জন্যে। নিয়ম অনুযায়ী পাসপোর্টটা বের করে কাউন্টারে রাখল সে। চেক ভাঙিয়ে জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে টাকাগুলো রাখল, পাসপোর্টটা রাখল চেনওয়ালা একটা পাউচে। তারপর পাউচটা ছোট একটা হ্যান্ডব্যাগের বাইরের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পর, একজন পোর্টারকে হাত ইশারায় ডাকার জন্যে, হ্যান্ডব্যাগটা কাউন্টারের উপর রাখল, এর তিন সেকেন্ড পর কাউন্টার থেকে সেটা ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেল। হকচকিয়ে গিয়ে ছাত্রটি পোর্টারকেই প্রথমে জানাল ব্যাপারটা। পোর্টার তাকে সাথে করে নিয়ে গেল প্যান আমেরিকান এনকোয়েরি ডেস্কে। ছাত্রটিকে উপদেশ খয়রাত করা হলো, নিকটতম টার্মিন্যাল সিকিউরিটি পুলিস অফিসারের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করো। ছাত্রটি তাই করল। সিকিউরিটি অফিসার তাকে সাথে করে নিয়ে গেল একটা অফিসে।

ভুলক্রমে নিজের মনে করে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে যেতে পারে কেউ, এই ধারণার

বশবর্তী হয়ে সিকিউরিটি পুলিস তৎক্ষণাৎ একটা অনুসন্ধান চালাবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় খাতায় রিপোর্ট লেখা হলো: একটা পাসপোর্ট চুরি গেছে।

পকেটমার আর ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য ইদানীং কি রকম বেড়েছে তা বর্ণনা করে দীর্ঘ এবং ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের অধিকারী মার্কিন ছাত্রটির কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করা হলো। কর্তৃপক্ষের ক্ষমা প্রার্থনার বহর দেখে মুগ্ধ হয়ে ছাত্রটি মিছিমিছি স্বীকার করল যে হ্যাঁ, এ ধরনের ঘটনার শিকার তার এক বন্ধুও একবার হয়েছিল, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন নিউ ইয়র্কে।

হ্যান্ডব্যাগ চুরি যাওয়ার ঘটনাটা নিছক রুটিন অনুযায়ী লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিসের সমস্ত ডিভিশনকে জানানো হলো। কিন্তু কয়েক হপ্তা পর যখন হ্যান্ডব্যাগ বা পাসপোর্ট কিছুরই হদিস পাওয়া গেল না, সংশ্লিষ্ট সবাই বেমালুম ভুলে গেল ব্যাপারটা।

এরমধ্যে মার্কিন ছাত্র স্মার্টি টোয়েন গ্রসভেনর স্কয়ারে নিজেদের কনস্যুলেটে গিয়ে পাসপোর্ট চুরির ঘটনা জানিয়ে ট্র্যাভেল ডকুমেন্টস সংগ্রহ করে নিল, একমাস পর স্কটল্যান্ড থেকে ফিরে এসে সে পাসপোর্ট ছাড়াই আমেরিকাগামী প্লেনে চড়তে পারবে।

পাদ্রী বেনসন এবং ছাত্র টোয়েনের বয়সের ব্যবধান বিস্তর হলেও শারীরিক কাঠামো এবং চেহারাগত ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে মিল অনেক। দু'জনই প্রায় ছয় ফিট লম্বা, চওড়া কাঁধের অধিকারী, সরু কোমর, চর্বিহীন সুঠাম শরীর, চোখের মণি কালো। এসব বিষয়ে এদের দু'জনের সাথে প্রায় হুবহু মিল রয়েছে পাসপোর্ট চোর ইটালিয়ান সান্তিনো ভ্যালেন্টি ওরফে মাসুদ রানার। তবে পাদ্রীর বয়স চল্লিশ, চুলের রঙ গ্রে, সে গোল্ডরিমের চশমা ব্যবহার করে পড়াশোনার জন্যে। আর স্মার্টি টোয়েনের বয়স বিশ, চুলের রঙ নারকেল ছোবড়ার মত ব্রাউন, সবসময় মোটা রিমের চশমা ব্যবহার করে সে।

প্যাডিংটনের প্যারেড স্ট্রীটের বাড়িতে বসে প্রচুর সময় নিয়ে পাসপোর্টের ফটো দুটো খুঁটিয়ে দেখে কি কি কিনতে হবে তার একটা তালিকা তৈরি করল রানা। পরদিনটা সম্পূর্ণ ব্যয় করল কেনাকাটার কাজে। কসমেটিকসের দোকানে ঢুঁ মারতে হলো কয়েকবার। চশমার দোকানে যেতে হলো। ওয়েস্ট এন্ড এলাকার এমন একটা জেন্টস ক্লোদিং শপ খুঁজে বের করল যারা আমেরিকান টাইপের পোশাক তৈরির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, এবং আমেরিকা থেকে আমদানী করা পোশাক খুচরো বিক্রি করে।

চশমার দোকান থেকে দু'জোড়া চশমা কিনল ও। একটা গোল্ডরিমের, অপরটি ভারী কালো ফ্রেমের, দুটোর জন্যে ক্লিয়ার লেন্স নিল। আরেক সেট ব্লু টিন্টেড ক্লিয়ার ভিশন কন্ট্যাক্ট লেন্সও নিতে ভুল করল না।

পোশাকের দোকান থেকে কিনল একজোড়া কালো চামড়ার স্নেকার, টি-শার্ট, আন্ডারপ্যান্টস, অফ-হোয়াইট স্ল্যাকস, আকাশ-নীল রঙের একটা নাইলন উইন্ডচিটার (সামনেটা জিপ-আপ এবং কলার কাফ যথাক্রমে লাল এবং সাদা উলের) সব নিউ ইয়র্কের তৈরি। এরপর নিল ধর্মযাজকের সাদা শার্ট, তারকাখচিত

ডগ-কলার এবং কালো বিব। শেষ তিনটে থেকে অত্যন্ত সাবধানে প্রস্তুতকারক কোম্পানীর লেবেল সরিয়ে ফেলল ও।

দিনের শেষ ঢুঁটা মারল রানা চেলসী-র একটা পুরুষদের টুপি এবং উইগ এম্পোরিয়ামে। চুলের রঙ মিডিয়াম গ্রে এবং নারকেল ছোবড়ার মত ব্রাউন করার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি দুই বোতল কলপ কিনল এখান থেকে। তরল কলপ চুলে লাগাবার জন্যে ছোট সাইজের কয়েকটা হেয়ার-ব্রাশ-ও কিনে নিল। এরপর, আমেরিকান পোশাকের কমপ্লিট সেট ছাড়া, আর কোন দোকান থেকে আর একটা জিনিসও কিনল না ও।

পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর। সান্তিনো ভ্যালেন্টির ছদ্মবেশ নিয়ে প্যাডিংটনের প্যারেড স্ট্রীটের বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা লে ফিগারো-র উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা, মাঝে মধ্যে মৃদু চুমুক দিচ্ছে বাঁ হাতে ধরা স্কচ হুইস্কির গ্লাসে। ভিতরের পৃষ্ঠার ছোট্ট একটা হেডিংয়ের উপর চোখ পড়তে মৃদু কৌতূহলী হয়ে খবরটা পড়ল ও।

খবরে বলা হয়েছে প্যারিসে পুলিস জুডিশিয়ারির শাখা ব্রিগেড ক্রিমিনেল-এর ডিপুটি চীফ কমিসেয়ার হাইপোলাইট দ্যুবে তাঁর কোয়াই ডি অরফেরেস অফিসে আচমকা হৃৎযন্ত্র বিকল হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমিসেয়ার হাইপোলাইটের আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলে ব্রিগেড ক্রিমিনেল-এর গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব কমিসেয়ার ক্লড র‍্যাবোর উপর দেয়া হয়েছে। এখন থেকে তিনি চীফ অভ হোমিসাইড ডিভিশনের দায়িত্ব সহ এই নতুন দায়িত্ব পালন করবেন।

প্যারিসের হোমিসাইড ডিভিশনের প্রধান প্রৌঢ় ক্লড র‍্যাবো সম্পর্কে অনেকদিন থেকেই অনেক কথা শুনে আসছে রানা। ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অবশ্য কখনও হয়নি ওর। শুনেছে জীবিতদের মধ্যে সারা বিশ্বে এতবড় গোয়েন্দা নাকি আর নেই। গোটা ফ্রান্সের আন্ডারওয়ার্ল্ডে ক্লড র‍্যাবোকে নাকি আজরাইল বলে ডাকা হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর উদ্যমের এমন সমন্বয় সাধারণত দেখা যায় না। তদন্ত পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব একটা ধারা আছে। ব্যাপক প্রস্তুতিই সেই ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অতি সাধারণ চেহারার, সাদামাঠা টাইপের, নিতান্ত বিনয়ী স্বভাবের এই ভদ্রলোক নাকি নিজে সরেজমিনে তদন্ত পরিচালনা করে অসংখ্য জটিল রহস্যের সমাধান করে থাকেন, কিন্তু আত্মপ্রচার পছন্দ করেন না। ব্যক্তিগতভাবে নিজেও একজন গোয়েন্দা বলে হোক, অথবা গুণী লোকদের কদর করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই হোক, ক্লড র‍্যাবোর সাথে পরিচিত হবার ইচ্ছে রানার অনেক দিন থেকেই। কিন্তু সময় এবং সুযোগ না পাওয়ায় ইচ্ছেটা অপূর্ণই থেকে গেছে।

আরও কিছুদিন অপূর্ণ থাকবে, কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল রানা। পরমুহূর্তে ক্লড র‍্যাবোর কথা ভুলে গেল। যদি জানত অচিরেই এই প্রতিভাবান গোয়েন্দাপ্রবরই ওর চরম শত্রু হয়ে দেখা দেবেন, এত তাড়াতাড়ি তাঁর কথা ভুলত না ও।

লন্ডন এয়ারপোর্টে দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ শুরু করার আগেই একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে রানা। তা হলো, অভিযানে সে একটা জাল পরিচয় ব্যবহার

করবে। বৃটেনে জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করা কিছু সময় সাপেক্ষ হলেও, অসম্ভব নয়। অনায়াসে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোবার জন্যে মার্সেনারি, স্মাগলার এবং সন্ত্রাসবাদীরা যে পদ্ধতিতে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে থাকে, সে-ও সেই পদ্ধতির শরণাপন্ন হলো।

গ্লাসের হুইস্কিটুকু এক ঢোকে শেষ করে উঠে পড়ল রানা। বাড়িতে তালা লাগিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। টেমস ভ্যালির হোম কাউন্টির ভিতর ঢুকে ছোট ছোট অনেকগুলো গ্রামে গেল। এইসব গ্রামগুলো একটার কাছ থেকে আরেকটা অনেক দূরে। প্রত্যেকটি স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। প্রতিটি গ্রামেরই নিজস্ব সমাধিক্ষেত্র আছে। কয়েকটি সমাধিক্ষেত্র থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বেরিয়ে এল ও। অবশেষ সপ্তম সমাধিক্ষেত্রে কবরের উপর শ্বেত-পাথরের একটা ফলক দেখে খুশি হয়ে উঠল মনটা। ফলকের উপর লেখা রয়েছে আলেকজান্ডার অরগ্যান, উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে আড়াই বছর বয়সে মারা গেছে। সমাধিক্ষেত্রে গির্জার একজন ভাতা-ভোগী প্রতিনিধি থাকে, তার কাজ কাদেরকে কবর দেয়া হয় তাদের পরিচয় ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা এবং সমাধিক্ষেত্রের উপযুক্ত ধর্মীয় রীতি পালনে সহায়তা করা। এদেরকে ভিকার বলা হয়। গ্রামেই তার বাড়ি এবং বাড়ির সাথে অফিস। লোকটা বৃদ্ধ এবং পরোপকারী। তাকে রানা জানাল যে সে একজন সৌখিন জেনিয়্যালজিস্ট, অরগ্যান পরিবারের বংশানুক্রম আবিষ্কারের ইচ্ছা নিয়ে এখানে এসেছে। নানান সূত্রে সে জানতে পেরেছে এই গ্রামে অনেক বছর আগে একটা অরগ্যান ফ্যামিলি আস্তানা গেড়েছিল। শ্রদ্ধেয় ভিকারের কাছে জানতে চায় তার অনুসন্ধানে সাহায্য করার মত কোন তথ্য রেকর্ডে লিপিবদ্ধ আছে কিনা।

পরিবেশটাকে আরও খানিক নিজের অনুকূলে আনার জন্যে সমাধিক্ষেত্রের উন্নতির জন্যে চাঁদা সংগ্রহের বাক্সে উদার হস্তে কিছু দান করল রানা। দাঁতহীন মাড়ি বের করে এক গাল হাসল বৃদ্ধ। পুরানো ফাইল ঘেঁটে বের করে রানাকে জানাল আলেকজান্ডার অরগ্যানের মা এবং বাবা দু'জনেই সাত বছর আগে পরলোক গমন করেছে। তাদের একমাত্র সন্তান ছিল আলেকজান্ডার অরগ্যান। ফাইল চেয়ে নিয়ে ম্লান মুখে অলস ভঙ্গিতে পাতা উল্টে দেখছে রানা। বকর বকর করে যাচ্ছে বৃদ্ধ। আজকাল আগের মত ধর্ম সম্পর্কে কাউকে কাতর হতে দেখা যায় না, ইত্যাদি। উনিশশো চল্লিশ সালে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর খতিয়ানের উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। এপ্রিল মাসের ছকের ভিতর অরগ্যান নামটা চোখে পড়ল। পুরো বাক্যটা ঝরঝরে হস্তাক্ষরে এইভাবে লেখা : আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান, জন্ম তেসরা এপ্রিল, উনিশশো চল্লিশ সালে, স্যামবোর্ন ফিশলের সেন্ট মার্কের একটা বাড়িতে।

কাগজ কলম বের করে সমস্ত তথ্য টুকে নিল রানা। তারপর বৃদ্ধকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল।

লন্ডনে ফিরে এসে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু সম্পর্কিত সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির হলো রানা। একজন সহকারী করণিক ওর দেয়া ভিজিটিং কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলল, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

ভিজিটিং কার্ডে রানার পরিচয় হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, সোর্প-শায়ার, মার্কেট

ব্রাইটন-এর একটা সলিসিটরস্ ফার্মের একজন পার্টনার সে। করণিকের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করে বলল, ওর ফার্মের একজন মহিলা মক্কেলের নাতি-নাতনীদেরকে খুঁজে বের করতে চাইছে সে। মক্কেল সম্প্রতি মারা গেছে এবং তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সব এই নাতি-নাতনীদেরকে উইল করে দিয়ে গেছে। নাতিদের মধ্যে একজন হলো আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান, জন্ম স্যামবোর্ন ফিশলের সেন্ট মার্কে, তেসরা এপ্রিল, উনিশশো চল্লিশ সালে।

পুরানো রেকর্ড-পত্র ঘেঁটে করণিক জানাল অরগ্যান বেঁচে নেই; উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের আটই নভেম্বর এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কয়েকটা শিলিং জমা দিয়ে অরগ্যানের বার্থ এবং ডেথ সার্টিফিকেট দুটো হস্তগত করল রানা। তারপর বিদায় নিল।

বাড়ি ফেরার পথে কয়েক জায়গায় থামল রানা। শ্রম মন্ত্রণালয়ের একটা শাখা অফিস থেকে পাসপোর্টের জন্যে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিল। খেলনার দোকান থেকে পনেরো শিলিং দিয়ে কিনল বাচ্চাদের একটা প্রিন্টিং সেট। পোস্ট-অফিস থেকে কিনল এক পাউন্ডের একটা পোস্টাল অর্ডার।

বাড়িতে ফিরে এসে অরগ্যানের নামে ফিল-আপ করল অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা। সঠিক বয়স, জন্ম তারিখ ইত্যাদি সব দিল, কিন্তু চেহারার বর্ণনা দিল নিজের। নিজের উচ্চতা, চুল এবং চোখের রঙ লিখল, পেশার ঘরে লিখল : ব্যবসায়ী। ফর্মে অরগ্যানের বার্থ-সার্টিফিকেট থেকে পাওয়া তার মা-বাবার পুরো নাম লিপিবদ্ধ করল। উল্লিখিত সমস্ত তথ্য যাচাই করার জন্যে সাহায্য পাওয়া যাবে এমন একজনের নাম হিসেবে লিখল রেভারেন্ড জেমস বোল্ডারলি, স্যামবোর্ন ফিশলে, সেন্ট মার্কের ভিকার। বৃদ্ধের পুরো নামটা রানা আজ সকালে চার্চের গেটের নেমপ্লেট থেকে টুকে এনেছে। ভিকারের স্বাক্ষর জাল করল ও মোটা নিবের সাহায্যে। ঘন কালি দিয়ে প্রিন্টিং সেটের সাহায্যে একটা স্ট্যাম্প তৈরি করে স্বাক্ষরের পাশে ছাপ মারল ও St. Marks Paris Church Sambourne Fishley.

পেটি ফ্রান্সের পাসপোর্ট অফিসে বার্থ-সার্টিফিকেট এবং পোস্টাল-অর্ডারসহ অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিল ও। ডেথ-সার্টিফিকেটটা পুড়িয়ে ফেলল। প্যাডিংটনের আরেক ঠিকানায় ডাকযোগে আনকোরা নতুন পাসপোর্টটা এসে পৌঁছল চারদিন পর, তখন সকাল, দৈনিক লে ফিগারোর প্রভাত সংস্করণের উপর চোখ বুলাচ্ছিল রানা। লাঞ্চের আগে পাসপোর্টটা সংগ্রহ করল ও।

লাঞ্চের পর বিছানায় একটু গড়িয়ে নি‍ রানা, তারপর পোশাক পরে বাড়িতে তালা লাগাল, স্পোর্টস কার হাঁকিয়ে পৌঁছল লন্ডন এয়ারপোর্টে, উঠে বসল কোপেনহেগেনগামী ফ্লাইটে। চেক-বই ব্যবহার না করে নগদ টাকা দিয়ে টিকিট কিনল ও। ওর সুটকেসের তলার নিচে আরেক তলা আছে, সাধারণ আকারের একটা পত্রিকা অনায়াসে ঢুকিয়ে দেয়া যায় ভিতরে, মরিয়া হয়ে না খুঁজলে সেটার অস্তিত্ব টের পাবে না কেউ—সেখানে ঠাসা আছে দু'হাজার পাউন্ড। আজ সকালে হলবর্ণের একটা সলিসিটর ফার্মের নিরাপদ ভল্টে ওর প্রাইভেট ডিড-বক্স থেকে এই টাকাটা তুলেছে ও।

সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে কোপেনহেগেন পৌঁছে খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা কাটল রানার। ক্যাস্ট্রাপ এয়ারপোর্টে নেমেই পরবর্তী বিকেলের ব্রাসেলসগামী সাবেনা ফ্লাইটের একটা টিকিট বুক করল ও। ডেনিশ রাজধানীতে কেনাকাটার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তাই ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি পৌঁছল কংস নাই টর্ভে হোটেল ডি অ্যাঙ্গলেটেরে।

কাপড়চোপড় খুলে বাথরুমে ঢুকল রানা। ঝর্নার ঝির ঝির মৃদু ঝঙ্কারের সাথে গুনগুন করছে ও, শরীর জুড়িয়ে দিয়ে নামছে শীতল বারিধারা—আহ্ কি শান্তি!

কমপ্লিট স্যুট পরে, দামী সেন্ট মেখে হোটেল থেকে বেরোল ও। গটমট করে ঢুকল প্রখ্যাত অভিজাত রেস্তোরাঁ সেভেন নেশনসে, প্রচুর সময় ব্যয় করে সেরে নিল রাজকীয় ডিনার। দামী চুরুট ধরিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে ঢুকল ধীর পদক্ষেপে টিভোলি বাগানে, স্বর্ণকেশী দুই ডেনিশ যুবতীর সাথে হালকা রসিকতা করল কয়েক মিনিট, তারপর হোটেলে ফিরে এসে বিছানায় উঠল রাত একটায়।

পরদিন সেন্ট্রাল কোপেনহেগেনের নামকরা এক দোকান থেকে একটা লাইট ওয়েট ক্ল্যারিক্যাল গ্রে স্যুট, একজোড়া সোবার ব্ল্যাক ওয়াকিং শু, একজোড়া মোজা, এক সেট আন্ডারঅয়্যার এবং কলার লাগানো তিনটে সাদা শার্ট কিনল রানা। প্রতিটি জিনিসে ডেনিশ প্রস্তুতকারকের নাম লেখা লেবেল আছে দেখে নিয়ে তবে কিনেছে ও। সাদা শার্ট তিনটে দরকার নেই। তবু কিনতে হলো ওগুলো থেকে লেবেল খুলে লন্ডনে কেনা ক্ল্যারিক্যাল শার্ট, ডগ কলার আর বিবে লাগাতে হবে বলে।

সবশেষে কিনল ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য সমস্ত চার্চ আর গির্জার পরিচিতি দেয়া আছে ডেনিশ ভাষায় লেখা এমন একটা বই। টিভোলি বাগানে, লেকের ধারে নিরিবিলি এক রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারল ও। তারপর তিনটে পনেরো মিনিটের ফ্লাইট ধরে উড়াল দিল ব্রাসেলস-এর দিকে।

চার

বেলজিয়াম। এখানে খেলনার দোকানেও আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা হয়, জানে রানা। বৈধ নাগরিকের পরিচয়পত্র দেখিয়ে রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক বা রাইফেল যে-কেউ কিনতে পারে, সেজন্যে লাইসেন্স লাগে না। বৈধ নাগরিক নয় যারা, যেমন চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকার, সন্ত্রাসবাদী, গ্যাংস্টার, স্মাগলার বা বিদেশী, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের পথ এদের জন্যেও খোলা রয়েছে। নাগরিকত্বের ভুয়া পরিচয়পত্র সহজেই সংগ্রহ করা যায়। ক্রেতাকে এ ব্যাপারে খেলনার বা আগ্নেয়াস্ত্রের দোকানদারও সাহায্য করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সাধারণ, প্রচলিত আগ্নেয়াস্ত্রের দরকার নেই রানার, তাছাড়া অস্ত্র সংগ্রহের গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন রাখতে চায় ও, তাই ইটালিতে থাকতেই ভিনসেন্ট গগলের সাথে দেখা করে বিশ্বস্ত একজন অস্ত্র বিক্রেতা এবং পরিচয়পত্র জালে ওস্তাদ একজন লোকের

নাম ঠিকানা চেয়ে নিয়েছে ও।

আগস্টের বাইশ তারিখে প্যারিস থেকে একবার রোমে গিয়েই গগলের খোঁজ করেছিল রানা। কোথায় গিয়ে কাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আগে থেকেই তা জানা ছিল ওর। একসাথে ধ্বংস করেছিল ওরা মাদাম দালিয়ার ড্রাগ-রিঙ, তারপর আর দেখা হয়নি ওর সাথে। তবে বিদায় নেবার আগে রানাকে সে বলেছিল, যদি কখনও কোন কারণে দরকার হয় তাহলে ইউরোপ বা আফ্রিকার যে-কোন দেশের রাজধানীতে গিয়ে বা লোক পাঠিয়ে একটা নির্দিষ্ট মহলের নির্দিষ্ট কিছু লোকের যে কোন একজনকে খুঁজে বের করে নির্দিষ্ট একটা কোড নাম্বার উচ্চারণ করলেই সে রানাকে তার বর্তমান অবস্থান এবং যোগাযোগের মাধ্যম জানিয়ে দেবে।

মাত্র একঘণ্টা ব্যয় করে সঠিক লোকের সাথে দেখা করতে পেরেছিল রানা। তার কাছ থেকে জানতে পারল গগল এখন ইরান-ইরাক বর্ডারে কুর্দদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে বড়ই ব্যস্ত। লোকটার মাধ্যমেই একটা মেসেজ পাঠাল রানা। মেসেজে বলল: ঠিক এক হপ্তা পর আবার আমি রোমে আসছি, তোমাকে আমার দরকার।

ঢাকা থেকে দ্বিতীয় বার রোমে এসে গগলের সাক্ষাৎ পেয়েছিল রানা। রানার মেসেজ পেয়ে অস্ত্র এবং গোলাবারুদের চোরা ব্যবসায়ে ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে নিয়ে ইরান থেকে ছুটে এসেছে গগল। কি ধরনের সাহায্য লাগবে শুনে হেসেই অস্থির হলো ভিনসেন্ট গগল। বলল, 'আমার নাম বলে বেলজিয়ামের যে কোন বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং কুখ্যাত ফরজারের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারো তুমি, কেউ বেঈমানী করতে সাহস পাবে না। সবাই জানে গগলের বন্ধুর সাথে বেঈমানী করা যায় না।'

রানা গম্ভীর ভাবে বলেছিল, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস, গগল। আমি কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না। যে দু'জনকে আমার কথা বলবে তুমি তারা ইচ্ছে করলেই আমার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। সুতরাং তোমাকে ভয় করে এমন লোকের কাছে সাহায্যের জন্যে আমাকে যেতে বোলো না। তোমাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে এমন লোকের কাছ থেকে সাহায্য চাই আমি। তাকে রীতিমত যোগ্য লোক হতে হবে। সাধারণ অস্ত্রে কাজ চলবে না, বিশেষ ধরনের অস্ত্র চাই।'

রানার কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ল গগল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমাকে শ্রদ্ধা করে এমন একজন বেলজিয়ান অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে তোমাকে পাঠাতে পারি আমি, কিন্তু সে-রকম কোন ফরজার নেই যে আমাকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি করে। এই দঙ্গলের সবাই আমাকে ভয় করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না।'

'অস্ত্র-ব্যবসায়ী এই লোকটা নিজে একজন কারিগর তো?' জানতে চাইল রানা।

'ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কারিগর।'

'সেক্ষেত্রে ঠিক এই লোককেই আমার দরকার,' বলল রানা। 'এবার তোমার ভয়ে সবচেয়ে ভীত একজন ফরজারের নাম ঠিকানা দাও আমাকে। আমিও তার মনে কিছুটা ভয় ঢুকিয়ে দেব, যাতে সে বেঈমানী করার চেষ্টা না করে।'

দু'জনের নাম ঠিকানা টুকে নিল রানা। গগল কথা দিল দু'জনকেই সে টেলিফোনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জানিয়ে দেবে. জানিয়ে দেবে কবে, কোথায়, কখন রানা দেখা করবে তাদের সাথে।

রানার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আশ্চর্য একটা নিস্পৃহ ভাব আছে গগলের। এত কিছু আলাপ হলো, অথচ একবারও সে জানতে চাইল না এসবের পিছনে রানার উদ্দেশ্যটা কি। শুধু বলল, 'একে সাহায্য করা বলে না। সত্যিকার সাহায্য কিছু লাগবে কিনা বলো, তুমি জানো, সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।'

গগলের কাঁধে হাত রেখে রানা বলল, 'ধন্যবাদ, বন্ধু। আর কোন সাহায্য লাগবে না।'

ওই পর্যন্তই, গগল আর কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করেনি।

অস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম ম্যানিকিন পীস। ইউরোপ জোড়া আন্ডারগ্রাউন্ডের অস্ত্র-যাদুকর হিসেবে পরিচিত যে। চুল দাড়ি সব পাকা, বয়স ষাটের উপর। চোদ্দ বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আর কিছু নাড়াচাড়া করেনি লোকটা। মেয়ে নয়, মদ নয়, জুয়া নয়, ঘর-সংসার নয়, তার একমাত্র ধ্যান এই অস্ত্র। বিয়ের বয়স কবে পেরিয়ে গেছে, খেয়ালই নেই। অস্ত্র মেরামত এবং তৈরির কাজে যাদুকর হিসেবে নাম কিনে ফেলায় গোটা ইউরোপের ভয়ঙ্কর গ্যাঙস্টার, সন্ত্রাসবাদী, খুনে এবং হাইজ্যাকাররা তার কাছে আসে, এদের দ্বারা যে কোন মুহূর্তে তার প্রাণ বিপন্ন হতে পারে, কিন্তু ঝুঁকিটাকে সে গ্রাহ্যই করে না। বিপদ আসতে পারে পুলিসের তরফ থেকেও কিন্তু অস্ত্র-পাগল ম্যানিকিন পীস পুলিসকেও ডরায় না। ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে প্রতি মাসে মোটা টাকা ঘুষ দেয় সে স্থানীয় পুলিস ইন্সপেক্টরদেরকে, বিনিময়ে তারা পীসের দোকান এবং কারখানার ত্রিসীমানায় পা ফেলা তো দূরের কথা, দূর থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপও করে না।

বয়সে ভিনসেন্ট গগল ছোট হলেও ম্যানিকিন পীস তাকে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে শ্রদ্ধা করে। গগল তার যে উপকার করেছে, জীবনে কখনও সে ঋণ শোধ হবার নয়। বছর বিশেক আগে গগলের সাথে তার সম্পর্ক ছিল স্রেফ ব্যবসায়িক। আর্মস স্মাগলিংয়ের ব্যবসাতে ঢোকার জন্যে গগল জুতসই একটা ফোকার খুঁজছে তখন, কিন্তু ঠিক মত কায়দা করতে পারছে না। অল্প পুঁজি, এখান ওখান থেকে কিছু অস্ত্র সস্তায় কিনে আন্ডারগ্রাউন্ডে বিক্রি করে। এই সময় হঠাৎ পুলিসের কাছে ধরা পড়ে গেল সে। খবর পেয়ে ম্যানিকিন পীস তাকে পুলিসের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনে। ব্যস এইটুকু সাহায্য করেছিল সে গগলের। কিন্তু গগল এর বিনিময়ে তাকে নবজন্ম দান করেছে।

এই ঘটনার পাঁচ বছর পর একদিন পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো ম্যানিকিন পীস। ডাক্তাররা বলল, তার দুটো কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নতুন একটা কিডনী সংযোজন করতে না পারলে বাঁচার কোন আশাই নেই। মানুষের শরীরে দুটো কিডনী থাকে বটে, কিন্তু একটাতেই কাজ চলে। যাই হোক, কিডনীর খোঁজে চারদিকে সম্ভাব্য জায়গায় খবর পাঠানো হলো, কিন্তু কোথাও একটা কিডনী পাওয়া গেল না। আঠারো ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর হাল ছেড়ে দিয়ে ম্যানিকিন পীস অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। মৃত্যু অবধারিত বুঝতে

পেরে আয়ুর শেষ ছয়টি ঘণ্টা প্রিয়জনদের মাঝখানে বসে কাটাবে, এই ইচ্ছা নিয়ে নার্স এবং ডাক্তারদের চোখকে কৌশলে ফাঁকি দিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে নিজের দোকানে চলে এল সে। বহু বছরের পুরানো রিভলভার, পিস্তল, শটগান, বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি মেঝেতে নামিয়ে সেগুলোর মাঝখানে বসল সে, প্রতিটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর কোমল স্বরে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছে, 'দুঃখ করিস না, মরে গেলেও তোদের কথা আমার মনে থাকবে...' ইত্যাদি। আর চোখ থেকে অঝোর ধারায় নামছে পানি। ঠিক এই সময় কোত্থেকে যেন এসে ঢুকল দোকানে গগল। পীসের কাণ্ড দেখে তার তো চক্ষু স্থির, 'ব্যাপার কি পীস?'

'প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এখন আমাকে বিরক্ত কোরো না,' মুখ না তুলেই বলল পীস।

থমকে গেল গগল। কিন্তু কৌতূহলের পরিমাণ শতগুণ বেড়ে গেল তার। ধমক গ্রাহ্য না করে একই প্রশ্ন বারবার করতে লাগল সে। অবশেষে বেজায় চটে গিয়ে গগলকে ভাগাবার জন্যে আসল কথাটা বলল পীস, '...কিডনী পাওয়া যায়নি, আর ক'ঘণ্টা পর আমি চলে যাচ্ছি। দয়া করে এই সময়টুকু আমাকে এদের সাথে একা থাকতে দাও।'

পীস পাগল হয়ে গেছে, ভাবল গগল। অনেকক্ষণ বোকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে বলল, 'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

পীস নির্বাক। সে তার প্রিয় অস্ত্রদের গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলাচ্ছে।

গগল বলল, 'যা বলছ তা যদি সত্যিও হয় হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এলে কেন?'

খেপে উঠে পীস বলল, 'কিডনী পাওয়া যায়নি জেনেও ওখানে কোন্ দুঃখে থাকব?'

'চলো তাহলে, হাসপাতালে যাই,' বলল গগল। 'ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, একটা কিডনী দিয়ে দেব আমি তোমাকে।'

মৃত্যুকে যে গ্রাহ্যই করছিল না, গগলের কথা শুনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল সে। আসলে দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যে তার এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে সাহায্য করবে, এই নির্মম সত্যের প্রচণ্ড আঘাতে অদ্ভুত একটা অভিমান জন্ম নিয়েছিল পীসের মনে, যার ফলে মৃত্যুকে অতি নিকটে দেখেও না দেখার ভান করে যাচ্ছিল সে এতক্ষণ। কিন্তু অন্তত একজন লোক নিজের শরীরের একটা অঙ্গ দিয়ে তাকে বাঁচাতে চায়, এটা জানতে পারার সাথে সাথে সমস্ত অভিমান নিমেষে উবে গেল, বাঁচার আকুতি বিস্ফোরণ হয়ে বেরিয়ে এল গলা থেকে, চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠল, 'আমি মরতে চাই না।'

সেই গগল, যে তাকে নিজের কিডনী দিয়ে নবজন্ম দান করেছিল, এক বন্ধুর জন্যে সামান্য একটু সাহায্য চেয়ে টেলিফোন করেছে। আজ ২১ সেপ্টেম্বর, গগলের বন্ধুর আসার কথা। দোকান খুলে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ম্যানিকিন পীস। আজ আর কারও সাথে দেখা করবে না। দোকানের সামনে 'বেচাকেনা বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ডটা ঝুলিয়ে রেখেছে সে। কর্মচারীদেরকে গতকালই জানিয়ে দিয়েছে, আজ তাদের ছুটি। একা অপেক্ষা করছে সে দোকানে।

গগলের বন্ধু যথাসময়ে অর্থাৎ ঠিক দুপুর বেলা এসে পৌছল। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হলঘরের ভিতর দিয়ে অফিসে নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে পীস। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আমি না খেলেও অতিথিদের জন্যে সব রকম মদ রাখি, মশিয়েকে কি দেব?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আগে আমি কাজের কথা শেষ করতে চাই। হাতে সময় কম।'

কাজকে গুরুত্ব দেয়-এমন লোকই আমার প্রিয়, মনে মনে ভাবল পীস। বলল, 'মশিয়ে, চোখ থেকে চশমাটা নামাবেন কি?' রানা ইতস্তত করছে দেখে বৃদ্ধ মৃদু হেসে আবার বলল, 'দেখুন আপনি যদি সত্যি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এসে থাকেন তাহলে পরস্পরের ওপর আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে।'

নিঃশব্দে চোখ থেকে চশমাটা খুলে ডেস্কের উপর রাখল রানা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ওর চোখে, মুখ দেখে পীসের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করছে।

'এবার বলুন, মশিয়ে, আপনার কি উপকারে লাগতে পারি আমি।'

'গগল আপনাকে কতটুকু বলেছে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি তার বন্ধু, আপনার একটা ফায়ার আর্ম দরকার—এইটুকু।'

ধীর ভঙ্গিতে উপর নিচে মাথা ঝাঁকাল একবার রানা। বলল, 'হ্যাঁ, আমার একটা বিশেষ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দরকার। কেন, তারও একটা আভাস আপনাকে দিচ্ছি, তা নাহলে ঠিক কি চাই আপনি বুঝবেন না। আমার পেশায় আমি একজন বিশেষজ্ঞ। বিশেষজ্ঞরাই অসম্ভবকে সম্ভব করার ঝুঁকি নেয়, নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। আমি সেই রকম একটা অসম্ভব কাজ করতে যাচ্ছি। যাকে সরাতে চাই সে একজন মস্ত হোমরাচোমরা লোক, নিজের নিরাপত্তার জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। এ ধরনের কাজে সফল হতে হলে নিখুঁত পরিকল্পনা এবং সঠিক অস্ত্রের দরকার হয়। আমারও একটা বিশেষ ধরনের রাইফেল দরকার।'

পাকা ভুরুর ভিতর আগ্রহে চকচক করছে পীসের সরল দুটো চোখ। 'সুন্দর! গুছিয়ে বলতে পেরেছেন।' একদিকে মাথাটা একটু কাত্ করে হাসল। 'বুঝলাম, একজন বিশেষজ্ঞের কাছে এসেছেন আরেকজন বিশেষজ্ঞ। কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনার কাজটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে আমার কাছে। খুশির ব্যাপার। তা মশিয়ে ঠিক কি ধরনের রাইফেলের কথা ভাবছেন আপনি?' সাগ্রহে ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল পীস।

'রাইফেলের টাইপ কি হবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বলল রানা। পকেট থেকে চেস্টারফিল্ড সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করল। সান্তিনো ভ্যালেন্টির পাসপোর্টটা লন্ডনের বাড়িতে রেখে এসেছে ও, ভ্রমণ করছে অরগ্যানের পাসপোর্ট নিয়ে। পরিচয় বদলের সাথে সাথে ব্যক্তিগত রুচিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে ও। সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল, 'কাজটায় অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে, আছে সুযোগের সীমাবদ্ধতা। রাইফেলটাকে হতে হবে ছদ্মবেশী এবং লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ।'

আনন্দে চকচক করছে পীসের চোখ দুটো। 'একটা বুলেটেই কাজ সারতে চাইছেন মশিয়ে,' রানার মনের কথা গড়গড় করে বলে যাচ্ছে সে, 'কারিগরের নিপুণ ওস্তাদী দিয়ে এমন একটা রাইফেল তৈরি করতে হবে যেটা একজন লোক একটা

কাজে মাত্র একবার একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে ব্যবহার করবে, রিপিট করবে না। মশিয়ে, আপনি সঠিক লোকের কাছে এসেছেন। যা ভেবেছিলাম, আপনার ফরমাশ, দারুণ উত্তেজনাকর একটা চ্যালেঞ্জই বটে। আমার কাছে এসেছেন, সেজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

'ঠিক যা চাই তা পেলে আমিও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'ঠিক,' বৃদ্ধ গম্ভীর হলো। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'প্রধান অসুবিধে হলো সাইজ,' বলল রানা। 'দৈর্ঘ্য নয়, ওয়ার্কিং পার্টসের শারীরিক স্ফীতি। চেম্বার এবং ব্রীচ এর চেয়ে বড় হলে চলবে না···' ডান হাত উপরে তুলল রানা, মধ্যমা আঙুলের ডগা দিয়ে বুড়ো আঙুলের আগা স্পর্শ করে একটা বৃত্ত তৈরি করে পীসকে দেখাল, ডায়ামিটারে আড়াই ইঞ্চিরও কম সেটা। 'এর চেয়ে একটা গ্যাস চেম্বার অনেক বড়, সুতরাং রাইফেলটার রিপিটার হওয়ার কোন উপায় নেই। একই কারণে মোটাসোটা স্প্রিং-মেকানিজম এতে থাকবে না।' একটু থেমে বলল আবার, 'মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই এটাকে বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল হতে হবে।'

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আপন মনে মাথা নাড়ছে ম্যানিকিন পীস। ক্রেতার কথা শুনে কল্পনায় চাক্ষুষ করে নিচ্ছে রোগা-পাতলা ওয়ার্কিং পার্টস বিশিষ্ট একটা রাইফেলের ছবি। 'বলে যান, বলে যান,' অস্ফুটে বলল সে।

'অপর দিকে,' বলল রানা, 'মাউজার 7·92 বা এনফিল্ড ·303-এর মত পাশ থেকে বেরিয়ে থাকা হাতলওয়ালা বোল্ট এই রাইফেলে থাকা চলবে না। বোল্টটাকে অবশ্যই সরাসরি পিছু হটে যেতে হবে, শোল্ডারের দিকে। ব্রীচে বুলেট ঢোকাবার জন্যে যাতে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরা যায়। এছাড়া, কোন ট্রিগার গার্ড থাকা চলবে না এবং ট্রিগারটাকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে গুলি করার ঠিক আগের মুহূর্তে ওটা ফিট করা যায়।'

'কেন?' প্রশ্ন করল যাদুকর।

'সমস্ত মেকানিজম গোল, লম্বা একটা কম্পার্টমেন্টে ভরে রাখতে চাই আমি,' বলল রানা। 'সে-অবস্থাতেই ক্যারি করব ওটাকে। কম্পার্টমেন্টটা কারও চোখে পড়লে চলবে না। এইমাত্র যে সাইজটা দেখালাম ডায়ামিটারে তার চেয়ে বেশি হতে পারবে না ওটা। কারণটা আরও পরিষ্কার করে বলব পরে। আলাদা করে রাখা যায় এমন একটা ট্রিগার দেয়া সম্ভব?'

'সম্ভব। প্রায় সব কিছুই সম্ভব। সিঙ্গেল-শট রাইফেলের ডিজাইন যে কেউ তৈরি করতে পারে। শটগানের মত পিছন ভেঙে লোডিংয়ের জন্যে পথ খোলার ব্যবস্থা থাকবে। তাতে বোল্টের ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, কিন্তু বদলে আসবে একটা হিঞ্জ—ফলে সমস্যা হয়তো থেকেই যাবে। স্টীলের ওপর ডিজাইন খোদাই করে তৈরি করতে হবে রাইফেলটা, এক খণ্ড মেটাল মিলিং করে বের করে আনতে হবে গোটা ব্রীচ এবং চেম্বার। ছোট একটা কারখানার জন্যে কঠিন কাজ, কিন্তু সম্ভব।'

'কি রকম সময় লাগবে তাতে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেলজিয়ান বৃদ্ধ বলল, 'কয়েক মাস তো লাগবেই।'

'অত সময় নেই আমার।'

'সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা বেছে নিতে হবে আমাদের। বাছ বিচার করে একটা রাইফেল কিনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিতে হবে। ঠিক আছে, আপনার কথা শেষ করুন আগে।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। বলল, 'জিনিসটা খুব হালকা হতে হবে। হেভী ক্যালিবার না হলেও চলবে। আমি নির্ভর করব বুলেটের ওপর। ব্যারেলটা ছোট বটে, বারো ইঞ্চির বেশি যেন কোনমতেই না যায়।'

'কতটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে আপনার টার্গেট, মশিয়ে?'

'জানা নেই,' বলল রানা, 'তবে সম্ভবত একশো তিরিশ মিটারের বেশি নয়।'

'বুক, না মাথা—কোনটা পছন্দ আপনার?'

'বুকেও গুলি করতে পারি, কিন্তু মাথায় করার সম্ভাবনাই বেশি।'

'হ্যাঁ, তাতে মৃত্যুর সম্ভাবনাও অনেক বেশি,' বলল পীস। 'কিন্তু বুকের বেলায় আবার লক্ষ্য অব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি—বিশেষ করে কেউ যখন হালকা ওজনের শর্ট-ব্যারেল অস্ত্র দিয়ে একশো ত্রিশ মিটার দূরবর্তী টার্গেটকে সম্ভাব্য বাধা সত্ত্বেও ভেদ করতে চায়।' একটু বিরতি নিল বৃদ্ধ, তারপর বলল, 'বুকে না মাথায় এ ব্যাপারে আপনাকে অনিশ্চিত দেখে আমার মনে হচ্ছে, আপনার এবং টার্গেটের মাঝখানে হয়তো কেউ যাওয়া-আসা করবে, তাই কি?'

'হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা আছে।'

'আচ্ছা, মশিয়ে, ধরুন,' বলল পীস, 'বাতিল কার্ট্রিজটা ফেলে দিয়ে তাজা আরেকটা ঢোকাতে, ব্রীচ বন্ধ করতে এবং লক্ষ্যস্থির করতে যদি মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে, তাহলে কি দ্বিতীয় বার গুলি করার সুযোগ আপনি পাবেন?'

'বোধহয় পাব না, না পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি,' বলল রানা। 'সাইলেন্সার ব্যবহার করে প্রথমবার যদি ব্যর্থ হই, এবং টার্গেটের আশপাশে যারা থাকবে তারা যদি ভাগ্যগুণে ব্যাপারটা টের না পায়, বড়জোর দু'তিন সেকেন্ড সময় পেলেও পেতে পারি আমি দ্বিতীয়বার গুলি করার জন্যে, তার বেশি নয়। কিন্তু ওরা যদি টের পেয়ে যায়, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। চারদিক থেকে এক নিমেষে ঘিরে ফেলা হবে আমার টার্গেটকে। কয়েক সেকেন্ড কেন, কয়েক বছরের মধ্যেও দ্বিতীয়বার গুলি করার কোন সুযোগ আমি পাব না। তবে, নিরাপদে কেটে পড়ার জন্যে সাইলেন্সার আমাকে ব্যবহার করতেই হবে। প্রথমবার যদি কপাল ফুটো করতে পারি, আসল সমস্যাটা মিটে যাবে। কোন্ দিক থেকে বুলেট এসেছে তা আবছাভাবে অনুমান করতেও কয়েকটা মিনিট লেগে যাবে ওদের। এই কয়েকটা মিনিটই কেটে পড়ার জন্যে যথেষ্ট।'

উপর নিচে মাথা দোলাচ্ছে বৃদ্ধ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখন তার ডেস্ক প্যাডের উপর। 'সেক্ষেত্রে আপনি এক্সপ্লোসিভ বুলেট ব্যবহার করলে ভাল করবেন। রাইফেলের সাথে এক মুঠো তৈরি করে দেব'খন। ঠিক কি বলতে চাইছি, মশিয়ে বুঝতে পারছেন তো?' মুখ তুলে তাকাল পীস।

বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা, 'গ্লিসারিন, না কি মার্কারী?'

'মার্কারীই তো ভাল। যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিচ্ছন্ন। রাইফেল সংক্রান্ত আর কোন পয়েন্ট আছে?'

'আছে,' বলল রানা। 'রাইফেলটাকে সরু করার স্বার্থে ব্যারেলের নিচে থেকে হ্যান্ডগ্রিপের সমস্ত কাঠের কাজ সরিয়ে ফেলতে হবে। ফায়ারিঙের জন্যে অবশ্যই এটাতে একটা স্টেনগানের মত ফ্রেম-স্টক থাকতে হবে। সামনের অংশ, পিছনের অংশ এবং শোল্ডার-রেস্ট, স্ক্রু খুলে তিনটে রড আলাদা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া, নিখুঁত একটা সাইলেন্সার এবং একটা টেলিস্কোপিক সাইট চাই। এ-দুটোও খোলা অবস্থায় রাখতে চাই আমি।'

গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছে পীস। অধৈর্য হয়ে উঠছে রানা।

'কি, পারবেন?'

রানার কথায় ধ্যান ভাঙল বৃদ্ধের। মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল। 'কিছু মনে করবেন না, মশিয়ে। আপনি আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছেন। জীবনে এতবড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিনি। কোন কাজ পারব না, একথা বলা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পারব। বিশেষ জাতের একটা রাইফেল কিনতে হবে আমাকে। খুব দামী। দুষ্প্রাপ্য। তবে ব্রাসেলসে পাওয়া যাবে। খুবই নিখুঁত, যন্ত্রপাতিগুলো অদ্ভুত সুন্দর ভাবে ফিট করা অথচ হালকা এবং রোগা-পাতলা। আচ্ছা, মশিয়ে, বলুন দিকি,...মানে, আপনার টার্গেট স্থির, নাকি ধীরে চলমান, নাকি দ্রুত মুভ করবেন?'

'স্থির।'

'কোন সমস্যাই নেই তাহলে। ফ্রেম-স্টককে তিন ভাগে খুলে ফেলার ব্যবস্থা করা আর ট্রিগারে স্ক্রু লাগানো নগণ্য কারিগরির ব্যাপার মাত্র। সাইলেন্সারের জন্যে ব্যারেলের পিছনটা ট্যাপিং করা আর ব্যারেল ছেঁটে আট ইঞ্চি কমিয়ে ফেলা, এ দুটো কাজ নিজেই করতে পারব আমি। ব্যারেল আট ইঞ্চি কমিয়ে ফেলা মানে লক্ষ্য নিখুঁত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে ফেলা। মশিয়ে, আপনি একজন মার্কস-ম্যান তো?'

মাথা একটু কাত করল রানা।

'তাহলে সমস্যা নেই। টার্গেট স্থির, দূরত্ব একশো ত্রিশ মিটার, চোখ টেলিস্কোপ-সাইটে—নো প্রবলেম। সাইলেন্সারটাও আমি নিজের হাতে তৈরি করব। এবার, মশিয়ে, লম্বা এবং গোল কম্পার্টমেন্টের কথা বলুন, বিচ্ছিন্ন রাইফেলটাকে যেটায় ভরে নিয়ে যেতে চান আপনি।'

বৃদ্ধ ম্যানিকিন পীসের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা নিঃশব্দে। ধীর পায়ে ডেস্ক ঘুরে এগোচ্ছে ও। থামল পীসের চেয়ারের পাশে। চোখ দুটো এখনও তার চোখে স্থির হয়ে আছে। ধীরে ধীরে জ্যাকেটের পকেটে একটা হাত ঢোকাচ্ছে রানা।

মুহূর্তের জন্যে পীসের সাদা ভুরুর ভিতর চোখ দুটোয় আতঙ্ক ফুটে উঠল। আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখতে পেল সে, সারা শরীরে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল, খাড়া হয়ে উঠল রোম।

পকেট থেকে একটা কাঠপেন্সিল বের করল রানা। ডেস্কের উপর ঝুঁকে পীসের রাইটিং প্যাডে দ্রুত একটা স্কেচ আঁকল। তারপর প্যাডটা বৃদ্ধের দিকে ঘুরিয়ে

দিয়ে প্রশ্ন করল, 'জিনিসটা চিনতে পারছেন?'

স্কেচের উপর একবার চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল পীস। অস্ফুটে বলল, 'পারছি।'

'ফাঁপা কয়েকটা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব স্ক্রু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে এটা তৈরি করা হবে,' বলল রানা। 'এখানে ঢুকবে···' পেন্সিল ঠুকে ডায়াগ্রামের একটা জায়গার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও '···রাইফেল স্টকের একটা অংশ। এখানে অপরটা। দুটোই টিউবের ভিতর লুকানো থাকবে। এই অংশটায় আর কিছু থাকবে না।' ডায়াগ্রামের আরেক জায়গায় পেন্সিলের চোখা শিষ ছোঁয়াল রানা। 'রাইফেলের পুরো শোল্ডার রেস্টটা ঢুকে যাবে এই টিউবটার ভিতর।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে ম্যানিকিন পীসের চোখ জোড়া। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে যাচ্ছে রানা, 'এই পয়েন্টটা সবচেয়ে মোটা, এখানে রয়েছে মোটা ডায়ামিটারের টিউব, এতে ঢুকে যাবে বোল্ট সহ রাইফেলের ব্রীচ। এই সেকশনে ব্যারেল, এবং শেষ দুটো সেকশনে···এখানে আর এখানে···ঢুকে যাবে টেলিস্কোপ সাইট আর সাইলেন্সার। সবশেষে—বুলেট। নিচের এই কাঠের গোড়ায় লুকিয়ে রাখতে হবে বুলেটগুলোকে। বিচ্ছিন্ন রাইফেলের প্রতিটি অংশ ভিতরে ঢুকিয়ে টিউবগুলোকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগানো হবে।' ডায়াগ্রামের উপর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে টোকা মারল ও, 'এটা যা, দেখতে যেন ঠিক তাই থাকে—এক চুল এদিক ওদিক হলে চলবে না। যখন দরকার হবে স্ক্রু খুলে টিউব থেকে একে একে বের করব বুলেট, সাইলেন্সার, টেলিস্কোপ, রাইফেল, এবং তিন ভাগে ভাগ করা অবলম্বন, তেকোণা ফ্রেম-স্টক। প্রতিটি জিনিস আবার জোড়া লাগালেই গুলি করার জন্যে প্রস্তুত একটা সম্পূর্ণ রাইফেল পেয়ে যাব। ও. কে?'

আরও কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে ডায়াগ্রামটার দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যানিকিন পীস, তারপর ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা হাত। 'মশিয়ে,' অভিভূত বৃদ্ধ বলল, 'এরকম একটা ধারণার জন্ম শুধুমাত্র একজন সত্যিকার প্রতিভাবানের মাথাতেই হতে পারে। ইউনিক! সন্দেহের ঊর্ধ্বে। অথচ কত সহজ। হ্যাঁ, পারা যাবে।'

রানার চেহারায় আনন্দ বা বিরক্তি কিছুই ফুটল না। নির্বিকার দেখাচ্ছে ওকে। বলল, 'গুড। এবার সময়ের প্রশ্ন। চোদ্দ দিনের মধ্যে রাইফেলটা ডেলিভারি চাই আমি। সম্ভব?'

একটু চিন্তা করে পীস বলল, 'সম্ভব। তিনদিনের মধ্যে রাইফেলটা যোগাড় করতে পারব। টেলিস্কোপ সাইট কেনা কোন সমস্যাই নয়। সাইলেন্সার তৈরি, বুলেট মডিফাই এবং বহিরাবরণ তৈরি—হ্যাঁ, চোদ্দ দিনে সম্ভব, যদি মোমবাতির দু'দিকেই আগুন ধরাই। তবে, দু'একদিন আগে এসে একবার যদি দেখে যান, ভাল হয়। যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, আলোচনা করা যাবে। বারো দিনের দিন আসতে পারবেন, মশিয়ে?'

'সাত থেকে চোদ্দ দিনের মাঝখানে যে-কোন একদিন আসব,' বলল রানা। 'কিন্তু আজ থেকে তেরো দিন পর ডেলিভারি চাই আমি। অক্টোবরের চার তারিখে লন্ডনে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'অক্টোবরের চার তারিখ সকালে পাবেন আপনি ডেলিভারি,' বলল পীস, 'যদি এক তারিখে এসে শেষ আলোচনাটা করে যান।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার, আপনার খরচ এবং ফি সম্পর্কে বলুন। কত দিতে হবে?'

একগাল হাসল বৃদ্ধ। 'কাজটা করে আমি অপার আনন্দ পাব, মশিয়ে, সেটাই আমার মজুরি। আপনি ভিনসেন্ট গগলের বন্ধু, আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে পারি না।'

'তা হয় না,' বলল রানা, 'সময় এবং টাকা, দুটোই বিস্তর খরচ করতে হবে আপনাকে। সব আমি দেব। কত দিতে হবে বলুন।'

মুচকি হাসল বৃদ্ধ। বলল, 'তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। টাকার অঙ্ক লেখার জায়গাটা খালি রেখে গগল একটা ক্রসড চেক পাঠিয়ে দিয়েছে আমার নামে।'

গম্ভীর হলো রানার চেহারা। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ম্যানিকিন পীসের দিকে ঝুঁকে পড়ল হঠাৎ।

কৃতার্থ হাসি নিমেষে মুছে গেল পীসের মুখ থেকে। ঢোক গিলে বলল সে, 'আর কিছু বলবেন, মশিয়ে? বলুন, আপনাকে আর কি সাহায্য করতে পারি?'

'না,' অকস্মাৎ জলদগম্ভীর হয়ে উঠল রানার কণ্ঠস্বর। নিষ্পলক চোখের ঠাণ্ডা হিম দৃষ্টি বিদ্ধ হচ্ছে বৃদ্ধের চোখ ভেদ করে অন্তরের অন্তস্তলে। 'মন দিয়ে শুনুন। আমার ব্যাপারে গগলের সাথে আপনি আর যোগাযোগ করবেন না, তাকে বা আর কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না আমি কে বা আমার সত্যিকার পরিচয় কি। কার হয়ে কার বিরুদ্ধে কাজ করছি, কোত্থেকে এসেছি, কোথায় যাব, কি অস্ত্র নিয়ে যাব, কেন নিয়ে যাব—এসব ব্যাপারে কোন রকম কৌতূহল প্রকাশ করবেন না বা খবর সংগ্রহের চেষ্টা করবেন না। করলে আমি জানতে পারব। সেক্ষেত্রে আপনি মারা যাবেন। যেদিন ফিরে আসব সেদিন যদি পুলিস ডাকেন বা কোন ফাঁদ পেতে রাখেন, আপনি মারা যাবেন। কথাটা বুঝেছেন?'

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ম্যানিকিন পীস। ছোটখাট শরীরটা হঠাৎ যেন আরও অর্ধেক হয়ে গেছে। খুনে, ডাকাত আর সন্ত্রাসবাদীদের সাথেই তার ব্যবসা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কোন রকম হুমকি দিয়ে সুবিধে করতে পারেনি। ভয় কাকে বলে জানা নেই তার। কিন্তু গগলের বন্ধু শান্ত গলায় যা বলল, শুনে ঘাম ছুটে যাচ্ছে তার।

ধীরে ধীরে চোখে মুখে ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল বৃদ্ধের। 'মশিয়ে, আমাকে সাবধান করে না দিলেও পারতেন। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। হ্যাঁ, যা বলেছেন সব পরিষ্কার বুঝেছি আমি।' মৃদু হাসল সে। বলল, 'প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। আপনি যেমন আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধান, আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমিও তেমনি সাবধান। যে রাইফেল আপনাকে দেব, তাতে কোন সিরিয়াল নাম্বার থাকবে না, যাতে আপনি ধরা পড়লেও কর্তৃপক্ষ সূত্র ধরে আমাকে খুঁজে বের করতে না পারে। গুড বাই, মশিয়ে।'

অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'গুড বাই,' বলে

হলরুম পেরিয়ে বেরিয়ে এল উজ্জ্বল সূর্যালোকে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটা একটু দূরে। এইটুকু পথ হেঁটে এল। কেউ অনুসরণ করছে না। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরল না। লাঞ্চের সময় হয়নি, কিন্তু গলাটা ভিজিয়ে নেয়া যেতে পারে। বিখ্যাত বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁ ভিভা সানলাইটে ঢুকে আধঘণ্টা পর চাঙা হয়ে বেরিয়ে আবার ট্যাক্সি নিল। ফিরল ফাইভ স্টার হোটেল অ্যামিগোতে।

হোটেলের বারো তলায় সুইমিং পুল। পুলের ধারে শুয়ে বসে আছে টু-পীস বিকিনি পরা মেয়েরা। প্রায় সবারই নাভির নিচে চার ইঞ্চি পর্যন্ত উন্মুক্ত। সামান্য একটু ছাড়া বুকেরও প্রায় সবটুকুই দৃশ্যমান। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে সরে এল রানা। শীতল পানিতে অবগাহন করার লোভটুকু দমন করতে হচ্ছে ওকে। সুইমিং পুলে মেলা ভিড়, যেচে পড়ে কেউ আলাপ করতে চাইতে পারে, সে-ঝুঁকি নিতে পারে না ও।

বিকেলে বোটানিক্যাল গার্ডেনে এল রানা। এখানে দাঁড়িয়ে কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বেলজিয়ামে কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে জনপ্রিয়? নিজের চারদিকে একবার তাকিয়ে উত্তরদাতাকে বলতেই হবে: চুমো।

স্বামী স্ত্রীকে, প্রেমিকা প্রেমিককে, ছাত্র ছাত্রীকে কত বিভিন্ন কায়দায় জাপটে ধরে চুমো খাচ্ছে, দেখলে থ হয়ে যেতে হয়। আড়াল-আবডালেই, অর্থাৎ ভদ্রতাসূচক আব্রু বজায় রেখেই কর্মটি করছে সবাই, কিন্তু এদের প্রাইভেসির সংজ্ঞা একটু অন্যরকম। উপস্থিত ভিড়ের দিকে পিছন ফেরাটাই যথেষ্ট, তাতেই আব্রু রক্ষিত হলো বলে মনে করা হয়। বাগানে অল্পবয়েসী এক শ্রেণীর মেয়ের ভিড়ই বেশি, নানান সূক্ষ্ম কৌশল করে খদ্দের আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রানাকে একা টহল মারতে দেখে কয়েকটা ফাঁদ পাতা হলো বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি ফাঁদ সুচতুরভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে আগে থেকে ঠিক করা একটা জায়গায় পৌঁছে গগলের নির্বাচিত ফরজার লোকটার সাথে দেখা করল ও।

ফোন করে সাক্ষাৎকারের জায়গাটা মাত্র দশ মিনিট আগে নির্ধারণ করেছে রানা। নিজের স্টুডিও ছাড়া আর কোথাও দেখা করতে রাজি হয়নি লোকটা প্রথমে। তাহলে তোমার সার্ভিস আমার দরকার নেই, রানা এ-কথা বলতেই গলা নামিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেখা করতে রাজি হয়ে গেছে সে।

লোকটা বেলজিয়ান। নাম পিসিক। ছদ্মনাম, সন্দেহ নেই রানার। বেঁটে লোক তেমন পছন্দ করে না ও। পিসিক বেঁটে, রোগা ও হাড্ডিসার। চোয়াল দুটো ভীতিকর রকম উঁচু, চোখ দুটো ঘোলাটে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। এই লোকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দিতে পারেনি গগল। মনটা সেজন্যে খুঁত খুঁত করছে রানার। চেহারা যাই হোক, দামী স্যুট পরে আছে পিসিক। বাঁ হাতে হীরে বসানো তিনটে আঙটি। হারামের রোজগার ভালই করে সে। বিশ্বস্ত হোক বা না হোক, গগল জানিয়েছে, নিজের পেশায় লোকটা নাকি তুলনাহীন। সেজন্যেই এর কাছে আসা।

নিজের পরিচয় দিয়েই বলল রানা, 'একটা রেস্তোরাঁয় আমাদের জন্যে টেবিল রিজার্ভ করা আছে। সেখানে আলাপ হবে।'

প্রস্তাবটা পছন্দ না হলেও ভাল রোজগার হবে আশা করে রানার পিছু পিছু

বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এল পিসিক।

রুনিউভি রেস্তোরাঁয় ট্যাক্সি নিয়ে পৌছ্তে দশ মিনিট লাগল। বেয়ারা ওদেরকে রিজার্ভ করা কেবিনে নিয়ে গিয়ে বসাল। বিয়ারের অর্ডার দিল রানা। পিসিক হুইস্কি চাইল।

বেয়ারা চলে যেতে পকেট থেকে একটা লাল ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে টেবিলে রাখল রানা। লাইসেন্সটা মাসুদ রানার নামে। দু'বছর আগে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল থেকে ইস্যু করা। মেয়াদ শেষ হতে আরও ক'মাস বাকি আছে।

'যার নামে এই লাইসেন্স,' পিসিককে বলল রানা, 'অর্থাৎ মাসুদ রানা মারা গেছে। আমার নাম অরগ্যান। গাড়ি চালাবার নিয়ম ভঙ্গ করায় আমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর দেয়া হবে না। তাই মাসুদ রানার লাইসেন্সের ফ্রন্ট পেজটা বদলে ফেলতে চাই। নতুন ফ্রন্ট পেজ চাই, আমার নামে।' কথা শেষ করে পকেট থেকে অরগ্যানের পাসপোর্ট বের করে টেবিলে রাখল ও।

মাত্র তিনদিন আগে ইস্যু করা নতুন পাসপোর্টটা ঝকঝক করছে, দৃষ্টি এড়াল না পিসিকের। খুলে দেখল সেটা। তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা হাতে নিল। পাতা উল্টে দেখে নিল সেটাও। বলল, 'সহজ কাজ। অফিশিয়াল ডকুমেন্টস্ জাল করা হবে ইংলিশ অথরিটি তা আশা করে না, তাই এ ব্যাপারে তারা তেমন সাবধান নয়।' লাইসেন্সের প্রথম পৃষ্ঠায় টোকা মারল সে। এখানে ছোট একটুকরো কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে, তাতে লাইসেন্স নাম্বার আর হোল্ডারের পুরো নাম ছাপা হয়েছে। 'বাচ্চাদের প্রিন্টিং সেটের সাহায্যে আপনার নাম ছেপে নেয়া যাবে। ওয়াটার মার্কটা কোন সমস্যাই নয়।' মুখ তুলল পিসিক। ভুরু কুঁচকে বলল, 'মশিয়ে, নিশ্চয়ই এই সামান্য কাজের জন্যে লন্ডন থেকে এখানে আসেননি?'

'না। আরও দুটো কাজ আছে।' সিগারেট ধরাল রানা। তারপর পরবর্তী কাজ দুটোর বিশদ বর্ণনা দিল।

হাড্ডিসার কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল পিসিকের, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। অনুমতি না নিয়েই অন্যমনস্কভাবে চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট আর লাইটার রানার সামনে থেকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে এল নিজের সামনে, খুলে একটা সিগারেট বের করছে। 'আপনার বক্তব্য ঠিক মত যদি বুঝে থাকি, কাজ দুটো খুবই কঠিন হবে,' সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান মারল সে, গিলে ফেলল সবটুকু ধোঁয়া। আবার যখন কথা বলতে শুরু করল, শব্দের সাথে সাথে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। 'ফ্রেঞ্চ আইডেন্টিটি কার্ড; একজন শ্রমিকের পরিচয়-পত্র, তেমন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। অরিজিন্যাল একটা কপি যোগাড় করতে হবে, সেটা দেখে জাল করলে কাজটার কোথাও খুঁত থাকবে না। কিন্তু দ্বিতীয় যে কার্ডের কথা বলছেন, কখনও চোখে পড়েনি আমার। অসাধারণ একটা ফরমাশ নিয়ে এসেছেন আপনি, মশিয়ে।'

বেয়ারা বিয়ার আর হুইস্কি দিয়ে চলে গেল।

'তারপর, ফটোর ব্যাপারটা,' গ্লাসে দুটো চুমুক দিয়ে বলল পিসিক। 'কঠিন কাজ! বয়স অনেক বেশি দেখাতে হবে, চুলের রঙ আর দৈর্ঘ্যে মিল থাকা চলবে না।'

নিঃশব্দে নিজের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রানা।

'নকল ডকুমেন্টের জন্যে যারা আসে তারা প্রায় সবাই চায় ডকুমেন্টে তাদের নিজেদের বর্তমান বয়সের ছবি থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিবরণগুলো মিথ্যে তথ্য বহন করবে। কিন্তু আপনি আপনার বর্তমান বয়সের ফটো ডকুমেন্টে না রেখে রাখতে চাইছেন আগামী বিশ বছর পর আপনার যে চেহারা হবে সেই চেহারার ফটো। এখানেই জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।'

হুইস্কির গ্লাসে জোড়া চুমুক দিয়ে সেটা খালি করল পিসিক। চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে একটা বাড়িয়ে দিল রানাকে, আরেকটা নিজে ধরাল। কথা বলছে রানার চোখে চোখ রেখে, 'কার্ড দুটো যার সঙ্গে থাকবে তার যা বয়স প্রায় সেই বয়সের একজন লোককে খুঁজে বের করতে হবে আমার। শুধু বয়সের মিল থাকলে চলবে না, আপনার চেহারার সাথেও তার মিল থাকতে হবে, বিশেষ করে মুখ আর মাথার মিল থাকতে হবে। সেই লোকের চুল কেটে ছোট করতে হবে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী। তারপর সেই লোকের ছবি তুলে কার্ডে লাগাতে হবে। এর পরের করণীয় আপনার। ফটোর ওই লোকের আসল চেহারা দেখে নিজের চেহারা বদলে নিতে হবে আপনাকে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন তো, মশিয়ে?'

'পারছি—'

'এ-কাজে সময় লাগবে। ব্রাসেলসে কদ্দিন আছেন?'

'অক্টোবরের এক তারিখে ফিরে আসতে পারি,' একটু চিন্তা করে বলল রানা, 'তখন হয়তো দু'তিন দিন থাকব।'

পাসপোর্টটা খুলে ফটোর দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল পিসিক। খানিকপর পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে তাতে পাসপোর্টে লেখা নামটা টুকে নিল: আলেকজান্ডার জেমস কোয়েটিন অরগ্যান।

কাগজের টুকরো আর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পকেটে ভরল সে। পাসপোর্টটা ঠেলে দিল রানার দিকে। বলল, 'ঠিক আছে। করে দেয়া যাবে। তবে আপনার বর্তমান চেহারার দুটো পোরট্রেট ফটোগ্রাফ দরকার হবে আমার, ফুল ফেস অ্যান্ড প্রোফাইল। সময় এবং বিস্তর খরচ সাপেক্ষ কাজ। খরচের কথাটা বলছি এই জন্যে যে দ্বিতীয় যে-কার্ডটা চাইছেন আপনি সেটা যোগাড় করার জন্যে আমাকে হয়তো ফ্রান্সের পকেটমারদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এখানে পাওয়া গেলে তো ভালই, তা না হলে ফ্রান্সের দিকে হাত বাড়াতে...'

'কত?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'ফিফটি থাউজেন্ড বেলজিয়ান ফ্র্যাঙ্ক।'

একমুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'প্রায় তিনশো পাউন্ড স্টার্লিং। ঠিক আছে। দুশো পাউন্ড জমা রেখে যাব, বাকিটা ডেলিভারির সময় পাবে।'

টেবিলে ঠক্ ঠক্ করে গ্লাস ঠুকল পিসিক।

আওয়াজ শুনে বেয়ারা বিল নিয়ে এল। বিলের সাথে মোটা বকশিশ দিল রানা। আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করতে করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পিসিক। চেস্টারফিল্ডের প্যাকেটটা তুলে নিতে ভোলেনি।

রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে এসে রানাকে বলল, 'পোরট্রেট দুটো এখনই তুলে

ফেলতে চাই। চলুন, আমার নিজের স্টুডিও আছে।'

ট্যাক্সি নিয়ে মাইল দুই দূরের একটা ছোটখাট বেসমেন্ট ফ্ল্যাটে পৌঁছল ওরা। স্টুডিওর সামনে কাঁচের শো-কেসে প্রায়-উলঙ্গ মেয়েদের ফটো সাজিয়ে রেখেছে পিসিক। ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: এখানে পাসপোর্ট সাইজের ছবি তোলা হয়। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নামল ওরা। দরজার তালা খুলে একটু সরে দাঁড়িয়ে স্টুডিওতে ঢুকতে দিল পিসিক রানাকে।

ছবি তুলতে একটানা দু'ঘণ্টা সময় নিল পিসিক। প্রকাণ্ড একটা ট্রাঙ্ক খুলে বের করল অত্যন্ত দামী একটা ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ ইকুইপমেন্ট। অসংখ্য শেলফে সাজানো রয়েছে ছদ্মবেশ ধারণের বিচিত্র সরঞ্জাম: কলপ, কসমেটিকস, টুপি, উইগ, চশমা, মুখোশ ইত্যাদি।

এক ঘণ্টা পর পিসিকের মাথায় এক বুদ্ধি চাপল। 'মেকআপের সাহায্যে আপনারই বয়সটা যদি বাড়িয়ে নিয়ে ছবি তুলি, কেমন হয়? আপনার কাঠামো, চেহারা ইত্যাদির সাথে মিল আছে অথচ বয়স পঞ্চাশ-ষাটের কাছাকাছি, এমন লোক পাওয়া সহজ হবে না, মশিয়ে। তারচেয়ে, দাঁড়ান, চেষ্টা করে দেখি মেক-আপের ফলে কতটা বয়স বাড়ানো কমানো যায় আপনার।'

ত্রিশ মিনিট ধরে রানার মুখের উপর মেকআপ চড়াল পিসিক। ব্যস্তভাবে খুঁজে পেতে বের করল একটা আয়রন গ্রে রঙের গোল করে ছাঁটা চুল ভর্তি উইগ। রানার চোখের সামনে সেটাকে ধরে গম্ভীরভাবে বলল, 'ভাল করে দেখুন এটাকে। তারপর বলুন আপনার চুল কেটে, তাতে কলপ লাগালে ঠিক এই রকম দেখাবে কি না?'

উইগটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা। 'মাথায় পরে ফটো তোলা যাক, রেজাল্ট দেখে বলতে পারব।'

ছয়টা ছবি তুলল পিসিক। ডার্করুম থেকে আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে এসে ফটোগুলো রাখল ডেস্কে। দু'জনেই ঝুঁকে পড়ল সেগুলোর উপর। ফটোতে একজন বুড়ো, ক্লান্ত লোককে দেখা যাচ্ছে। ত্বকের রঙ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে, চোখের নিচে ক্লান্তি আর বেদনার কালিমা। দাড়ি-গোঁফ নেই, কিন্তু মাথায় গ্রে রঙের চুল দেখে বোঝা যায় কম করেও এই লোকের বয়স পঞ্চাশ তো হবেই।

'কাজ হবে,' পিসিক বলে উঠল।

'কিন্তু সমস্যা হলো,' বলল রানা, 'কসমেটিকস লাগাতে তুমি আধ ঘণ্টা ব্যয় করেছ। তারপর, উইগের ব্যাপারটাও রয়েছে। আমি একা মেকআপ নিলে এতটা নিখুঁত নাও দেখাতে পারে। এখানে কৃত্রিম আলোয় রয়েছি আমরা, কিন্তু খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কার্ডগুলো দেখাতে হবে আমাকে।'

হাসছে পিসিক। বলল, 'ফটোর সাথে চেহারার হুবহু মিল কেউ খোঁজে না, মিস্টার। তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপার আছে। যে লোক পরিচয়-পত্র পরীক্ষা করে সে প্রথমে চেহারাটা দেখে নেয়, তারপর পরিচয়-পত্র চেয়ে নিয়ে ফটোটা দেখে। ফটো দেখার আগেই আপনার চেহারার একটা ছাপ তার মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে যাবে, মনের ক্যানভাসে আঁকা চেহারাটার সাথে ফটোর চেহারা মিলিয়ে দেখবে সে। সেই চেহারার সাথে ফটোর চেহারার আকাশ পাতাল পার্থক্য না থাকলে তার মনে কোন সন্দেহের উদয় হবে না। তাছাড়া, আপনার চেহারার

সাথে ফটোর চেহারায় মিল খুঁজবে সে, অমিল নয়—সুতরাং, অমিল এক-আধটু থাকলেও তা তার চোখে ধরা পড়বে না।'

চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ধরাল পিসিক। 'আরও অনেক পয়েন্ট আছে। এই ফটোটার সাইজ টোয়েনটি ফাইভ বাই টোয়েনটি সেন্টিমিটার। কিন্তু আইডেনটিটি কার্ডে যে ফটোটা থাকবে সেটা হবে থ্রী বাই ফোর সাইজের। এরপর ধরুন, কার্ড ইস্যুর তারিখ যদি কয়েক বছর আগের হয়, বর্তমান চেহারার সাথে ফটোর চেহারা এক-আধটু অমিল থাকাই স্বাভাবিক। ফটোয় দেখা যাচ্ছে, আপনি বুক খোলা কলার লাগানো স্ট্রাইপ শার্ট পরে আছেন, কিন্তু যখন আপনার কাছ থেকে কার্ড দেখতে চাওয়া হবে তখন আপনার গায়ে এই শার্ট থাকবে না। সম্ভব হলে বুক খোলা শার্ট ব্যবহারই করবেন না। টাই স্কার্ফ বা গলাবন্ধ সোয়েটার পরতে পারেন।'

একটু বিরতি নিয়ে ঘন ঘন লম্বা টান দিয়ে সিগারেটটাকে ফিলটার টিপের গোড়া পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল পিসিক, তারপর নতুন একটা সিগারেট ধরাল। 'এরপর আসুন মেকআপ আর উইগের ব্যাপারে। একা একাই পারবেন আপনি। চুলটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার জন্যে কার্ড দাখিল করার আগে ছোট করে অবশ্যই ছেঁটে নিতে হবে আপনার চুল, কলপ লাগিয়ে গ্রে করে নিতে হবে। ফটোতে যতটা গ্রে দেখাচ্ছে তারচেয়ে বেশি রঙ চড়াতে হবে, কম তো নয়ই। চেহারায় বয়সের ছাপ ফোটাবার জন্যে আমার দুটো পরামর্শ আছে। এক, তিনদিন দাড়ি কামাবেন না, তারপর ধারাল ক্ষুর দিয়ে চেঁছে সাফ করবেন, তাতে দু'এক জায়গায় সামান্য কেটে যাবে, সেটাই দরকার। বয়স্ক লোকেরা দাড়ি কামাতে গিয়ে তাই করে। ক্ষুর দিয়ে কামালে ত্বকের চেহারা সামান্য হলেও বদলাবে, এই বদলটুকু আপনার জন্যে অনুকূল হবে। দুই···মশিয়ে কি দু'এক টুকরো করডাইট যোগাড় করতে পারবেন?'

অভিজ্ঞ লোকের মত কথা বলছে পিসিক, শুনছে রানা, এবং মনে মনে প্রশংসা করছে, কিন্তু চেহারাটা হয়ে আছে ভাবলেশহীন। গগল এক্ষেত্রেও দক্ষ একজন প্রফেশন্যালের কাছেই পাঠিয়েছে ওকে। উপযুক্ত ধন্যবাদ দিতে হবে তাকে, ভাবল ও, কাজ শেষ হবার পর। 'হয়তো,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'দুই কি তিন টুকরো করডাইট চিবিয়ে যদি গিলে ফেলেন,' পিসিক বলল, 'আধ ঘন্টার মধ্যে বমি বমি ভাব দেখা দেবে—অস্বস্তিকর, তবে অসহ্য কিছু নয়। এর ফলে আপনার চামড়ার রঙ আশ্চর্য ম্লান হয়ে যাবে, ঘাম দেখা দেবে সারা মুখে। রুট-মার্চের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে সৈন্যরা এই করডাইট খেয়ে অসুস্থ হবার ভান করে।'

'তথ্যটার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাই সময় মত ডকুমেন্টগুলো ডেলিভারি পাব কি না।'

'টেকনিক্যাল কাজগুলো সারতে খুব একটা সময় লাগবে না,' বলল পিসিক। 'সমস্যা একটাই থেকে গেল, সেটা হলো, আপনার দ্বিতীয় ডকুমেন্টের অরিজিন্যাল একটা কপি যোগাড় করা। চারদিকে খবর পাঠাতে হবে। যাই হোক, অক্টোবরের এক দুই তারিখে এলে সব ডেলিভারি দিতে পারব আমি।'

'কি ভাবে যোগাযোগ করব?'

'সরাসরি এখানে চলে আসবেন,' বলল পিসিক।

'না। ফোন করে জানাব আমি কোথায় দেখা হবে।'

একটু ইতস্তত করে পিসিক বলল, 'আপনার কাছে আমার যে ফোন নাম্বারটা আছে সেটা আমার জন্যে তেমন নিরাপদ নয়। এই নাম্বারে ফোন করলে আমাকে নাও পেতে পারেন।' একটু চিন্তা করল সে, তারপর বলল, 'এক কাজ করলে হয়। আজকে যে রেস্তোরাঁয় আলাপ হলো, সেই রুনিউভিতে অক্টোবরের এক তারিখ থেকে তিন তারিখ পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি। আপনি যদি না আসেন, মনে করব চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে।'

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাঁচ পাউন্ডের বিশটা নোটের দুটো বান্ডিল বের করে ছুঁড়ে দিল রানা। লুফে নিল পিসিক, দ্রুত ভরে ফেলল পকেটে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা। মাথা থেকে উইগ খুলে স্পিরিটে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখের মেকআপ তুলছে। নিঃশব্দে জ্যাকেট আর টাইটা পরে নিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল বেলজিয়ানের দিকে।

পিসিককে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে রানা। লোকটার চেহারার মধ্যে ফুটে আছে শেয়ালের ধূর্ততা।

মৃদু গলায়, শান্ত ভঙ্গিতে শুরু করল রানা, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে নাও তুমি। কাজ শেষ করে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রুনিউভিতে যাবার জন্যে অপেক্ষা করবে। একা। ওখানেই আমাকে ফেরত দেবে পুরানো লাইসেন্সের বাতিল ফ্রন্ট পেজ এবং নতুন লাইসেন্স। তার সাথে দেবে আজ তোলা ফটোর সবগুলো প্রিন্ট এবং নেগেটিভ।' একটু বিরতি নিল রানা। ওর চোখে ব্যাঙের গভীর দৃষ্টি, চেয়ে আছে পিসিকের চোখে। 'অরগ্যান এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের অরিজিন্যাল মালিকের নাম তুমি ভুলে যাবে। ডকুমেন্ট দুটোয় মার্ক বোডিনের নাম থাকবে, এই নামটাও মন থেকে মুছে ফেলবে তুমি। আমার সম্পর্কে কারও সাথে কোন রকম আলোচনা করবে না তুমি। এই নির্দেশগুলো একটাও যদি অমান্য করো, মারা যাবে। বুঝতে পারছ?'

রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল পিসিক। এতক্ষণ সে ভেবেছে, লোকটা একজন স্মাগলার, ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে ড্রাগস বা ডায়মন্ড পাচার করার জন্যে জাল কাগজপত্র সংগ্রহ করতে এসেছে। কিন্তু খুন-খারাবির কথা শুনে টনক নড়ে গেল তার। আরে, এ যে আরও গভীর পানির মাছ!

চেহারায় ভীতি ফুটিয়ে তুলে পিসিক বলল, 'বুঝেছি, মিস্টার।' ভয় নয়, পিসিকের মনে সেঁধিয়ে গেছে লোভ।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল এক তলায়, রাস্তায় বেরিয়ে মিশে গেল অন্ধকারে।

আধ মাইল হেঁটে এল রানা। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে ফিরল অ্যামিগোয়। রুম সার্ভিসকে টেলিফোনে ডেকে কোল্ড চিকেন আর এক বোতল Moselle-এর অর্ডার দিল। মেকআপের শেষ বিন্দুটা নিশ্চিহ্ন করার জন্যে প্রথমে গরম তারপর ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করল। বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ল রাত বারোটায়।

পরদিন সকালে হোটেল ছেড়ে প্যারিসগামী বারব্যান্ট এক্সপ্রেসে চড়ে বসল রানা। আজ সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ।

পাঁচ

ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের পুরো নাম:

Service de Documentation Exterieure et de Contre-Espionage, সংক্ষেপে SDECE. SDECE কয়েকটা ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত, প্রতিটি আলাদা আলাদা এলাকা বেছে নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে—তবে মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি ডিপার্টমেন্টেরই এক, ফ্রান্সের বাইরে এবং ভিতরে এসপিওনাজ এবং কাউন্টার এসপিওনাজ পরিচালনা করা। এলাকা বিভিন্ন হলেও এক ডিপার্টমেন্ট আরেক ডিপার্টমেন্টের এলাকায় প্রয়োজন হলেই নাক গলায়, বা সাহায্যের জন্যে হাত পাতে।

সার্ভিস ওয়ান নির্ভেজাল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে মাথা ঘামায়, এই ডিপার্টমেন্ট আবার কয়েকটা ব্যুরোতে বিভক্ত। ডিপার্টমেন্টের সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক প্রতীক হলো R. R-1, ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিসিস; R-2,ইস্টার্ন ইউরোপ; R-3, ওয়েস্টার্ন ইউরোপ; R-4,আফ্রিকা; R-5, মিডল ইস্ট; R-6, ফার ইস্ট; R-7, আমেরিকা—ওয়েস্টার্ন হেমিসফেয়ার।

সার্ভিস টু-এর দায়িত্ব কাউন্টার এসপিওনাজ পরিচালনা করা। সার্ভিস থ্রী এবং সার্ভিস ফোর একটা অফিসে বসে কমিউনিস্ট শক্তিগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ছক তৈরি করে। সার্ভিস সিক্স দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চোখ রাখে। দেশের প্রশাসন নিয়ে মাথা ঘামায় সার্ভিস সেভেন।

সার্ভিস ফাইভের এক শব্দে নামকরণ করা হয়েছে: অ্যাকশন। প্যারিসের উত্তর-পুবে Porte des Lilas-এর কাছে বিশাল এক বিল্ডিং জুড়ে অ্যাকশন সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার। এই হেডকোয়ার্টারের অধীনে কয়েক হাজার দুর্ধর্ষ এজেন্ট ফ্রান্সের ভিতরে এবং বাইরে কাজ করছে। এদের বেশিরভাগই কর্সিকান।

বুদ্ধি, সাহস, স্বাস্থ্য সন্তোষজনক বিবেচিত হলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে এদেরকে ছেঁকে তুলে নিয়ে পাঠানো হয় Satory Camp-এ, সেখানে মানুষ এবং বস্তুকে ধ্বংস করার জন্যে যত রকম কৌশল আছে সব শেখানো হয়। ওখান থেকে ট্রেনিং পেয়ে এরা স্মল আর্মস ফাইটিংয়ে, আন-আর্মড কমব্যাট কারাতে এবং জুডোয় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এরপর এরা রেডিও কমিউনিকেশন কোর্স শেষ করে, স্যাবোটাজের ধরন-ধারণ শেখে, টরচারসহ এবং টরচারবিহীন ইনটারোগেশন পদ্ধতি আয়ত্ত করে, শেখে কিডন্যাপ করার কৌশল, পায় মানুষ খুন করার নিপুণ শিক্ষা।

এদের কেউ কেউ শুধু ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে, অনেকেই একাধিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। দায়িত্ব পালনের সময় প্রয়োজনে খুন করার স্বাধীনতা রয়েছে এদের, এবং এ ক্ষমতা এরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে।

SDECE-এর ডিরেক্টর, জেনারেল ইউজেনি গুইবাউড ফ্রেঞ্চ মেনল্যান্ডের অধিবাসী। কিন্তু সবক'টা ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্সিকান। এর অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিটি শাখায় কর্সিকানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আঞ্চলিক সচেতনতা কর্সিকানদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট, হেড অভ দি ডিপার্টমেন্ট তাদের নিজেদের একজন হওয়ায় গর্বিত কর্সিকানরা কাজে উৎসাহ বোধ করে।

সেদিন সকালে রানা যখন বারব্যান্ট এক্সপ্রেসে চড়ছে, ঠিক সেই সময় প্যারিসে নিজের চেম্বারে রিভলভিং চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর ঝুঁকে একটা সদ্য আগত রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছে অ্যাকশন সার্ভিসের কর্সিকান হেড অভ দি ডিপার্টমেন্ট কর্নেল বোল্যান্ড। প্রকাণ্ডদেহী কর্নেলের মাথা জোড়া চকচকে টাক। মুখটা চৌকো। বাঘের মত ভয় পায় সবাই এই লোককে। সাংঘাতিক বদমেজাজী।

ছোট একটা রিপোর্ট, কিন্তু কর্নেলের টনক নড়িয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। রিপোর্টটা এসেছে অ্যাকশন সার্ভিসের ইটালি-এজেন্টের কাছ থেকে। মেসেজের সারমর্ম হলো: আগস্ট মাসের আটাশ তারিখ থেকে চলতি মাসের চার তারিখ পর্যন্ত রানা এজেন্সীর রোম শাখায় নাকি অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। অ্যাকশন সার্ভিসের ওই এজেন্টের কানে এ সম্পর্কে একটা গুজব আসে চলতি মাসের ছয় তারিখে। গুজবটায় কোন নির্দিষ্ট তথ্য বা পরিষ্কার কোন বক্তব্য ছিল না। গুজবটার উৎস সম্পর্কেও উক্ত এজেন্ট কিছু জানতে পারেনি। যাই হোক, গুজবটা শোনা মাত্র রানা এজেন্সীর রোম শাখার উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং তদন্ত চালিয়ে দেখা যায় আগস্টের আটাশ তারিখ থেকে চলতি মাসের চার তারিখ পর্যন্ত ক্লায়েন্টদের জন্যে রানা এজেন্সী অজ্ঞাত কারণে বন্ধ ছিল। বন্ধ থাকলেও এজেন্সীর সদস্যরা দুই শিফটে বারো ঘণ্টা পর পর অফিস-বাড়িতে প্রবেশ করেছে এবং বেরিয়ে গেছে। তদন্তে আরও প্রকাশ, এজেন্সীর ব্রাঞ্চ-চীফ মারদাস্ত্রোয়ানি মোনিকা আলাবিনোর দোতলার বাসস্থান এবং নিচের অফিসে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই আট দিনের জন্যে। প্রহরীদের নেতৃত্বে সম্ভবত এজেন্সীর কর্মচারী সাবদেগনা ম্যাটাপ্যান ছিল। এই আটদিন বাড়ি এবং অফিস ছেড়ে কোথাও তাকে কেউ বেরোতে দেখেনি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এবং রহস্যময়, তাই হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করা হলো। রানা এজেন্সীর রোম শাখার বর্তমান আচরণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পর পর দু'বার পড়ে ফাইলটা বন্ধ করল কর্নেল বোল্যান্ড। রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা ডি নোবিলি চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজল। চিন্তা করছে।

কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কর্নেলের। নিজেকে সে কারও চেয়ে কম যোগ্য বলে মনে করে না বটে, কিন্তু একসাথে তিনটে প্রমোশন পেয়ে অ্যাকশন সার্ভিসের হেড অভ দি ডিপার্টমেন্ট হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধাপে ধাপে উন্নতি করে কোন দিনই সে এত বড় ক্ষমতার আসনে উঠতে পারত না, তার আগেই অবসর গ্রহণের সময় হয়ে যেত। যা সম্ভব নয়, কোন কালে সে আশা করেনি, তাই ঘটে গেছে তার জীবনে। দিনকে রাত করতে পারে, রাতকে করতে পারে দিন, কাপু সম্পর্কে এই কথাটা প্রায়ই শুনত সে। ঠিক বিশ্বাস করত না, কিন্তু তাই বলে কাপুর প্রতি আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা প্রকাশে কখনও ত্রুটি করেনি সে। এই

আনুগত্যেরই প্রতিদান দিয়েছেন কাপু উ সেন। যোগ্য সম্ভাব্য তিন প্রার্থীকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে তাকে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছেন এই ক্ষমতার সিংহাসনে। প্রশাসনে কাপুর সাংঘাতিক প্রভাব আছে, তা আরেকবার প্রমাণিত হলো। সে আজ দু'বছর আগের কথা।

অ্যাকশন সার্ভিসের সর্বময় কর্তা হবার পর থেকে তার ঘাড়ে ইউনিয়ন কর্সের কিছু কিছু গুরুতর কাজের দায়িত্ব এসে চাপে। কাপু উ সেন প্রচ্ছন্ন আভাস দিয়ে তাকে বলেছেন, তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের তালিকায় একেবারে নিচের দিকে কর্নেল বোল্যান্ডের নাম তিনি রাখবেন কিনা ভেবে দেখবেন, যদি সে সফলতার সাথে ইউনিয়ন কর্সের সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

আজ থেকে দু'বছর আগে যে কাজগুলো কাপু উ সেন তাকে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল মাসুদ রানা এবং তার ইনভেস্টিগেশন ফার্ম 'রানা এজেন্সী' সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে ফাইল তৈরি করা। মাসুদ রানা সম্পর্কে মোটামুটি জানা ছিল কর্নেলের। বি.সি.আই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট। বার্মায় উ সেনের সাথে একবার টক্কর খেয়েছিল। সুদর্শন, ক্ষিপ্রবুদ্ধি এই স্মার্ট বাংলাদেশীর উপর কাপু উ সেনের রাগ বা দ্বেষ কিছুই প্রকাশ পায়নি তখন। তিনি শুধু তথ্য সংগ্রহ করতে বলেই চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ কিছুদিন আগে তাকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, 'মাসুদ রানার খবর কি?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় একটু চমকে উঠলেও এক সেকেন্ড পর গড় গড় করে মাসুদ রানার সর্বশেষ সংবাদ দিল সে।

সুসজ্জিত বিশাল হলরুমে পায়চারি করছেন অন্ধ কাপু। জড়োসড়ো হয়ে একটা সোফার এক ধারে বসে আছে কর্নেল বোল্যান্ড। কাপুর সামনে এলেই শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে সে। আর সব কাপুর সাথে বর্তমান কাপুর কোন তুলনাই হয় না। কাপু উ সেনকে ঠিক রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি। দেবতাদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সাহায্য পাচ্ছেন প্রতিমুহূর্তে। তা নাহলে তিনি 'হও' বললেই সব কিছু হয়ে যায় কিভাবে, 'মরো' বললেই শত্রুরা মরে যায় কিভাবে!

এর আগে কাপু উ সেনের এই উত্তেজিত মূর্তি কখনও দেখেনি কর্নেল বোল্যান্ড। লাল কার্পেটে মোড়া বিশ গজ লম্বা হলরুমে কয়েক সেট কালো চামড়া মোড়া সোফা, মেহগনি কাঠের আরাম কেদারা, চেয়ার-টেবিল, মিনিবার ইত্যাদির মাঝখানে দ্রুত পায়চারি করছেন তিনি। চোখের দৃষ্টি উপরের সিলিংয়ের দিকে। ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি লম্বা, সরু কোমর, প্রশস্ত কিন্তু আড়ষ্ট কাঁধ, পিঠটা খাড়া ঢালের মত। পরনে ডাবল-ব্রেস্টেড অ্যাশ কালারের মোহায়ের স্যুট। মাথার চুল প্রতিভাবানদের যেমন থাকে, এলোমেলো। কাপুর চোখে গাঢ় রঙের সান গ্লাস, ওটার হ্যান্ডেল থেকে চিকণ একটা তার বেরিয়ে এসে ঢুকেছে কোটের ব্রেস্ট পকেটে। কোন কিছু না ছুঁয়ে, না ধরে, ঠাহর করার কোন রকম চেষ্টা না করে স্বাভাবিক মানুষের মত হলরুমের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছেন তিনি। মুখটা লাল হয়ে আছে। মৃদু, ভরাট গলায় কথা বলছেন, সারা ঘরে গমগম করছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

'দুর্লভ একটা ব্যক্তিত্ব সন্দেহ নেই। প্রতিভাবান পুরুষ। কিন্তু মাসুদ রানার

দুর্ভাগ্য, সে কর্সিকান হয়ে জন্মায়নি। জন্মালে কাপু হিসেবে আরেকজন যোগ্য পথ প্রদর্শককে পাবার সৌভাগ্য হত তোমাদের।' হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে কর্নেলের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ভাবাবেগ প্রকাশ করে ফেলে নিজের উপর একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলো। ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে। 'কথা দিয়েছিলাম প্রতিশোধ নেব। সময়টাও ভেবে রেখেছিলাম মনে মনে। সেই সময় এখন হয়েছে। অভিষেকের খুব বেশি দেরি নেই। কর্নেল, মাসুদ রানাকে দেয়া আমার সেই প্রতিশ্রুতি অভিষেক উৎসবের আগেই রক্ষা করতে চাই। তুমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করো। জ্যান্ত চাই আমি ওকে।'

দ্রুত উঠে দাঁড়াল কর্নেল বোল্যান্ড। অসীম শ্রদ্ধায় মাথাটা নত করে বলল, 'তাই হবে, মশিয়ে।'

তর্জনী নেড়ে কর্নেলকে বসতে নির্দেশ দিলেন উ সেন। 'তোমার ফাইলে ওর সম্পর্কে যে তথ্য নেই, সেটা জেনে নাও। যদি চায়, একাই ইউনিয়ন কর্সের মস্ত ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে সে। সুতরাং, আঁট ঘাট বেঁধে, অত্যন্ত সাবধানে এগুতে হবে তোমাকে। ফাঁক পেয়ে যদি বেরিয়ে যেতে পারে, সাংঘাতিক বিপদ হয়ে দেখা দেবে পরে। আহত করে ধরতে হবে ওকে, তা নাহলে কোনদিন ধরা যাবে না।' কি যেন চিন্তা করলেন কাপু, তারপর বললেন, 'বি. সি-আইয়ের কোন দায়িত্ব যখন তার কাঁধে থাকবে না, শুধু তখনই আহত করবে। আভাসে হলেও, বি. সি-আইকে আমরা বোঝাতে চাই, তাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। যদিও তাতে লাভ হবে না কিছু, মাসুদ রানা খুন হলে তারা তাদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে আমাদের পিছনে লাগবেই। কিন্তু, কূটনৈতিক পর্যায়ে বিরোধটা মিটিয়ে ফেলার সময় শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে হাতে কিছু রাখতে পারলে ভাল হয়।' কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালেন কাপু, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন হঠাৎ, পিছন ফিরলেন না, বললেন, 'কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার দরকার নেই। কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি নিজে এসে দেখা কোরো।' যান্ত্রিক পুতুলের মত ধীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মাসুদ রানা সম্পর্কে তাকে অযথা সাবধান করেননি কাপু, কথাটা ক'দিন পরই বুঝতে পেরেছিল কর্নেল বোল্যান্ড। ইউনিয়ন কর্সের দুর্ধর্ষ কয়েকজন লোক পর পর কয়েকবার ব্যর্থ হলো মাসুদ রানাকে আহত করতে। তৃতীয়বার তো সব ক'টা মারাই পড়ল তার হাতে।

ব্যর্থতার খবর শুনে কোন মন্তব্য করেননি কাপু উ সেন। শিষ্যদের ওপর রাগ বা রানার উপর আক্রোশ, কিছুই প্রকাশ পায়নি তাঁর প্রশান্ত ভাব-ভঙ্গিতে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'একটা অ্যামবুশের প্ল্যান দিচ্ছি। আমি চাই দায়িত্বটা লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরিকে দেয়া হোক।'

কর্নেল তখুনি বুঝতে পেরেছিল, মাসুদ রানাকে আহত করে ধরার ব্যাপারে কাপু উ সেন নিজস্ব কৌশলের কিছু অবদান রাখতে চাইছেন।

মাসুদ রানাকে আহত করার নিখুঁত একটা ছক পাকাপোক্ত ভাবে সাজিয়ে দিলেন কাপু উ সেন। প্ল্যানটা শুনেই বুকের ভিতর লাফ দিয়ে উঠেছিল কলজেটা লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরির। কাপুর প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল

তার। এমন নিটোল, নিশ্ছিদ্র অ্যামবুশের পরিকল্পনা শুধু একজন প্রতিভাবানের মগজ থেকেই বেরোতে পারে।

কিন্তু সূর্যাস্তের সময় জানার জন্যে ভুল করে এক বছর আগের পঞ্জিকা দেখেই এমন সুন্দর প্ল্যানটার সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলল সে। ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কিন্তু তাকে মৃত্যুর দরজা থেকে টেনে সরিয়ে আনে কর্নেল বোল্যান্ড। জাঁ থেরিকে সে বলেছিল, 'তোমার ব্যর্থতার খবর কাপুকে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং, আরেকবার চেষ্টা করে দেখো। এবারও যদি ব্যর্থ হও, কথা দিচ্ছি, আত্মহত্যা করতে নিষেধ করব না। তখন তোমার পথ আমাকেও অনুসরণ করতে হবে কিনা।'

একটু বিরতি নিয়ে জাঁ থেরিকে সে বলেছিল, 'মাসুদ রানা রোম থেকে ঢাকায় ফিরে যাবে বলেই মনে করি। তার আগেই তোমরা চলে যাও ওখানে। গোপনে শুধু তোমাকে বলছি, আহত করার দরকার নেই—আপদটাকে একেবারে শেষ করে দাও। সাবধান, কাপু যেন একথা না শোনেন। তাহলে ঘাড়ে গর্দান থাকবে না আমার।'

অবশেষে পঁচিশ তারিখে মেসেজ এল: টাইম বোমার বিস্ফোরণে মাসুদ রানা মারা গেছে। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু বিস্তারিত রিপোর্ট যখন এসে পৌঁছল, সন্তুষ্ট হতে পারল না কর্নেল বোল্যান্ড। অকুস্থল থেকে দুটো লাশ এবং একটা অচেতন দেহ অ্যাম্বুলেন্স যোগে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু মৃত মাসুদ রানার লাশের চেহারা কেউ দেখেনি। জাঁ থেরি নিজে ছবি তুলেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সাদা চাদরে ঢাকা দুটো লাশ। লম্বা চুল দেখে একটা লাশ চেনা যায়, ওটা রানা এজেন্সীর ঢাকা শাখার কর্মচারী মিস সালমার, কিন্তু অপর লাশটা চাদর দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা, চেনার কোন উপায় নেই। আহত লোকটার নাম গিলটি মিয়া, রানা এজেন্সীর ঢাকা শাখার প্রধান, তাকে সরাসরি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মিস সালমা এবং অপর লাশটিকে নিয়ে দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে না গিয়ে, অনুসরণরত জাঁ থেরির লোককে ফাঁকি দিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। সেই অ্যাম্বুলেন্স বা লাশ দুটোর আর কোন সন্ধান করা যায়নি। এখন, প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় লাশটি যে মাসুদ রানার ছিল, তার প্রমাণ কি?

কোন প্রমাণ নেই।

তবে, জাঁ থেরির বক্তব্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় লাশটা রানার ছাড়া আর কারও হতেই পারে না। বোমা ফাটার সময় রানা অফিসেই ছিল, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। সেই মুহূর্তে অফিসে আর মাত্র দু'জন ছিল—সালমা এবং গিলটি মিয়া। সুতরাং, দ্বিতীয় লাশটা মাসুদ রানার ছাড়া আর কারও হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক। যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মনের খুঁত খুঁতে ভাবটা তবু দূর হয়নি কর্নেল বোল্যান্ডের। সেজন্যেই রিপোর্ট করার জন্যে কাপুর সাথে দেখা করতে গিয়ে ঠিক যা ঘটেছে তাই বলেছে সে, মাসুদ রানাকে খুন করা হয়েছে, পরিষ্কার ভাবে এই কথাটা উচ্চারণ করেনি।

রিপোর্ট শুনে গম্ভীর হয়ে ছিলেন উ সেন। কোন মন্তব্য বা কোন প্রশ্ন করেননি

তিনি। খানিক পর উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে চাপা কণ্ঠে শুধু বলেছিলেন, 'গেট আউট!'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এসেছিল সেদিন কর্নেল বোল্যান্ড। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, তার উপর চটে গেছেন কাপু। কপাল মন্দ তার, কি আর করা!

ধীরে ধীরে চোখ খুলে ডি নোবিলি চুরুটটায় আবার অগ্নি-সংযোগ করল কর্নেল বোল্যান্ড। ডেস্কের উপর সদ্য আগত রিপোর্টের দিকে আরেকবার তাকাল। এর মানে কি? রানা এজেন্সীর রোম শাখা অফিসে আট দিনের জন্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল—কেন? কেউ এসেছিল ওখানে? কে হতে পারে? রানা···ভয়ের একটা হিম শীতল স্রোত বয়ে গেল কর্নেলের শরীরে···তাই যদি হয়, ভাবছে সে, আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না তার। যাই হোক, আসল রহস্যটা দ্রুত জানার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলা করা চলে না। ইন্টারকমের সুইচ অন করে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিল, 'রানা এজেন্সীর রোম শাখার সদস্য সাবদেগনা ম্যাটাপ্যানের ফাইল পাঠাও। কুইক!'

এক মিনিট পরই দেখা গেল ম্যাটাপ্যানের ফাইল খুলে গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ নিচ্ছে কর্নেল বোল্যান্ড। তথ্যগুলো এ ভাবে ফাইলবন্দী করা হয়েছে:

সাবদেগনা ম্যাটাপ্যান

জন্ম: ১৯২৮

শিক্ষা: অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নেই। ইংরেজী, ইটালি এবং কিছু কিছু বাংলা জানে।

জাতীয়তা: ইটালিয়ান।

চেহারার বর্ণনা: সাত ফিট লম্বা, প্রকাণ্ড গরিলার মত শরীর। কপালে লম্বা কাটা দাগ।

পেশাগত জীবন: প্রথম জীবনে কাউন্ট মারদাস্ত্রোয়ানি ডোনান্টো ল্যাগারাস ডি আলবিনোর এবং বর্তমানে তার মেয়ে মোনিকা আলবিনোর খেদমত করেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান পেশা: রানা এজেন্সীর সদস্য, মোনিকা আলবিনোর সেক্রেটারি কাম বডিগার্ড।

বর্তমান ঠিকানা: রোম, রানা এজেন্সীর শাখা অফিস।

অতিরিক্ত তথ্য: মোনিকা আলবিনো হাওয়া বদল করতে ফ্রান্সে আসে ১৯৭১ সালে, সাথে ছিল ম্যাটাপ্যান। সে-সময় প্যারিসের একটা মেয়ের সাথে ম্যাটাপ্যানের ঘনিষ্ঠতা হয়, ঘনিষ্ঠতার ফলে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মেয়েটিকে সে বিয়ে করেনি। কিন্তু নিজ ঔরস জাত সন্তানকে যাতে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই মেরে ফেলা না হয় তার জন্যে সে দায়িত্ব দিয়ে যায় তার এক নিঃসন্তান বন্ধু এবং বন্ধু-পত্নীকে। এরা ফ্রান্সেরই বাসিন্দা। এদের সাথে ম্যাটাপ্যানের একটা মৌখিক চুক্তি হয়। ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত গর্ভে সন্তান ধারণ করার জন্যে মেয়েটিকে কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়। টাকাটা ম্যাটাপ্যান এবং নিঃসন্তান দম্পতি ভাগাভাগি করে দেয়। ঠিক হয়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পালক-সন্তান হিসেবে গ্রহণ

করবে তার বন্ধু এবং বন্ধু-পত্নী।

যথা সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একটি মেয়ে। এখন তার বয়স সাত। বছর দুই আগে মেয়েকে দেখার জন্যে ফ্রান্সে এসেছিল ম্যাটাপ্যান। সেই শেষ।

ম্যাটাপ্যানের বন্ধুর নাম: ভিক্টর কাউলাস্কি। ঠিকানা: দিসতে দ্যু বুলেভার্ড, প্যারিস।

মেয়েটার নাম: ভ্যালেন্টিনা।

মেয়ের খবর সংগ্রহ করার জন্যে ম্যাটাপ্যান নিয়মিত চিঠি লেখে। ভিক্টর কাউলাস্কিও উত্তর দেয়।

ফাইলটা পড়া শেষ হতেই একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল অ্যাকশন সার্ভিসের হেড অভ দি ডিপার্টমেন্ট কর্নেল বোল্যান্ডের মাথায়। ম্যাটাপ্যানকে চাই তার। সে-ই বলতে পারবে রানা এজেন্সীর রোম শাখায় আট দিনের জন্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কেন। ম্যাটাপ্যানকে প্যারিসে টেনে আনার বুদ্ধি এসে গেছে তার মাথায়। ইন্টারকমের সুইচ অন করে সেক্রেটারিকে ডাকল সে, 'আমার চেম্বারে এসো। এখুনি!'

ছয়

দুপুর। গার দ্যু নর্দ প্রায় নির্জন স্টেশন। রানাকে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে থামল বারব্যান্ট এক্সপ্রেস ট্রেন। ট্যাক্সি নিয়ে প্যালেস দি লা ম্যাডেলিন ছাড়িয়ে ছোট কিন্তু সুরম্য একটা হোটেলে উঠল ও। সুপরিচিত এলাকার বিখ্যাত হোটেলগুলো এড়িয়ে যাবার অন্যতম কারণ, বেশ ক'দিন প্যারিসে থাকতে হবে ওকে, এ-সময় পরিচিত কারও চোখে পড়ে যেতে চায় না ও। রিসেপশনিস্টের সামনে কোন মেয়ে যদি হঠাৎ চিনতে পেরে 'হাই রানা' বলে কান ফাটায়, চোখ কপালে উঠে যাবে রিসেপশনিস্টের, কেননা রানা খাতায় নিজের নাম লিখিয়েছে অরগ্যান হিসেবে।

প্যারিসে পা দিয়েই একটা স্ট্রীট ম্যাপ কিনে নিয়েছে রানা। যে-সব বিশেষ বিশেষ জায়গা ঘুরে ফিরে দেখার ইচ্ছে, নামগুলো একটা নোটবুকে টুকে নিয়েছে। গতিবিধি এবং আচরণে নতুন ট্যুরিস্টদের স্বভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছে ও। উৎসাহী, মুগ্ধ একজন ট্যুরিস্টের মতই ঐতিহাসিক দর্শনীয় জায়গাগুলো নিয়মিত দেখতে যায়, তন্ময় হয়ে উপভোগ করে স্থাপত্য-শিল্পের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য।

প্রথমে ধরল আর্ক ডি ট্রায়াম্পকে। ঘুরে ফিরে মনুমেন্ট দেখে অথবা কাফে দে এলিসিতে বসে প্লেস দে ইতোয়লিকে ঘিরে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দালানগুলোর কার্নিস, ছাদ, উপরতলার সার সার জানালার গায়ে চোখ বুলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কফির কাপে চামচ দিয়ে চিনি নাড়ছে আর মনে মনে হিসেব কষছে উপরতলা থেকে আর্কের নিচের ইটারন্যাল ফ্রেমের দূরত্ব, অ্যাঙ্গেলস অভ ফায়ার, গুলি করে নিরাপদে কেটে পড়ার উপায়। এই চিরঞ্জীব অগ্নিশিখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের ত্যাগ এবং অসমসাহসের প্রতি সম্মানস্বরূপ

জ্বালানো হয়েছে। নিহতরা অধিকাংশই কর্সিকান, তাই রীতি অনুযায়ী অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ করেই নতুন কাপু, দ্বিতীয়বার তিন বছর মেয়াদের জন্যে নির্বাচিত উ সেন, এখানে একবার আসবে ইউনিয়ন কর্সের শহীদ সদস্যদের প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপনের জন্যে।

তিনদিন পর জায়গাটার সুবিধে অসুবিধে যোগ বিয়োগ করল রানা, ফলাফল সুবিধের নয় দেখে নিরাশ হলো। চতুর্থ দিন সকালে নতুন দ্রষ্টব্য স্থানের দিকে রওনা হলো সে।

মন্ত ভ্যালেরিনে শহীদ ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্যান্স বাহিনীর গণকবরে এল রানা হাতে এক তোড়া ফুল নিয়ে, সাথে জুটিয়ে নিল একজন গাইডকে। প্রায় কিছুই শুনছে না ও, তবু দেড় মিনিটেই বকবক করে মাথা ধরাবার কারণ হয়ে দাঁড়াল লোকটা। গাইডরা সবাই জানলেও, ইউনিয়ন কর্সের কাপু অভিষেক শেষ করে এই শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসে একথাটা অপ্রাসঙ্গিক বলেই তারা কেউ ট্যুরিস্টদেরকে জানাতে উৎসাহবোধ করে না। কিন্তু রানা বুদ্ধি করে একজন কর্সিকান গাইডকে বেছে নিয়েছে। কর্সিকান মাত্রই ইউনিয়ন কর্সের সদস্য, তা হয়তো নয়। কিন্তু এই জায়গার গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং অভিষেক অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসায় ইউনিয়ন কর্স নিজেদের লোককে এখানে রাখবেই। দেখা গেল, রানার অনুমান মিথ্যে নয়। রানিং কমেন্ট্রি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থেমে গেল, গাইড খুব নিচু গলায়, প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'মশিয়ের কি জানা আছে, ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্যান্সে শতকরা ষাটজন ছিল কর্সিকা দ্বীপের বাসিন্দা? সেজন্যে কর্সিকানরা গর্বিত। ওদের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বজোড়া যার নাম ছড়িয়ে আছে, সেই ইউনিয়ন কর্সের প্রধান কাপু স্বয়ং এখানে আসেন শহীদদের প্রতি কর্সিকানদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে...।'

রানা কোনরকম আগ্রহ দেখাল না। শহীদ মিনারে ঢোকার পর পরই পাশের জেলখানার উঁচু পাঁচিলটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। চারদিকের উঁচু বিল্ডিংগুলোর ছাদ থেকে শহীদ মিনারের মাঝারি আকারের চাতালটাকে আড়াল করে রেখেছে পাঁচিলটা। এই চাতালে দাঁড়িয়েই এক মিনিট মৌনতা অবলম্বন করে শহীদদের প্রতি সম্মান দেখাবে কাপু উ সেন। কিন্তু বাইরের কোন বহুতলা বাড়ির ছাদ থেকে তাকে দেখা যাবে না। একঘণ্টা পর গাইডকে বিদায় করে দিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

প্লেস দে ইনভ্যালিড-এ এল রানা। দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড হোটেল দি ইনভ্যালিড। এখানে নেপোলিয়নের কবর রয়েছে। বিশাল চৌরাস্তার পশ্চিম দিকটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল রানার দৃষ্টিকে। রু ফ্যাবার্ত খুদে তেকোণা প্লেস দে সান্তিয়াগো দ্যু বিলির সাথে যেখানে মিশেছে, এককোণে একটা কাফেতে বসে পুরো একটা সকাল কাটাল রানা। ওর ঠিক মাথার উপর সাত কি আট তলা বিল্ডিংটা ১৪৬নং রু দে গ্রেনেল। দুই রাস্তার কোণে শেষ বাড়ি এটা। এর সামনেই রু দে গ্রেনেল রু ফ্যাবার্তের সাথে নব্বুই ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে মিশেছে। বাড়িটার উপরতলা থেকে একজন অস্ত্রধারী, হিসাব কষে অনুমান করল রানা, বাগানের সামনের ভাগ, ভিতরের চাতালে ঢোকার প্রবেশ পথ, প্রায় সবটা প্লেস দি ইনভ্যালিড এবং দুই কি তিনটে রাস্তা গুলি করার আওতায় পেতে পারে। হাতের

পাঁচ হিসেবে জায়গাটা উতরে যেতে পারে. কিন্তু বাধ্য না হলে এখান থেকে গুলি করবে না রানা। বাড়িটার যে-কোন প্রান্তে ছাদ বা জানালা থেকে পার্কিং এলাকা, প্রবেশ পথ, চাতাল. বাগান, কবর এবং রাস্তার দূরত্ব দু'শো মিটারেরও বেশি। প্লেস দে সান্তিয়াগোর গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইম গাছগুলো, ১৪৬ নং বাড়িটার নিচের তলায় জানালায় দাঁড়ালে দৃষ্টিপথকে বাধা দেবে বিশাল ছাতার মত একটা শাখা, সেটার উপর বসে সাদা ফুলের মত পালক ছড়াচ্ছে ভওবান-এর স্ট্যাচুর কাঁধে ঝাঁক ঝাঁক কবুতর। কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল রানা।

একটা দিন কাটল নটরডেম ক্যাথেড্রালে। গলি. তস্য গলি. বাঁকানো লোহার সিঁড়ি, বাড়ির ছাদ, চিলেকোঠা—বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যাথেড্রালে ঢোকার জায়গাটাকে পরীক্ষা করল রানা। উৎসাহিত হবার মত একটা জায়গাও চোখে পড়ল না। সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গাই খুব কাছে হয়ে যাচ্ছে। আবার প্লেস দ্য পারভিসের ছাদটা থেকে দূরত্ব প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি।

আজ সেপ্টেম্বরের আটাশ তারিখ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সব শেষে এল রানা। রু দি রেনেস-এর দক্ষিণ প্রান্তের চৌরাস্তা এটা। আগের নাম ছিল প্লেস দে রেনেস, সিটি হলের ক্ষমতা গলিস্টদের হাতে আসার পর এই চৌরাস্তার নতুন নামকরণ করা হয়েছে, Place du 18 Juin 1940. একটা প্রাসাদোপম বাড়ির দেয়ালে সাদা মার্বেল পাথরের উপর কালো হরফে নামফলক, সেটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

এই চৌরাস্তার সাথে জড়িয়ে আছে যুদ্ধের বেদনাদায়ক স্মৃতি। দক্ষিণ দিকে বিশালকায় কচ্ছপের মত গুঁড়ি মেরে রয়েছে রেলওয়ে স্টেশন গার মন্তপারনাস। ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা কংক্রিটের অতিকায় টারম্যাকের উপর। সার সার অসংখ্য যানবাহন মাকড়সার জালের মত জটিলতার সৃষ্টি করছে, হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ছে বুলেভার্ড দে মন্তপারনাস, রুডি ওডেসা এবং রু দি রেনেস থেকেও অবিরাম স্রোতের মত যানবাহন বেরিয়ে এসে যোগ দিচ্ছে একই রাস্তায়, বুলেভার্ড দে মন্তপারনেসে। ঘাড় ফিরিয়ে রু দে রেনেসের দু'পাশে দাঁড়ানো লম্বা, উঁচু দালানগুলোর দিকে তাকাল রানা। উঁচু দালানের উপরতলা থেকে চৌরাস্তাটা দেখা যায়। ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। স্টেশনের মস্ত এলাকা, রেলিং দিয়ে ঘেরা। প্রতিদিন গেটের ভিতরে ঢোকে হাজার হাজার গাড়ি, ট্রেন-যাত্রীদের নামিয়ে দেয়, তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। একলক্ষ যাত্রী রোজ আসা যাওয়া করে এই স্টেশনে। প্যারিসের মেইন লাইন স্টেশনগুলোর মধ্যে এটা একটা। আগামী শীতে এই কোলাহল, এত ব্যস্ততা সব থেমে যাবে। এর ধোঁয়াটে ছায়ায় কত দিনের কত ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত স্মৃতি জমা হয়ে আছে, সব চিরকালের জন্যে মুছে সাফ হয়ে যাবে। পৌর পিতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যেই নতুন স্টেশন তৈরি করা হয়ে গেছে, পুরানোটাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে।

রেলিংয়ের দিকে পিছন ফিরল রানা, নিচের রু দে রেনেস থেকে বেরিয়ে আসা চলমান চওড়া, সুদীর্ঘ যানবাহনের সারিগুলোর দিকে তাকাল। প্লেস দ্যু এইটিন জুন, নাইনটিন-ফরটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। জানে, ইউনিয়ন কর্সের কাপু অভিষেকের নির্ধারিত দিনে শেষবারের মত এই জায়গাতে আসবেই। এক হপ্তা ধরে

যে ক'টা জায়গা দেখেছে ও, প্রত্যেকটি জায়গাতে আসার সম্ভাবনা আছে কাপুর. কিন্তু কোন কারণ দেখা দিলে শেষ মুহূর্তে ওসব জায়গায় সে নিজে না গিয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েও আনুষ্ঠানিকতা সারতে পারে। কিন্তু এই জায়গার কথা আলাদা। কাপুকে এখানে আসতেই হবে। প্রতি তিন বছর পর পর, তিনশো বছর ধরে, এই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে ইউনিয়ন কর্সের অভিষেক অনুষ্ঠান। নির্বাচিত কাপু এইখানে দাঁড়িয়ে শপথ নেবেন, সদস্যদের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে পদক দেবেন। আজ পর্যন্ত এই ব্যতিক্রম হতে দেখেনি কেউ। কাপু অসুস্থ হোক, তার জীবন বিপন্ন হোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিক—কিছুতেই কিছু এসে যাবে না—সে আসবেই।

রু দে রেনেস-এর পশ্চিম প্রান্তের শেষ বাড়িটার সবচেয়ে উপরের তলা থেকে স্টেশনের সম্মুখ চাতালের দূরত্ব একশো তিরিশ মিটার। এলাকার কোণে দাঁড়ানো দুটো বাড়ির যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে ওকে। উত্তর প্রান্তের প্রথম তিনটে বাড়ির উপরতলা থেকেও সম্মুখ চাতাল ফায়ারিং রেঞ্জের আওতায় পড়বে, কিন্তু ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল নাক বরাবর না হয়ে বেশ খানিকটা কোনাকুনি হয়ে যায়। ওগুলোর পিছনে যে ক'টা বাড়ি রয়েছে, প্রতিটি সম্মুখ চাতাল থেকে অতিরিক্ত দূরে, সুতরাং বাতিল। বুলেভার্ড দে মন্তপারনাস-এর মুখের প্রথম তিনটে বাড়ির ব্যাপারটাও তাই। রাস্তাটা পুব দিক থেকে এসে চৌরাস্তার মাঝখান দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। প্রথম বাড়ি তিনটের যে-কোন একটা বেছে নিতে পারা যায়, কিন্তু সরাসরি নয়, কোনাকুনিভাবে রাইফেল তাক করে গুলি করতে হবে। এগুলোর পিছনের প্রতিটি বাড়ি অনেক বেশি দূর। রু দে রেনেস-এর পশ্চিম প্রান্তের দুটো দালান ছাড়া সম্মুখ চাতালটার কাছাকাছি আরেকটা মাত্র বিল্ডিং রয়েছে, সেটা স্টেশন বিল্ডিং। উপরের অফিস কামরার জানালাগুলোয় দাঁড়িয়ে থাকবে সশস্ত্র কর্সিকান গার্ড, কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং, ওটাও বাদ।

পুব দিকের কোণে একটা কাফেতে গিয়ে বসল রানা। রু দি রেনেস-এর পশ্চিম প্রান্তের দালান তিনটে খুঁটিয়ে দেখে নিতে চাইছে ও। খোলা টেরেসে বসে আছে, কয়েক ফিট সামনে দিয়ে সগর্জনে তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে যানবাহনের দীর্ঘ মিছিল। কফির অর্ডার দিল ও। সিগারেট ধরাল। রাস্তার অপর দিকের বাড়িগুলো দেখছে। হকারের কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনল একটু পর। আবার কফির অর্ডার দিল। পড়ার ভান করে সামনে ধরে আছে কাগজটা, তাকিয়ে আছে রাস্তার ওপারে। তিন ঘণ্টা পর উঠল ও। শেষ প্রান্তের একটা রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ খাবার সময় পুব দিকের বাড়িগুলোর সম্মুখ ভাগ দেখে নিল। বিকেলটা এদিক থেকে ওদিকে হাঁটা-হাঁটি করে সম্ভাবনা হিসেবে যেগুলোকে বেছে নিয়েছে সেই দালানগুলোর সদর দরজার কাছ থেকে নিরীখ করে নিল। বুলেভার্ড দে মন্তপারনাস-এর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো বাড়িগুলোও কাছ থেকে দেখল ও। এগুলো সব অফিস বিল্ডিং, নতুন তৈরি, লোকজনের ব্যস্ততা খুব বেশি। নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিনই অবশ্য গোটা এলাকার প্রায় সব ক'টা বাড়ি, অফিস বিল্ডিং খালি করার নির্দেশ দেয়া হবে। বাড়ি আর অফিস বিল্ডিংগুলোর মালিক ধনী কর্সিকানরা। কোনটা জায়গা কিনে তৈরি করা, কোনটা সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া।

পরদিন আবার ফিরে এল রানা। দালানগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে এগিয়ে

গেল, রাস্তা পেরিয়ে পেভমেন্টের একটা বেঞ্চে গাছের ছায়ায় বসল। ঠোঁটে সিগারেট, হাতে খবরের কাগজ, চোখের দৃষ্টি বাড়িগুলোর উপরতলার সম্মুখভাগে। পাঁচ কি ছয়তলা পর্যন্ত পাথর দিয়ে মোড়া, মাথার উপর লম্বা প্রাচীরের মত প্যারাপেট, তার উপর থেকে অত্যন্ত খাড়া ভাবে ঢালু কালো টালির ছাদ উঠে গেছে, চিলেকোঠাটাকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে। প্রাচীরের গায়ে লম্বা লম্বা ফাটল দেখা যাচ্ছে, ওগুলো জানালা। এক কালে চাকরবাকরদের কোয়ার্টার ছিল এগুলো। আজকাল গরীব পেনশন ভোগীরা থাকে, বাকিগুলো বেসরকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছাদ এবং জানালার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে সেদিন, ভাবল রানা। ছাদে সশস্ত্র প্রহরী থাকাও বিচিত্র নয়। চিমনিগুলোর আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে থাকবে, বিনকিউলার দিয়ে নজর রাখবে উল্টো দিকের ছাদ আর জানালার দিকে। কিন্তু চিলেকোঠার নিচের ফ্লোরটা যথেষ্ট উঁচু, একজন লোক একটা কামরার অনেকটা ভিতরে অন্ধকারে বসে থাকলে উল্টোদিকের রাস্তা থেকে তাকে দেখতে পাবে না কেউ। একটু গরম পড়বে তখন, তাতে খোলা জানালা কারও মনে সন্দেহেরও উদ্রেক করবে না।

কিন্তু কামরার খুব বেশি ভিতর দিকে বসলে অ্যাঙ্গেল অভ ফায়ার অনেকটা আড়াআড়ি হয়ে যাবে, কেননা স্টেশনের সম্মুখ চাতালটা জানালার ঠিক সরাসরি উল্টো দিকে নয়, বেশ একটু এক-পাশ ঘেঁষে। তাই রু দি রেনেস-এর দু'দিকের রাস্তার তৃতীয় বাড়ি দুটোর আশা ছেড়ে দিল রানা। অনেক কোনাকুনিভাবে গুলি ছুড়তে হবে।

হাতে এখন থাকল চারটে বাড়ি, এগুলোর মধ্যে থেকেই যে-কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে গুলি করার সুযোগ পাবে বলে আশা করছে ও, সূর্য তখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লেও তখনও আকাশের বেশ উপরে থাকবে, অন্তত স্টেশনের ছাদের উপরে তো থাকবেই—তার মানে, পুব ধারের বাড়িগুলোর জানালা দিয়ে রোদ ঢুকবে তখনও। ভেবেচিন্তে পশ্চিম দিকের দুটো বাড়ির যে-কোন একটা বেছে নেবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর, বিকেল চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। লক্ষ করল, পশ্চিম দিকের উপরতলার জানালা গলে সরু এক আধ ফালি রোদ ঢুকছে, কিন্তু একই সময়ে পুব দিকের বাড়িগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ রোদে পুড়ছে।

পরদিন দরজা আগলে বসে থাকা বুড়ীটাকে চোখে পড়ল রানার। ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়া দেয়া দুটো ব্লকের সদর দরজার কাছ থেকে কয়েক ফিট দূরে একটা বেঞ্চে বসে আছে ও। ওর পিছনে পেভমেন্ট, অসংখ্য লোকজন যাওয়া-আসা করছে। পেভমেন্টের পরই বাড়িটার দরজা। দরজার বাইরে একটা টুলে বসে আছে ভীষণ মোটা বুড়ী। প্যারিসের বাড়িওয়ালারা দরজা পাহারা দেবার জন্যে পঙ্গু লোক এবং বৃদ্ধা মহিলাকেই পছন্দ করে, অন্যতম কারণ এদেরকে স্বল্প বেতন দিলেই চলে। বুড়ী এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে উল বুনছে।

একবার কাছের একটা কাফে থেকে একজন ওয়েটার এসে ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি দিয়ে গেল বুড়ীকে। দু'মিনিট গল্প করে গেল সে। বুড়ীর নাম মাদাম আর্থা, বিশ ফিট দূর থেকেও শুনতে পেল রানা।

বাড়ির ভিতর যারা ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে, সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক বুড়ীর। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে প্রায় সবাই জেনে নিচ্ছে বুড়ীর কুশল, বুড়ীও দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসছে, মাথা নাড়ছে, কুশলাদি জিজ্ঞেস করছে। বেলা দুটোর সময় কোত্থেকে এল কালো একটা বিড়াল। তাকে দেখেই একগাল হাসল মাদাম আর্থা। টুল থেকে নেমে দরজা পেরিয়ে সিঁড়ির নিচের জায়গাটায় মাথা নিচু করে ঢুকে গেল, সাথে সাথে বেরিয়ে এল হাতে এক বাটি দুধ নিয়ে। পেভমেন্টের উপর বাটিটা রাখতেই বিড়ালটা দুধ খেতে শুরু করল। তৃপ্তি ফুটে উঠল বুড়ীর দুই চোখে বিড়ালটার খাওয়া মন ভরে দেখছে।

চারটে বাজার একটু আগে উল বোনার সরঞ্জাম মস্ত ঘেরওয়ালা গাউনের সাইড পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল মাদাম আর্থা। ছোট ছোট পা ফেলে পেভমেন্টের উপর দিয়ে হেঁটে একটা কনফেকশনারীর দোকানে গিয়ে ঢুকল। ঘাড় ফিরিয়ে বুড়ীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল রানা। পেভমেন্টে ফেলে জুতো দিয়ে চেপে মারল সিগারেটটা, এই ফাঁকে দু'দিকটা দেখে নিল ভাল করে একবার। তারপর সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে। এলিভেটরে না চড়ে সিঁড়িটা বেছে নিল ও। নিঃশব্দ পায়ে উপরে উঠছে।

এলিভেটর শ্যাফটটাকে চক্কর মেরে উঠে গেছে সিঁড়িটা। প্রতিটি বাঁকে সিঁড়ির শেষ হয়ে গেছে ছোট্ট একটা হাফ ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে। প্রতি একতলা পর পর এই হাফ ল্যান্ডিংয়ের পিছনের দেয়ালে একটা করে দরজা, দরজার ওপারে স্টীলের ফায়ারএস্কেপ। পাঁচ এবং ছয়তলার মাঝখানে হাফ ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে পিছনের দরজাটা খুলে নিচের দিকে তাকাল রানা। ভিতরের একটা উঠানে গিয়ে নেমেছে ফায়ারএস্কেপের সিঁড়ি। উঠানটার চারদিকে অন্যান্য ব্লকের খিড়কী দরজা রয়েছে। যা কিছু দেখার দেখে নিয়ে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল রানা, জায়গা মত তুলে দিল সেফটি বারটা, তারপর হাফ ল্যান্ডিং থেকে কয়েকটা সিঁড়ি টপকে ছয়তলায় পৌঁছল। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে বেশ চওড়া একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, উঠে গেছে চিলেকোঠার দিকে। প্যাসেজের এক দিকে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে, এই ফ্ল্যাট দুটো থেকে ভিতরে উঠান দেখা যায়, অনুমান করল রানা। প্যাসেজের আরেক ধারে আরও দুটো দরজা, দরজার ভিতরের এই দুটো ফ্ল্যাট বাড়ির সম্মুখভাগের অংশ। দিক সম্পর্কে ওর অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে, ভাবছে রানা, সামনের এই দুটো ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে নিচে তাকালে রু দি রেনেস দেখা যাবে, খানিকটা পাশে দেখা যাবে চৌরাস্তা এবং তার পিছনে স্টেশনের সম্মুখ চাতাল। নিচে থেকে কদিন ধরে এই ফ্ল্যাট দুটোর জানালার উপরই নজর রাখছে সে।

দরজায় কান পেতে অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু দুটো ফ্ল্যাটের কোনটা থেকেই কোন শব্দ পেল না। তালা দুটো নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল। কাঠের ভিতর ঢোকানো, এবং দরজার কাঠও খুব মজবুত। কী-হোলে চোখ রেখে দেখল ও। চাবি ছাড়া খোলা অসম্ভব, দুটো তালাই ডাবল লকিং ধরনের। মাদাম আর্থার হাতে কালো ছোট্ট একটা পুরানো হাতব্যাগ দেখেছে ও, সেটায় প্রতিটা ফ্ল্যাটের একটা করে চাবি থাকার কথা, ভাবল ও।

কয়েক মুহূর্ত পর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল রানা। ব্লকে ঢুকেছে পাঁচ

মিনিটের বেশি হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে বুড়ী ফিরে এসেছে নিজের আস্তানায়। সিঁড়ির নিচে ছোট্ট একটা ঘর, দরজার ঝাপসা কাঁচ ভেদ করে ভিতরে চলে গেল ওর দৃষ্টি। চয়ারে বসে রুটিতে মাখন অথবা জেলি লেপছে বুড়ী, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল। নিঃশব্দ, দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজা টপকে বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

বাঁ দিকে মোড় নিয়ে রু দি রেনেসের দিকে এগোচ্ছে ও। অ্যাপার্টমেন্টের আরও দুটো ব্লক এবং একটা পোস্ট-অফিসের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে থামল কোণে, তারপর বাঁক নিয়ে সরু একটা রাস্তায় পড়ল। রাস্তাটার নাম রু লিটরে। পোস্ট-অফিসের পাঁচিল ঘেঁষে এগোচ্ছে এখনও সে। পাঁচিলের শেষ মাথায় মাথা-ঢাকা সরু একটা গলি। গলিমুখে দাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছে রানা। লাইটারের আগুন মুখের সামনে নাচানাচি করছে, এই ফাঁকে আড়চোখে গলির ভিতরটা দেখে নিচ্ছে ও। গলির গায়ে পোস্ট-অফিসের খিড়কী দরজাটা দেখা যাচ্ছে। শেষ মাথায় একটা রৌদ্র-করোজ্জ্বল উঠান। এক প্রান্তে ফায়ারএস্কেপের শেষ ধাপ ক'টার ছায়া দেখা যাচ্ছে। কষে লম্বা একটা টান মারল সিগারেটে রানা, তারপর সামনে এগোল। গুলি করে কোন্ পথে পালাবে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে ও।

রু লিটরের শেষ মাথায় পৌঁছে আবার বাঁ দিকে মোড় নিল রানা, রু দি ভ্যাগিরাদ ধরে ফিরে এল রাস্তাটা যেখানে বুলেভার্ড দে মন্তপারনাসের সাথে মিলিত হয়েছে। মোড়ের একধারে দাঁড়িয়ে মেইন রোডের এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ট্যাক্সির জন্যে, এমন সময় একজন পুলিস মোটরসাইক্লিস্ট তীরবেগে ছুটে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে থামল রোড জাংশনে, লাফ দিয়ে নেমে স্ট্যান্ডের উপড় দাঁড় করাল মোটল সাইকেলটাকে, তারপর দু'হাত নেড়ে এবং তীক্ষ্ণ হুইসেল বাজিয়ে সমস্ত যানবাহনকে দাঁড়িয়ে পড়ার সিগন্যাল দিতে শুরু করল। রু দি ভ্যাগিরাদ থেকে বিশাল স্রোতের মত এগিয়ে আসছিল অসংখ্য যানবাহন। মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ল সবগুলো। স্টেশনের দিক থেকে বুলেভার্ডের দিকে ছুটে আসছিল আরেকটা যানবাহনের স্রোত, সেটাও স্থির হয়ে গেল। ডিউরক এর দিক থেকে যানবাহনের আরেকটা মিছিল বুলেভার্ডের দিকে আসছে, পুলিস সার্জেন্ট সেটাকে থামার নির্দেশ না দিয়ে হাত নেড়ে রাস্তার ডান দিকে সরে যাবার সিগন্যাল দিচ্ছে। মোটরসাইকেল থেকে তার নামার পর পনেরো সেকেন্ডও পেরোয়নি, এমন সময় ডিউরকের দিক থেকে ভেসে এল সাইরেনের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে আওয়াজটা। কোণে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বুলেভার্ড দে মন্তপারনাসের দীর্ঘ রাস্তাটার দিকে তাকাল রানা। রাস্তার দু'পাশে দু'লাইনে সার বেঁধে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য যানবাহন, মাঝখানটা ফাঁকা। মাত্র ত্রিশ হাত দূরে হঠাৎ একটা মেয়ের উপর চোখ পড়ল রানার। নির্জন পেভমেন্টে একা দাঁড়িয়ে আছে, রানার দিকে পিছন ফিরে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা অত্যন্ত পরিচিত লাগছে। মেয়েটাকে চেনে নাকি সে? বেশ লম্বা মেয়েটা, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত কিন্তু সুগঠিত নিতম্ব, ঝিলিক দিয়ে উঠল স্মৃতিভাণ্ডারে একটা কণা—চিনতে পারছে রানা মেয়েটাকে। সিলভিও পিয়েত্রোর বোন ও, লুইসা পিয়েত্রো। সিলভিওর গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল ভেনিসে, কোসানোস্ট্রার পক্ষে কাজ করত। ভাই-অন্ত-প্রাণ এই লুইসা পিয়েত্রো, কিন্তু ভেনিসে রানাকে দেখে হৃদয়টা মচকে যাওয়ায় সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে একবার, তাতে সিলভিও এবং

কোসানোস্ট্রাকে বোকা বানাতে বেশ একটু সুবিধে হয়েছিল রানার। এক সেকেন্ডে আরও অনেক কথা মনে পড়ে গেল। দ্রুত এগোল রানা লুইসা পিয়েত্রোর দিকে। দামী মিনি স্কার্ট আর হাফ হাতা ব্লাউজ পরে আছে, হাত দুটো বুকের কাছে আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করা। দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্য এক দৃঢ়, প্রায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। পাঁচশো গজ আরও সামনে, বাঁক নিয়ে ডিউরকের জাংশনে তীব্রবেগে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক মোটরসাইকেল, সেগুলোর ঠিক পিছনেই হুড তোলা কয়েকটা প্রাইভেট কার। মোটরসাইক্লিস্টের মাথায় হলুদ হেলমেট, পরনে বুক খোলা শার্ট, শার্টের ভিতরে দেখা যাচ্ছে শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা রিভলভার। হুড তোলা প্রতিটি গাড়িতে সামনে দু'জন পিছনে দু'জন আরোহী, প্রত্যেকের কঠোর চেহারা, রাস্তার দু'দিকে তীক্ষ্ণ নজর। হাতগুলো উরুর মাঝখানে পড়ে আছে, প্রয়োজন হলেই কারবাইন তুলে নেবে। প্রাইভেট কারের পিছনে পাশাপাশি এই লাইনে তিনটে গাড়ি, দু'পাশে দুটো হুড তোলা বুইক, মাঝখানে একটা রোলসরয়েস। রোলসরয়েসের পিছনে আরেক ঝাঁক হুড তোলা গাড়ির পাহারা। সেগুলোর পিছনে আবার দশজন মোটরসাইক্লিস্ট। গোটা দলটা সমান গতিতে ছুটে আসছে রাস্তা ধরে রানার দিকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। যা ভেবেছিল তা নয়, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তাঁ আসছেন না। আসছে ইউনিয়ন কর্সের কাপু দোর্দণ্ডপ্রতাপ উ সেন।

রোলসরয়েসটা কাছে চলে এসেছে। বুলেট প্রূফ জানালার কাঁচ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল রানার দৃষ্টি। এক সেকেন্ডের জন্যে উ সেনের মুখটা দেখতে পেল রানা। চোখে গাঢ় রঙের সানগ্লাস। স্যাঁত করে সামনে থেকে বেরিয়ে গেল রোলসরয়েস। 'এরপর টেলিস্কোপ দিয়ে খুব কাছে এনে মুখটা দেখব তোমার, এবং...' চিন্তায় বাধা পড়ল রানার। লুইসা মাত্র পাঁচ গজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রানাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে তার দৃষ্টি, এখনও অনুসরণ করছে রোলসরয়েসটাকে। লুইসার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তীব্র ঘৃণায়।

চোখাচোখি হলো এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্যে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল লুইসা পিয়েত্রো, পরমুহূর্তে ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আবার। এগিয়ে এল দ্রুত। ক্রোধের জায়গায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে চেহারায়। 'মাই গড! রানা? তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বলল রানা। একটা হাত ধরল লুইসার। 'তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। মনের অবস্থাও দু'জনের একই রকম।' একটু বিরতি নিল রানা, লক্ষ করল ভুরু কুঁচকে উঠছে লুইসার। তারপর বলল, 'প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছ, তাই না?'

'মানে?' হাত ছাড়িয়ে নিল লুইসা, এক পা পিছিয়ে গেল। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি...'

'আমি সব জানি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'এখানে নয়, চলো কোথাও গিয়ে বসি।'

'কি সব জানো তুমি? কি যা তা বলছ?'

'তোমার ভাই ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ ছিল না তোমার। সেই ভাইটি আজ

নেই। খবরটাই শুধু পেয়েছি আমি, লুইসা। আর কিছু জানি না। উ সেনের সাথে লাগতে গেল কেন সিলভিও?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল লুইসা। চোখে পানি এসে গেছে। 'তুমি যাও,' চাপা গলায় বলল সে। 'তুমিও তো শত্রু। তুমি যাও, রানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, শত্রুতা ছিল। কিন্তু সিলভিওর সাথে, তোমার সাথে নয়। ঠিক আছে, আমাকে বিশ্বাস করতে যদি ভয় পাও, চলে যাচ্ছি। তুমিও ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করো, ব্যবস্থা করছি আমি। অল্পদিনের মধ্যেই সুখবর পাবে।' কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না রানা, ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটা ধরল।

'শোনো।'

দাঁড়াল রানা। এগিয়ে এল লুইসা। 'কিসের সুখবরের জন্য অপেক্ষা করব তা তো বললে না?'

'তোমার জন্যে একটা খবরই সুখবর হতে পারে, সেটা কি তা আমি জানি,' বলল রানা, 'ভেঙে-চুরে বলার দরকার আছে কি?'

'তার মানে তুমিও…তুমিও…?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমিও।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

'পারো।'

রানার হাত ধরল লুইসা। 'কোথাও নিয়ে চলো আমাকে, বসব।'

কাছাকাছি একটা কাফেতে ঢুকল ওরা, বসল কোণের এক টেবিলে। কফির অর্ডার দিল রানা। পাশে বসে আছে লুইসা। নিচু গলায় কথা বলছে।

সিলভিওর সাথে উ সেনের ব্যক্তিগত কোন বিরোধ ছিল না। কোসানোস্ট্রার ড্রাগ বিজনেস ধ্বংস করে দিয়ে বাজারটা দখল করতে চেয়েছিল উ সেন। স্রেফ এই উদ্দেশ্যে সিলভিওকে খুন করেছে সে। ব্যাপারটা ঘটার আগে কিছুই জানা যায়নি। ঘটার পরও হত্যাকাণ্ডের রহস্য মীমাংসা করতে পারেনি কোসানোস্ট্রা। প্রায় তিন মাস চেষ্টা করে ব্যক্তিগতভাবে এটুকু জানতে পেরেছে লুইসা। কিভাবে?

রানার প্রশ্ন শুনে এদিক ওদিক মাথা দোলাল লুইসা। 'অনেক বলে ফেলেছি। এবার তোমার কথা শুনব। উ সেনের ওপর তোমার কিসের রাগ? কি করতে চাইছ তুমি?'

কফি দিয়ে চলে গেল ওয়েটার।

'দুঃখিত, লুইসা,' সিগারেট ধরিয়ে বলল। 'রাগের কারণটা বলতে পারি, কিন্তু কি করতে যাচ্ছি তা বলতে পারি না। তোমাকে বিশ্বাস করি না, তা নয়। আমি কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না।'

মুখটা কালো হয়ে গেল লুইসার। 'সব কথা শুনলে আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'সাহায্য করার অবস্থায় আছ নাকি?'

'আছি,' চাপা, কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল লুইসা পিয়েত্রো।

'কাজের মেয়ে,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'সাহায্য করতে চাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কোন সাহায্য আমার দরকার হবে না। আমি একাই পারব।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' স্পষ্ট জানিয়ে দিল মেয়েটা। 'উ সেনকে তুমি আন্ডারএস্টিমেট করছ। ওর ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। তোমার মত এক হাজার মাসুদ রানাকে জুতার তলায় পিষে মারতে এক ঘন্টার বেশি লাগবে না ওর। তুমি...'

আঁতকে উঠল রানা। 'থাক, থাক। রীতিমত ভয় লাগছে, আর শুনতে চাই না।' কথা শেষ করেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল নিজের রসিকতায়।

ভুরু কুঁচকে রানাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে লুইসা। একটু সঙ্কোচের সাথে বলল। 'না, উ সেন সম্পর্কে তোমার কোন ভুল ধারণা থাকতে পারে না, আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু...'

'বাড়ি গিয়ে নাক ডেকে ঘুমাও,' বলল রানা। 'এর বেশি তোমাকে কিছু বলার নেই আমার, মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে অচিরেই। এসো, উঠি এবার।'

'এক মিনিট,' দ্রুত বলল লুইসা। 'ঠিক আছে, কিভাবে কি করতে যাচ্ছ শুনতে চাইব না। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। কিভাবে, তা খানিকটা শুনলেই বুঝতে পারবে তুমি।'

'বেশ। শুনতে আপত্তি নেই।'

'ফ্রেঞ্চ সুরেতের কর্নেল প্যাপেনের নাম শুনেছ?'

'সুরেতের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল,' ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছে রানার। 'মেয়েদের ব্যাপারে দুর্বল বলে বদনাম আছে।'

'ঠিক ধরেছ। ওকে গেঁথেছি আমি। হাবুডুবু খাচ্ছে আমার প্রেমে। এবার বুঝেছ?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'উঁহুঁ, তেমন কোন সাহায্য তুমি করতে পারবে না। তবু, ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেব তোমাকে। টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে তোমার সাথে?'

'যাবে,' বলল লুইসা।

'নাম্বারটা দাও আমাকে। আমি লন্ডন থেকে যোগাযোগ করব তোমার সাথে। কথাবার্তা হবে না, শুধু একটা টেলিফোন নাম্বার দেব তোমাকে। কোথাও টুকে রেখো না, মনে রেখো শুধু। ফ্রেঞ্চ পুলিসের গতিবিধি যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, এবং সে সম্পর্কে জরুরী কোন তথ্য যদি জানতে পারো, শুধু তখনই ওই নাম্বারে ডায়াল করে জানাবে। অপর প্রান্তে কেউ রিসিভার তুলবে না, সুতরাং কোন প্রশ্ন কোরো না, উত্তর পাবে না। স্রেফ তোমার যা বলার বলে রিসিভার নামিয়ে রাখবে। বুঝেছ?'

'পানির মত,' বলল লুইসা। 'ভাল কথা, জানো তো ফ্রেঞ্চ পুলিস, সিক্রেট সার্ভিস, অ্যাকশন সার্ভিস—সবগুলোতে কর্সিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উ সেন চাইলে সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে তোমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে।'

উঠে দাঁড়াল রানা, 'মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ, লুইসা। কাউন্টারে বিল মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি। তুমি একটু পর বেরিয়ে যেয়ো। আবার দেখা হবে।' বলে আর দাঁড়াল না রানা।

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকল লুইসা

পিয়েত্রো। দু'জনকে এক সাথে কেউ দেখুক, রানা তা চাইছে না, বুঝতে পেরেছে সে। বিল মিটিয়ে দিয়ে একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত কাফে থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

আচ্ছন্নের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল লুইসা। হঠাৎ দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেল সে, রানা যা করতে চাইছে তা আত্মহত্যারই নামান্তর। চেয়ার ছেড়ে ত্রস্ত পদে কাফের দরজার দিকে এগোল সে। এ স্রেফ পাগলামি! এখনও সময় আছে, ফিরিয়ে আনা যায় রানাকে।

কাফে থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক অস্থিরভাবে তাকাচ্ছে লুইসা। নেই রানা! এরই মধ্যে জনারণ্যে মিশে গেছে সে। লুইসার ইচ্ছা হলো রানার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে। তারপরই মনে হলো, ডেকেও লাভ নেই, শুনতে পেলেও সাড়া দেবে না রানা, ফিরে সে আসবে না।

চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল লুইসার। ভাই গেছে, একই পথে রওনা হয়ে গেছে আরেক লোক। বড় অদ্ভুত ছিল লোকটা, যাকে দেখে সেই যে হৃদয় মচকে ছিল, সে-আঘাত আজও সারেনি, কোনদিন সারবে না। যার জন্যে তার অন্তরের অন্তস্তলে চিরকাল বিরাজ করবে অদ্ভুত এক দুর্বলতা।

সাত

মাসের শেষ দিনটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটল রানার। সারাটা সকাল ফ্রিয়া মার্কেটের এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঢুঁ মেরে বেড়াল, কাঁধে ঝুলছে সস্তা দামের একটা নোংরা হোল্ড-অল। তেল চিটচিটে একটা বেরেট (গোলাকার কার্নিসহীন টুপি, গোটা মাথায় চেপে বসে থাকে), গোড়ালি ঢাকা এক জোড়া তালি মারা জুতো, রেলিং ব্রাদার্স থেকে ঢলঢলে একটা ট্রাউজার, এবং বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে একটা মিলিটারি গ্রেটকোট কিনল পানির দামে। খুব ভারী হয়ে গেল গ্রেটকোটটা, কিন্তু এর চেয়ে হালকা কোথাও পাওয়া গেল না। তবে যথেষ্ট লম্বা, ওর হাঁটু থেকে চার ইঞ্চি নিচে পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যাবে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

প্যারিসের রেলিং ব্রাদার্সে পাওয়া যায় না এমন কিছু নাকি নেই, তার প্রমাণ পেল রানা হাতেনাতে। একটু খুঁজতেই দেখতে পেল প্রকাণ্ড শো-কেস ভর্তি পুরানো, দাগী মেডেলের সমারোহ। একধারে জড় করা পুরো একটা কালেকশান কিনল ও। সাথে বুকলেটও রয়েছে, তাতে ঝাপসা হয়ে যাওয়া মেডেলের ছবির নিচে পরিচিতি লেখা, পাঠককে জানাচ্ছে ফ্রেঞ্চ মিলিটারিতে কি ধরনের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বা কোন্ আচরণের জন্যে কোন্ মেডেল উপহার পাওয়া যায়। রু রয়্যালের কুইনিজ রেস্তোরাঁয় হালকা লাঞ্চ খেল রানা। তারপর হোটেলে ফিরে বিল মেটাল, ব্যাগ-ব্যাগেজ গুছিয়ে নিল। দামী দুটো সুটকেসের একটার নিচে ভরল আজকের কেনা সব জিনিস। বুকলেট দেখে কয়েকটা মেডেল বেছে নিল ও। শত্রু সেনাদের সাথে লড়ার সময় অসম সাহস দেখাবার কৃতিত্বস্বরূপ এই মেডেলগুলো

পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রি ফ্রেঞ্চ কোর্সে নাম লিখিয়ে লড়েছিল যারা তাদেরকে দেয়া হয়েছে মেডেল দে লা লিবারেশন, সাথে পাঁচটা চ্যাম্পিয়ন মেডেল—এই মোট ছয়টা মেডেলও বেছে রাখল ও। তারপর তিউনিসিয়ায় এবং লিবিয়ায় কৃতিত্ব দেখাবার স্বীকৃতি হিসেবে নিজেকে দুটো বীর হাকিম পদক দিল।

বাকি সব মেডেল, এবং বুকলেটটা আলাদা আলাদা ভাবে দুই রাস্তার দুই ডাস্টবিনে ফেলে দিল ও। ফিরে আসতেই হোটেলের ডেস্ক ক্লার্ক জানাল ইত্তেয়েলি দু নর্দ এক্সপ্রেস ব্রাসেলসের উদ্দেশে গার দু নর্দ থেকে ছাড়বে পাঁচটা পনেরোয়।

ঠিক পাঁচ মিনিট আগে স্টেশনে পৌঁছল রানা। ট্রেনে উঠে ভরপেট ডিনার খেল। সেপ্টেম্বরের শেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেল ব্রাসেলসে।

রোম। রানা এজেন্সী। ডাক পিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেল ম্যাটাপ্যানকে। এয়ার ফ্রান্সের মনোগ্রাম ছাপা এনভেলাপের উপর বন্ধু ভিক্টর কাউলাস্কির হাতে লেখা ঠিকানা দেখে শরীরে একটা আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল তার, প্রকাণ্ড ক্লিনশেভ মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে। বেশ অনেকদিন হলো চিঠিপত্র দেয়নি ভিক্টর। মেয়েটার খবর পাবার জন্যে মনে মনে ছটফট করছিল সে।

সময় হয়ে গেছে। মোনিকা এক্ষুণি উপর থেকে অফিসে নামবে। তাড়াতাড়ি কোটের ব্রেস্ট পকেটে এনভেলাপটা চালান করে দিল ম্যাটাপ্যান। সে একটা মেয়ের বাপ, এ খবর জানা নেই মোনিকার। ফ্রেঞ্চ বন্ধু ভিক্টর কাউলাস্কি এবং তার স্ত্রী ছাড়া এ তথ্য আর কেউ জানে না। তার জীবনে এটাই একমাত্র গোপন ব্যাপার। চিরকাল গোপনই রাখতে চায় সে।

জীবনে একটি মাত্র মেয়েকে ভাল লেগেছিল ম্যাটাপ্যানের। সে হলো ভ্যালেন্টিনার মা। ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে তার সাথে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। ঘনিষ্ঠতার ফল হিসেবে তার গর্ভে এল ভ্যালেন্টিনা। ম্যাটাপ্যান খবরটা শুনে এক মুহূর্ত দেরি করেনি, সাথে সাথে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি ভ্যালেন্টিনার মা। ফ্রান্স ছেড়ে ইটালীতে আসতে চায় না, এটাই ছিল তার আপত্তির কারণ। অনেক চেষ্টা করেছিল ম্যাটাপ্যান, কিন্তু মেয়েটা তার কোন কথাই শুনতে চায়নি। অগত্যা গর্ভের সন্তানটিকে রক্ষার জন্যে বন্ধু ভিক্টরের পরামর্শ চায় সে। বন্ধু বিবাহিত, কিন্তু ওদের কোন সন্তান নেই। কখনও হবেও না। সাগ্রহে তারা ম্যাটাপ্যানের সন্তানকে পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায়।

ভ্যালেন্টিনা এখন ছয় বছরের মেয়ে। স্কুলে পড়াশোনা করে। ভিক্টর এবং তার স্ত্রীকেই সে নিজের মা-বাপ হিসেবে জানে।

সেদিন লাঞ্চ আওয়ারে চিঠিটা পড়ার সুযোগ পেল ম্যাটাপ্যান। অফিসের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এনভেলাপটা খুলল সে। চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি, দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল ম্যাটাপ্যানের। এর আগের চিঠিতে ভিক্টরকে সে অনুরোধ করেছিল ভ্যালেন্টিনার কথা সে যেন বেশি করে লেখে।

চিঠিটা পড়তে শুরু করেই আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ম্যাটাপ্যানের বিশাল বুকটা। ভিক্টর লিখেছে:

'ভ্যালেন্টিনা সাংঘাতিক অসুস্থ। ওর লিউকোমিয়া হয়েছে। চিন্তা কোরো না। চিকিৎসা চলছে।'

লিউকোমিয়া মানে ব্লাড ক্যান্সার। চিঠি ধরা হাতটা কাঁপছে ম্যাটাপ্যানের। তবে কি ভ্যালেন্টিনা বাঁচবে না?

কয়েক মুহূর্ত নিষ্প্রাণ পাথরের মত চেয়ারে বসে রইল ম্যাটাপ্যান। কি করবে, ঠিক করতে পারছে না। এই মুহূর্তে তার ফ্রান্সে যাওয়া অসম্ভব। কোন্ অজুহাতে যাবে সে? কি কারণ দেখাবে মোনিকাকে?

হঠাৎ মনে পড়ল গতবার সে যখন প্যারিসে ভিক্টরদের বাড়িতে গিয়েছিল তখন ভিক্টরের স্ত্রী কথায় কথায় তাকে জানিয়েছিল, তারা বাড়িতে টেলিফোন নেবার চেষ্টা করছে। তারপর দু'বছর কেটে গেছে। এ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই টেলিফোন পেয়ে গেছে ওরা।

কিন্তু টেলিফোন থাকলেই বা কি, নাম্বার জানা না থাকলে যোগাযোগ করবে কিভাবে? তবু, একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। আজ অনেক কাজ, বাইরে বেরোবার কোন উপায়ই নেই। আগামীকাল কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে রোমের মেন পোস্ট অফিসে গিয়ে চেষ্টা করে দেখবে সে কোন উপায় করা যায় কিনা। চোখের সামনে ভ্যালেন্টিনার কচি মুখটা ভেসে উঠতেই বিশালদেহী গরিলা ম্যাটাপ্যান শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

ইটালীতে ম্যাটাপ্যান যখন ডাকপিয়নের হাত থেকে চিঠি নিচ্ছে, রানা তখন ব্রাসেলসের অ্যামিগো হোটেল ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে অস্ত্র ব্যবসায়ী ম্যানিকিন পীসের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। ঘণ্টা দুই আগে ব্রেকফাস্টে বসে মি. অরগ্যান হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে রানা। এগারোটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পীস একা অপেক্ষা করবে তার অফিসে ওর জন্যে।

রাস্তার মোড়ে সাড়ে দশটায় পৌঁছল রানা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে রাস্তার শেষ মাথায় ছোট্ট একটা পার্কে ঢুকল। কাঠের বেঞ্চিতে বসে সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরেছে। পড়ছে না, পার্কের নিচু পাঁচিলের উপর দিয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেছে রাস্তা পেরিয়ে একটা অফিসের দরজার দিকে। বৃদ্ধ পীসের অফিস ওটা। কেউ ওখানে আসা যাওয়া করছে কিনা দেখে নিচ্ছে সতর্ক দৃষ্টিতে।

আধ ঘণ্টা পর পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল রানা। দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল। প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে দিল বৃদ্ধ। মুখে হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা করল রানাকে। বৃদ্ধের পাশ ঘেঁষে ভিতরে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ করে চেন লাগিয়ে দিল পীস।

একই সাথে দু'জন ঘুরে দাঁড়াল দু'জনের দিকে।

বেলজিয়ান লোকটাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করল রানা, 'কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ···মানে, রাইফেলটাকে নিয়ে নয়, ওটা তৈরি করে ফেলেছি—কিন্তু দু'নম্বর জিনিসটাকে নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। বলছি, তার আগে রাইফেলটা দেখুন, মশিয়ে।'

ডেস্কের উপর পড়ে আছে সমতল একটা চৌকোনা কেস। দু'ফিট লম্বা, আঠারো ইঞ্চির মত চওড়া, চার ইঞ্চি উঁচু। কেসটা খুলল পীস। সেটার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল রানা।

কেসের ভিতরটা সমতল একটা ট্রে-র মত, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাপ নিয়ে কয়েকটা ছোট বড় ঘর তৈরি করে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরে রাইফেলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো খাপে খাপে বসে আছে।

'অরিজিন্যাল কেস নয় এটা, বুঝতেই পারছেন, মশিয়ে,' বলল বৃদ্ধ। 'সেটা আরও অনেক লম্বা। আমি নিজে কেসটা তৈরি করেছি। নিখুঁতভাবে সব ফিট হয়ে গেছে।'

কেসের কোথাও চুল পরিমাণ জায়গা পড়ে নেই, সবটুকু কাজে লাগানো হয়েছে। খোলা ট্রেটার উপর দিকের ঘরে রয়েছে ব্যারেল এবং ব্রীচ—আঠারো ইঞ্চির মধ্যেই চমৎকার জায়গা করে নিয়েছে। খোপ থেকে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রানা। খুবই হালকা জিনিস, দেখতে অনেকটা সাব-মেশিনগানের ব্যারেলের মত। ব্রীচে একটা সরু বোল্ট রয়েছে, বন্ধ করা। শেষ মাথাটা পিছন দিকে গিয়ে একটা গাঁটওয়ালা হাতলের আকৃতি নিয়েছে, জিনিসটা ব্রীচের চেয়ে বড় নয়। বোল্টের বাকি অংশ ব্রীচের মধ্যেই ফিট করা হয়েছে।

বোল্টের শেষ মাথার গাঁটটা ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ধরল রানা, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার উল্টো দিকে দ্রুত ঘোরাল। তালামুক্ত হয়ে একটা ডিগবাজি খেল বোল্টটা, খাঁজ কেটে তৈরি করা খোপে ঢুকে পড়ল। বোল্টটা সরে যাওয়ায় ঝকমকে ট্রে-র তলাটা দেখা যাচ্ছে এখন, ওখানে নিরীহ ভাল মানুষের মত শুয়ে থাকবে বুলেট। ব্যারেলের শেষ মাথায় অন্ধকার গর্তটাও দেখতে পাচ্ছে রানা। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, সেদিকে ঘোরাতেই নিজের জায়গায় ফিরে এল বোল্টটা।

বোল্টের শেষ মাথার ঠিক নিচেই ইস্পাতের একটা অতিরিক্ত গোল চাকতি নিপুণভাবে ওয়েল্ডিংয়ের সাহায্যে মেকানিজমের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ডিস্ক বা চাকতিটা আধ ইঞ্চি মোটা, কিন্তু বিস্তার পুরো এক ইঞ্চিও নয়। উপরের অংশে অর্ধচন্দ্রের আকারে খাঁজ কাটা রয়েছে, যাতে বোল্টটা পিছু হঠার জন্যে মুক্ত জায়গা পেতে পারে। চাকতির শেষ মাথার মাঝখানে আধ ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, সেটার ভিতরে স্ক্রু ঢোকাবার জন্যে খাঁজ কাটা হয়েছে।

'ওটা রাইফেলের কুঁদোর জন্যে,' মৃদু গলায় বলল পীস।

লক্ষ করল রানা, অরিজিন্যাল রাইফেলের কাঠের কুঁদো যেখান থেকে তুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সেখানে কোন দাগ-টাগ কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাইফেলের গায়ে কুঁদোটা আটকাবার জন্যে স্ক্রু ঢোকাবার যে দুটো গর্ত ছিল সেগুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাইফেলটাকে উল্টে নিচের দিকটা দেখছে রানা। ব্রীচের নিচে সরু এক ফালি ছিদ্র, সেটার ভিতর দেখা যাচ্ছে বোল্টের নিচের অংশটা। বোল্টের এই অংশেই রয়েছে ফায়ারিঙ পিন, যেটা বুলেটে আঘাত করবে। ফাঁকটা দিয়ে ট্রিগারের গোড়া বেরিয়ে আছে।

পুরানো ট্রিগারের গোড়ায় ক্ষুদ্র একটা ইস্পাতের নব ঝালাই করে জুড়ে দেয়া

হয়েছে, এতেও প্যাঁচ খাওয়ানো গর্ত দেখা যাচ্ছে একটা। নিঃশব্দে ছোট স্টীলের একটা টুকরো রানার হাতে তুলে দিল বৃদ্ধ। জিনিসটা এক ইঞ্চি লম্বা, বাঁকানো, এবং এক দিকের প্রান্তে প্যাঁচ কাটা। গর্তে প্যাঁচ কাটা প্রান্তটা ঢুকিয়ে দিল রানা। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে প্যাঁচ কষতে শুরু করল যতক্ষণ না টাইট হয়। এটাই নতুন ট্রিগার, বেরিয়ে আছে ব্রীচের নিচে।

ট্রে থেকে সরু একটা স্টীল রড তুলে রানার হাতে দিল বৃদ্ধ। রডের একটা প্রান্ত প্যাঁচ খাওয়ানো। 'স্টক অ্যাসেম্বলীর প্রথম অংশ,' বলল সে।

ব্রীচের শেষ প্রান্তের গর্ত-মুখে রডের প্যাঁচ খাওয়ানো প্রান্তটা বসিয়ে ঘোরাতে শুরু করল রানা। একটু একটু করে খানিকটা ঢুকে গেল রড। এখন দেখে মনে হচ্ছে পিছন থেকে রাইফেলের একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বেরিয়ে এসেছে রডটা। নিচের দিকে ত্রিশ ডিগ্রী ঝুঁকে আছে সেটা। ব্রীচের গর্তে ঢুকে যাওয়া অংশ থেকে দু'ইঞ্চি বাদ দিয়ে রাইফেলের মেকানিজমের কাছাকাছি পর্যন্ত স্টীল রডটা সামান্য একটু চ্যাপ্টা, সমতল জায়গাটার মাঝখানে ড্রিল করে একটা গর্ত তৈরি করা হয়েছে। গর্তটা এখন সরাসরি পিছন দিকে মুখ করে আছে। বৃদ্ধ যাদুকর এবার দ্বিতীয় রডটা তুলে দিল রানার হাতে। অপেক্ষাকৃত ছোট এটা।

'ওপরের অবলম্বন,' বলল সে।

এটাও জায়গা মত নিখুঁত ফিট হলো। দুটো রডই পিছন দিকে বেরিয়ে আছে, ছোট একটা ভিতহীন ত্রিকোণের দুটো দিকের মত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে আছে। বৃদ্ধ ভিতটা তুলে দিল রানার হাতে। জিনিসটা বাঁকানো, পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি লম্বা, কালো চামড়া দিয়ে পুরু করে মোড়া। শোল্ডার গার্ড বা রাইফেলের বাঁটের প্রতিটি প্রান্তে একটা করে ছোট গর্ত।

'প্যাঁচ কষার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি, তার দরকারও নেই,' বলল বৃদ্ধ। 'মশিয়ে, শুধু রড দুটোর দুই প্রান্ত দুই গর্তে ঢুকিয়ে একটু চাপ দিন।'

তাই করল রানা। এখন রাইফেলটাকে রাইফেলের মতই দেখাচ্ছে। বাঁট-প্লেটটা কাঁধে তুলে নিল ও, বাঁ হাতে শক্ত করে ধরল ব্যারেলের নিচের দিকটা, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে পেঁচাল ট্রিগারটাকে, বন্ধ করল বাঁ চোখ এবং ডান চোখ কুঁচকে ব্যারেল বরাবর সামনে তাকাল। দূরের দেয়ালে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টানল ও। মৃদু ক্লিক ভেসে এল ব্রীচের ভিতর থেকে।

বেলজিয়ানের দিকে ফিরল রানা। দশ ইঞ্চি লম্বা দুটো কালো টিউবের মত বস্তু দুই হাতে ধরে আছে বৃদ্ধ।

'সাইলেন্সারটা দিন,' বলল রানা। পীসের হাত থেকে সেটা তুলে নিল ও। তারপর রাইফেল ব্যারেলের শেষ প্রান্তটা পরখ করল। নিপুণভাবে প্যাঁচ কাটা হয়েছে মুখের ভেতর। সাইলেন্সারের অপেক্ষাকৃত চওড়া দিকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা যতক্ষণ না পুরোপুরি টাইট হয়। তারপর প্যাঁচ কষল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। ব্যারেলের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আছে এখন সাইলেন্সারটা। বৃদ্ধের সামনে হাত পাতল রানা। যাদুকর ওর হাতে এবার তুলে দিল টেলিস্কোপিক সাইটটা।

ব্যারেলের উপর দিকের গায়ে এক ইঞ্চি পর পর একজোড়া করে গর্ত রয়েছে, টেলিস্কোপের নিচের দিকের ক্লিপগুলো নিখুঁত ভাবে সেগুলোর ভিতর ঢুকে আটকে

গেল। টেলিস্কোপ এবং ব্যারেল এখন নিখুঁত সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করছে। আবার রাইফেলটা উপরে তুলে চোখ কুঁচকে লক্ষ্যস্থির করল রানা। দশ মিনিট আগের কয়েকটা বিচ্ছিন্ন অদ্ভুতদর্শন যান্ত্রিক অংশকে এখন আর বিদঘুটে লাগছে না। জোড়া লাগাবার পর এটা একটা হাই ভেলোসিটি, লং রেঞ্জ, ফুললি-সাইলেন্সড আততায়ীর রাইফেলে পরিণত হয়েছে। টেবিলে সেটাকে নামিয়ে রাখল রানা। মুখ তুলে তাকাল পীসের দিকে।

'গুড,' বলল রানা। 'ভেরি গুড। আই কংগ্রাচুলেট ইউ। কাজের চমৎকার একটা নমুনা দেখিয়েছেন আপনি। ধন্যবাদ।'

তৃপ্তির হাসি হাসল বৃদ্ধ।

'এখনও দুটো কাজ বাকি রয়েছে,' বলল রানা। 'সাইট জিরোয়িং আর প্র্যাকটিস শট ফায়ার করা। কিছু শেল দিতে পারেন আমাকে?'

ডেস্কের দেরাজ খুলে একশো বুলেটের একটা বাক্স বের করল পীস। প্যাকেটের সীলটা ভাঙা, তা থেকে ছয়টা বুলেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

'এগুলো প্র্যাকটিসের জন্যে রেখেছি,' বলল বৃদ্ধ। 'মাত্র ছয়টা নিয়েছি এ-থেকে মাথায় এক্সপ্লোসিভ ভরার জন্যে।'

হাতে একমুঠো শেল ঢেলে পরখ করছে রানা। প্রথম দর্শনে বুলেটগুলোকে সাংঘাতিক ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, ভাবাই যায় না এত ছোট একটা বুলেটের পক্ষে কিভাবে ধ্বংসাত্মক কাজটা করা সম্ভব। কিন্তু এক সেকেন্ড পরই লক্ষ করল রানা, এ ক্যালিবারের এটা একটা এক্সট্রা-লং টাইপের শেল। অতিরিক্ত এক্সপ্লোসিভ চার্জের ফলে বুলেটের ভেলোসিটি সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাবে, সেই সাথে বেড়ে যাবে লক্ষ্যভেদ করার এবং হত্যা করার ক্ষমতা। অধিকাংশ হান্টিং বুলেটের নাক চ্যাপ্টা হয়, কিন্তু এটার আগা ছুঁচাল। শুধু তাই নয়, হান্টিং বুলেটের মত এটার মাথা সীসা দিয়ে তৈরি নয়, কাপ্রো নিকেল দিয়ে তৈরি।

'আসল শেলগুলো?' জানতে চাইল রানা।

ডেস্কের দেরাজ খুলে টিসু পেপারের জড়ানো বাকি ছয়টা শেল বের করল পীস। 'অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায় রাখি এগুলো,' বলল সে, 'কিন্তু আপনি আসবেন বলে একটু আগে বের করে রেখেছি।' টিসু পেপারে মোড়া বুলেটগুলো বের করে সাদা ব্লটারে রাখল সে।

মুঠো ভর্তি শেলগুলো কার্ডবোর্ড বাক্সে রেখে ব্লটার থেকে একটা বুলেট তুলে নিল রানা। প্রথম নজরে দেখে মনে হয় বাক্স আর ব্লটারের বুলেটগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এক সেকেন্ড পরই পার্থক্যটা ধরা যায়। বুলেটের একেবারে শেষ মাথার Cupronickel অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে, ফলে ভিতরের লিড দেখা যাচ্ছে। ছুঁচাল আগা তার তীক্ষ্ণতা সামান্য হারিয়েছে, সেই জায়গাতেই ড্রিল করে অতি ক্ষুদ্র একটা ফুটো করা হয়েছে, ফুটোটার দৈর্ঘ্য নোজ-ক্যাপ পর্যন্ত অর্থাৎ এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ। এই ফুটোয় ঢোকানো হয়েছে যতটা মার্কারী আঁটতে পারে। তারপর ফুটোটার মুখে এক ফোঁটা তরল সীসা ঢেলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেটা। সীসা শক্ত হবার পর ফাইল দিয়ে ঘষে ফুলে থাকা অতিরিক্ত অংশগুলো ঝরিয়ে দিয়ে বুলেটের আগার আগের সেই ছুঁচাল চেহারা

ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ধরনের বুলেট আগেও দেখেছে রানা, কিন্তু কখনও ব্যবহার করেনি, বা ব্যবহার করার দরকার হবে বলে ভাবেনি। অনেকদিন আগেই জেনেভা কনভেনশন এই বুলেট ব্যবহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মানুষের শরীরে ধাক্কা খাওয়া মাত্র ছোট একটা গ্রেনেডের মত বিস্ফোরণ ঘটায় এই এক্সপ্লোসিভ বুলেট। ফায়ার করার পর তীব্র সম্মুখগতির জন্যে ভিতরের মার্কারী পিছন দিকে সেঁটে আসে, হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিলে গাড়ির আরোহী ঠিক যেভাবে সীটের সাথে সেঁটে যায়। তারপর যেই বুলেটটা মাংস, শিরা অথবা হাড়ের সাথে ধাক্কা খায় অমনি তীব্র বেগে বুলেটের সামনের দিকে ছুটে আসে মার্কারী। সীসার আবরণ শতধা বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছুটতে শুরু করে—সীসার খুদে ক্ষেপণাস্ত্র বহর নার্ভ, টিস্যু, ছিঁড়ে-ফুঁড়ে একাকার করে দেয়, পিরিচ আকারের একটা এলাকায় কিছুই অক্ষত রাখে না। মাথায় আঘাত করলে এই বুলেট উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে না, কিন্তু Cranium-এর ভিতর যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে দেবে, চিনির দানার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে খুলিটা।

সাবধানে বুলেটটা রেখে দিল রানা টিসু পেপারে। অনুভব করল, সাগ্রহে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ পীস।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে,' বলল রানা। 'আপনি একজন দক্ষ কারিগর, মি. পীস। এবার সমস্যার কথা বলুন।'

উদ্বিগ্ন দেখাল পীসকে। 'সমস্যা দেখা দিয়েছে টিউবগুলোকে নিয়ে, মশিয়ে,' বলল বৃদ্ধ। 'তার আগে একটা কথা বলে নিই। টিউবের ব্যাপারটা তেমন কঠিন হবে না মনে করে সবশেষে, মাত্র ক'দিন আগে কাজটায় হাত দিই আমি। আপনার কথামত প্রথমে অ্যালুমিনিয়ামই ব্যবহার করেছিলাম। টিউবগুলোকে যথাসম্ভব সরু করতে বলেছেন আপনি, তাই খুবই পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত কিনে আনি। মেশিনে কাটতে গিয়ে দেখলাম, জিনিসটা এতই পাতলা যে রসুনের খোসাকেও হার মানায়। সামান্য একটু চাপ পড়লেই তুবড়ে যায়। চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে স্টেনলেস স্টীলের সাহায্য নিলাম।'

রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে বৃদ্ধ। কিন্তু রানার চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই।

'দেখতে জিনিসটা হুবহু অ্যালুমিনিয়ামের মতই,' তাড়াতাড়ি বলল পীস, 'কিন্তু সামান্য একটু বেশি ভারী। খুবই পাতলা, অথচ গায়ে প্যাঁচানো খাঁজ কাটাও সম্ভব, বেঁকে যায় না। তবে জিনিসটা শক্ত বলে কাজ শেষ করতে সময় বেশি লাগছে।' একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'গতকাল মাত্র শুরু করেছি…'

'ঠিক আছে,' একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। আসল কথা, জিনিসটা নিখুঁত চাই আমি। কবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল পীস। 'বলা কঠিন, মশিয়ে। পাঁচ দিনও লাগতে পারে, সাত দিনও লাগতে পারে…'

কোন রকম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল না রানা। বৃদ্ধের ব্যাখ্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল। তারপর খানিক চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে। আমার

ট্রাভেলিং প্ল্যান একটু অদলবদল করতে হবে। যাই হোক, রাইফেল, একটা মার্কারী শেল এবং কিছু সাধারণ শেল প্র্যাকটিসের জন্যে দরকার হবে আমার—কবে দিতে পারবেন, বলুন। আচ্ছা, কোন পরামর্শ দিতে পারেন, সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে নতুন একটা রাইফেল কোথাও টেস্ট করা যেতে পারে? জায়গাটা খোলামেলা হতে হবে, অন্তত একশো ত্রিশ থেকে একশো পঞ্চাশ মিটার ফাঁকা জায়গা দরকার হবে আমার।'

একটু চিন্তা করে পীস বলল, 'আরদেনেসের জঙ্গলে যেতে পারেন আপনি, মশিয়ে। বিশাল জঙ্গল, ফাঁকা জায়গাও খুঁজে পাবেন। কয়েক ঘন্টা একা থাকার মত একমাত্র জায়গা। একদিনের মধ্যে গিয়ে ফিরে আসতে পারবেন। আজ বৃহস্পতিবার। সাপ্তাহিক ছুটি আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে, জঙ্গলে বনভোজন-বিলাসীদের ভিড় থাকতে পারে। সোমবার পাঁচ তারিখ, অনায়াসে প্র্যাকটিসের জন্যে যেতে পারেন আপনি। মঙ্গল, বড়জোর বুধবারের মধ্যে বাকি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে পারব বলে আশা করি আমি।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা কাত্ করল রানা। বলল, 'ঠিক আছে। রাইফেল এবং অ্যামুনিশন এখনই নিয়ে যাচ্ছি। আগামী হপ্তার মঙ্গল অথবা বুধবারে যোগাযোগ করব আপনার সাথে।'

উদ্বেগের একটা ছায়া চেহারা থেকে খসে পড়ল বৃদ্ধ পীসের। মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল সে। বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর ধীরেসুস্থে, অত্যন্ত সাবধানে একটা একটা পার্টস খুলে বিচ্ছিন্ন করল রাইফেলটাকে, অতি যত্নের সাথে ক্যারিয়িং কেসের খোপগুলোয় প্রতিটি অংশ শুইয়ে দিল। একটা খোপে ব্রাশ আর তুলো রয়েছে, টিসু পেপারে জড়ানো মার্কারী শেলটা সেই খোপের একধারে রাখল সে। কেসটা বন্ধ করে রানার হাতে দিল। তারপর শেলের কার্ডবোর্ড বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে।

বাক্সটা নিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'গুড বাই,' বলে ঘুরে দাঁড়াল।

দ্রুত রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল পীস। হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। দৃঢ় পদক্ষেপে দরজা পেরিয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদে বেরিয়ে এল রানা।

ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এল ও। রাইফেল ভরা কেসটা ওয়ারড্রোবের ভেতরে রেখে তালা লাগিয়ে দিল, পকেটে ভরল চাবি, তারপর রুম সার্ভিসকে ডেকে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে ঢুকল বাথরুমে।

সেদিন সন্ধ্যায় ছ'টার কিছু পরে রু নিউডি রেস্তোরাঁয় এল রানা। দেখল পিসিক অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। কেবিনে না ঢুকে এক কোণের একটা টেবিলে বসেছে লোকটা, ব্যাপারটা লক্ষ করেই বুঝে নিল রানা, কোথাও কোন ঘাপলা আছে।

এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল ও। জানতে চাইল, 'কাজ শেষ?'

হাভিডসার মুখে ধূর্ত হাসি খেলে গেল পিসিকের। বলল, 'হ্যাঁ, কাজ শেষ। নিজের গর্ব করা হয়, তবু বলছি, একেবারে নিখুঁত হয়েছে প্রতিটি কাজ।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'দাও,' মৃদু, কিন্তু নির্দেশের সুরে বলল সে।

রানার চোখে চোখ রেখে একটা সিগারেট ধরাল পিসিক। ধোঁয়া ছাড়তে

ছাড়তে গলা খাদে নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আপনি পাগল নাকি, মশিয়ে? ওসব গোপন জিনিস এখানে নিয়ে আসব, তেমন বোকা আমি নই। খদ্দেরদের নিরাপত্তার কথাটা সবচেয়ে আগে চিন্তা করতে হয় আমাকে। এই রকম প্রকাশ্য জায়গায় কাগজপত্র পরীক্ষা করা অসম্ভব। তাছাড়া, এখানে প্রচুর আলোরও অভাব রয়েছে।'

'কোথায়?' সংক্ষেপে, ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল রানা।

'দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, আমার স্টুডিওতে।'

এক সেকেন্ডের জন্যে চোখের চার পাশ কুঁচকে উঠল রানার। ঠাণ্ডা চোখে আরও কয়েক সেকেন্ড দেখল পিসিককে। তারপর ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। তর্জনী নেড়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল পিসিককে, বলল, 'চলো।'

ট্যাক্সি নিয়ে পিসিকের বেসমেন্ট স্টুডিওতে পৌঁছল ওরা। পথে আবোল-তাবোল কিছু রসিকতা করার চেষ্টা করল পিসিক, কান দিল না রানা। কিন্তু থামছে না দেখে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল ও। ওর চোখের দৃষ্টিতে আশ্চর্য একটা শীতলতা দেখে সাথে সাথে ঠোঁটে কুলুপ আঁটল পিসিক। কিন্তু খানিক পর আড়চোখে লক্ষ করেছে রানা, ঠোঁট দুটো নড়ছে লোকটার, বিড়বিড় করছে, যেন নিজেকেই কি যেন তর্ক করে বোঝাতে চেষ্টা করছে সে।

সোয়া ছয়টা বাজে, কিন্তু রোদের ঝাঁঝ এখনও কম নয়। গাঢ় রঙের মস্ত একটা সানগ্লাস ছাড়া বাইরে বেরোয় না রানা, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওর মুখের উপরের অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে সানগ্লাসে। রাস্তাটা সরু, এবং এখানে সেখানে কিছু লম্বা ফালি ছাড়া তেমন রোদ নেই কোথাও। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে রানা, এই সময় মাত্র একজন বুড়ো লোক পাশ ঘেঁষে ধীরে ধীরে চলে গেল। লোকটাকে কাবু করে প্রায় মাটির সাথে নুইয়ে ফেলেছে বাতরোগে। রাস্তার দু'পাশে আর কোন লোক চোখে পড়ল না রানার।

সিঁড়ির ধাপ ক'টা বেয়ে আগে আগে নেমে গেল পিসিক, ঠিক তার পিছনেই রয়েছে রানা। চাবি বের করে তালা খুলল পিসিক। দরজার ভিতর অন্ধকার, প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। পিসিক আগে আগে ঢুকল। পিছনে রানা। আলো জ্বালার জন্যে একপাশে সরে গিয়ে দেয়াল হাতড়াতে যাবে পিসিক, তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'কি!' চমকে উঠে জানতে চাইল লোকটা।

'আলো জ্বালার দরকার নেই,' বলল রানা। হাতটা নামিয়ে নিল পিসিকের কাঁধ থেকে। আউটার অফিসে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দরজার পাশে একটা জানালা, পর্দার ফাঁক দিয়ে ম্লান দিনের আলো ঢুকছে। কামরার চেয়ার-টেবিল আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে এখন। কাঁধ ঝাঁকাল পিসিক। দুটো দরজার পর্দা সরিয়ে পিছনে রানাকে নিয়ে স্টুডিওতে ঢুকল সে, ঢুকেই জ্বেলে দিল সেন্টার লাইটটা।

পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল পিসিক, খুলল সেটা, ভিতরের কাগজগুলো দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো ছোট্ট, গোলাকার মেহগনি কাঠের টেবিলটায় বের করে রাখল। তারপর দু'হাত দিয়ে ধরে কামরার মাঝখানে নিয়ে এল টেবিলটাকে, সেন্টার লাইটের নিচে নামিয়ে রাখল। স্টুডিওর শেষ প্রান্তে খুদে

স্টেজের উপর জোড়া আর্ক ল্যাম্প অফ করাই থাকল।

'প্লীজ, মশিয়ে,' হাড় উঁচু হয়ে থাকা মুখের চামড়া ভাঁজ খেয়ে গেল পিসিকের, হাসছে সে, চিবুক নেড়ে টেবিলে পড়ে থাকা কার্ড তিনটির দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে পিসিকের দিকে রানা। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল ও। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কার্ড। আলোর নিচে ধরে পরীক্ষা করছে সেটা।

এটা ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা একটা কাগজ সাঁটা হয়েছে, তাতে লেখা: 'মি. আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান অভ লন্ডন ডব্লিউ-ওয়ান ইজ হিয়ারবাই লাইসেন্সড টু ড্রাইভ মোটর ভেহিকেলস অভ গ্রুপস ওয়ান-এ, ওয়ান-বি, টু, থ্রী, ইলেভেন, টুয়েলভ অ্যান্ড থারটিন অনলি ফ্রম টেন ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেনটি…আনটিল নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেনটি…ইনক্লুসিভ'। এই কথাগুলোর উপর রয়েছে লাইসেন্স নাম্বার (কল্পিত, অবশ্যই) তারপর লেখা রয়েছে, 'লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল', এর নিচে, 'রোড ট্রাফিক অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেনটি…', তারপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'ড্রাইভিং লাইসেন্স', এবং সবশেষে, 'ফি অভ ফিফটিন—রিসিভড'। যতদূর বুঝতে পারছে রানা, নিখুঁতভাবে জাল করা হয়েছে লাইসেন্সটা, ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবার জন্যে যথেষ্ট।

দু'নম্বর কার্ডটা, সাদামাঠা একজন ফ্রেঞ্চ কর্মজীবী লোকের পরিচয় পত্র। কার্ডটা মার্ক রোডিনের নামে, বয়স তিপ্পান্ন, জন্ম কোলমারে, প্যারিসের বাসিন্দা। আজ থেকে অনেক বছর পর যে চেহারা হবার কথা ওর সেই চেহারার একটা ফটো সাঁটা রয়েছে কার্ডে। মাঝারি করে ছাঁটা চুলের রঙ লোহায় ধরা মরচের মত। কার্ডটা ময়লা হয়ে গেছে। একজন খেটে খাওয়া লোকের কার্ড, দেখলেই বোঝা যায়।

তৃতীয় কার্ডটা খুব আগ্রহের সাথে হাতে তুলে নিল রানা। আইডেনটিটি কার্ডের ফটোটার সাথে এটায় সাঁটা ফটোটার সামান্য একটু অমিল লক্ষ করা যাচ্ছে, তার কারণ দুটো কার্ড ইস্যু করার তারিখের মধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধান রয়েছে। প্রায় হপ্তা দুই আগে রানার যে ফটো তোলা হয়েছে তারই একটা সাঁটা রয়েছে এতেও, কিন্তু শার্টের রঙ এতে আরও গাঢ় দেখাচ্ছে, এবং চিবুকের কাছে খোঁচা খোঁচা কিছু দাড়ি দেখা যাচ্ছে। নিপুণ রি-টাচিংয়ের সাহায্যে এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, ফলে একই লোকের একই সময়ে তোলা ফটো দুটোকে বিভিন্ন সময়ে তোলা ফটো বলে মনে হচ্ছে। সন্তুষ্টচিত্তে কার্ডগুলো পকেটস্থ করল রানা। তাকাল মুখ তুলে।

'ভেরি নাইস,' বলল ও, 'ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। আই কংগ্রাচুলেট ইউ, পিসিক। বাকি টাকাটা দিতে হয় তাহলে এবার।' কথা শেষ করে পকেটে হাত ভরল রানা।

চোখে মুখে প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে পিসিক। একবার ঢোক গিলল। দৃষ্টি এড়াল না রানার, লোভে চকচক করছে চোখমুখ। এটা তার প্রাপ্য টাকা, তা পাবার জন্যে প্রত্যাশায় উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। কোথাও ঘাপলা আছে

এই ধারণা আরও দৃঢ় হলো রানার মনে। পকেট থেকে এক বান্ডিল নোট বের করল ও। বাড়িয়ে দিল পিসিকের দিকে।

টাকার বান্ডিলটা ধরল পিসিক, কিন্তু অপর প্রান্তটা এখনও ধরে আছে রানা, ছাড়েনি। ব্যাপারটা লক্ষ করে হাড্ডিসার কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল পিসিকের। মুখ তুলে তাকাল সে। 'মশিয়ে?'

'ড্রাইভিং লাইসেন্সের জেনুইন ফ্রন্ট পেজটা,' বলল রানা, 'কথা ছিল ওটা তুমি আমাকে ফেরত দেবে।'

চৌকশ অভিনেতা লোকটা, মনে মনে স্বীকার করল রানা। ওর কথা শেষ হতেই বিস্ময়ে কপালে তুলল সে তার ভুরু জোড়া, যেন এইমাত্র মনে পড়ে গেছে কথাটা। টাকার বান্ডিলের প্রান্তটা ছেড়ে দিল সে, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক পা সামনে এগোল, মাথাটা নিচু হয়ে আছে, যেন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন, হাত দুটো পিছন দিকে, পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল সে আবার। দ্রুত ফিরে এল রানার সামনে।

ব্যস্তভাবে বলল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আসলে, ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফ্রন্ট পেজটা এখানে নেই। ঘাবড়াবেন না, আছে সেটা নিরাপদ জায়গাতেই ব্যাঙ্কের একটা লকারে, আমি ছাড়া কেউ হাত দিতে পারবে না সেখানে। আমার ব্যবসার ধরনটা কি তা তো মশিয়ে বুঝতেই পারেন, টু-পাইস অতিরিক্ত কামাবার সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। মশিয়ে কি রাগ করছেন...?'

'কি চাও তুমি?' শান্তভাবে জানতে চাইল রানা।

চোখ বুজল পিসিক। 'পাঁচশো পাউন্ড পেলে মনে আর কোন খেদ থাকবে না আমার, খোদার কসম, বিলিভ মি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। মানুষ যেচে পড়ে কেন যে নিজের বিপদ ডেকে আনে...ভাবতে গিয়ে শ্রাগ করল ও।

চোখ মেলল পিসিক। 'বিনিময়ে ফ্রন্ট পেজটা আপনাকে দান করব। আপনি ইন্টারেস্টেড, মশিয়ে?' লোভে চকচক করছে তার কোটরাগত চোখ দুটো।

'ব্ল্যাকমেইলিং?' ঠোঁটে মৃদু হাসি টেনে বলল রানা।

চটাস করে নিজের কপালের হাড়ে চাঁটি মারল পিসিক। চোখে মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল তার। এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে। বলল, 'হায় কপাল! শেষ পর্যন্ত, মশিয়ে, আপনিও আমাকে ভুল বুঝলেন! ব্ল্যাকমেইলার? আমি? খোদার কসম, ব্যাপারটা তা নয়, তার ধারে কাছেও নয়। ব্ল্যাকমেইলাররা দাবি জানায় বারবার, একবারে সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু আমি এই একবারই পাঁচশো পাউন্ড নেব, তারপর আর চাইব না। এবার আপনিই বলুন, ব্ল্যাকমেইলারের সাথে আমার মিলটা কোথায় দেখতে পাচ্ছেন? সবিনয়ে জানাচ্ছি, ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফ্রন্ট পেজটাই শুধু নয়, আপনার ফটোর সমস্ত নেগেটিভ আর পজিটিভ কপি, এবং তার সাথে মেকআপ ছাড়া আপনার আসল চেহারার একটা ফটো—এটা আমি আপনার অগোচরে দ্রুত তুলেছিলাম সেদিন—ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিয়েছি। ফ্রন্ট পেজটার জন্যে পাঁচশো পাউন্ড, দাবিটা বেশি বলবেন?' অসহায়ভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে পিসিক। 'এর কমে পারি না, বিলিভ মি। বাকিগুলোর জন্যে খুব কম করে

চাইব, কিন্তু…'

'কত?'

'মোট?' পিসিক একগাল হাসল। 'বেশি না, একহাজার পাউন্ড। খেদ তো থাকবেই না, খুশি হয়ে যাবে মনটা…'

'ওগুলো আমার দরকার, বিনিময়ে এক হাজার পাউন্ড কিছুই নয়…' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা।

বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বেলজিয়ানের মুখ। 'শুনে আনন্দ পাচ্ছি, মশিয়ে।'

'কিন্তু,' মৃদু হাসল রানা। 'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি নই।'

বিস্ময়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পিসিকের চোখ দুটো। তারপর চোখের চার পাশ কুঁচকে উঠল তার। 'কিন্তু কেন! বলছেন ওগুলোর তুলনায় এক হাজার পাউন্ড কিছুই না, অথচ রাজি নন—আপনার কথা ঠিক…'

'দুটো কারণে রাজি নই,' করণীয় স্থির করে ফেলেছে রানা, কিন্তু তা করার আগে কিছু কথা কৌশলে জেনে নিতে হবে লোকটার কাছ থেকে। 'এক, ফটোগুলোর অরিজন্যাল নেগেটিভ কপি করা হয়েছে কিনা জানা নেই আমার। যদি করে থাকো, আবার টাকা দাবি করবে তুমি। দুই, জিনিসগুলো সত্যি লকারে রেখেছ, নাকি কোন বন্ধুর কাছে রেখেছ, তাও আমার জানা নেই। সেই বন্ধুও আমার কাছ থেকে টাকা চাইবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল পিসিক। বলল, 'উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই আপনার। নিজের স্বার্থেই কোন বন্ধুকে বিশ্বাস করে এত দামী জিনিস রাখতে দিতে পারি না আমি। তাছাড়া এক হাতে ওগুলো নেবেন, অন্য হাতে টাকা দেবেন—এর মধ্যে ছলচাতুরীর অবকাশ নেই। লকারেই রেখেছি, বিশ্বাস করুন। অরিজিন্যাল ফ্রন্ট পেজটা আপনাকে দিয়ে দেবার পর ইচ্ছা থাকলেও আবার আমি টাকা চাইতে পারব না। সবাই জানে, ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটা ফটো কপি কোনই গুরুত্ব বহন করে না, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা আমলই দেবে না। তাছাড়া, জাল একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ ধরা পড়লে সামান্য কিছু জরিমানা হবে আপনার, তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং আমাকে বারবার টাকা দেয়ার চাইতে নতুন আরেকটা জাল লাইসেন্স যোগাড় করার ব্যবস্থা করবেন আপনি। ফ্রেঞ্চ কার্ড দুটো সম্পর্কেও এই কথা খাটে।'

'সেক্ষেত্রে এখনই তা আমি করতে পারি না কেন?' জানতে চাইল রানা। 'কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স যোগাড় করতে পাঁচশো পাউন্ডের বেশি লাগবে না আমার। তোমাকে অতিরিক্ত এক হাজার পাউন্ড দিতে যাব কেন?'

'আমি ভরসা করছি আপনার সময়ের অভাবের ওপর,' গম্ভীর হয়ে বলল পিসিক। 'নতুন কার্ড আর লাইসেন্স যোগাড় করতে যে সময় লাগবে, আমার ধারণা, আপনার হাতে সে-সময় নেই। তাছাড়া, আমার কাজে কোন খুঁত নেই, সেজন্যে আমার করা কাজগুলো আপনি হাতছাড়া করতে রাজি হবেন বলেও মনে করি না। কাজগুলো নেবেন, সেই সাথে আমার মুখ বন্ধ করারও ব্যবস্থা করবেন—বোধহয় এ ছাড়া বিকল্প উপায় এই মুহূর্তে আপনার নেই।'

একটু চিন্তা করল রানা। কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, 'আমার অসুবিধাগুলো ঠিকই ধরতে পেরেছ তুমি। ঝোপ বুঝে কোপ মারা একেই বলে! কিন্তু আমার কাছে এক হাজার পাউন্ড আছে, এ-কথা তুমি ভাবছ কেন?'

'মশিয়ে, আপনি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। পরিষ্কার বোঝা যায়। অথচ আপনি মধ্য বয়স্ক একজন ফ্রেঞ্চ শ্রমিক হিসেবে ছদ্ম পরিচয় নিতে চাইছেন। এ থেকে একটা সত্যই প্রমাণ হয়, আপনি একজন স্মাগলার। সম্ভবত ড্রাগস, না? নাকি ডায়মন্ড? যাই হোক, লাভজনক ব্যবসায় আছেন আপনি। এখন বলুন, আপনি রাজি? আগামীকাল বিনিময় পর্ব সমাধা করতে চান?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তুমিই জিতলে। আগামীকাল দুপুরের মধ্যে এক হাজার পাউন্ড যোগাড় করতে পারব বলে আশা করি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' চোখের চার পাশের চামড়া আবার কুঁচকে উঠল পিসিকের।

'এখানে আমি আসব না,' বলল রানা। 'আমি চাই না, তোমার কোন বন্ধু আড়াল থেকে আবার ফটো তুলুক আমার।'

স্বস্তির আরেকটা হাঁফ ছেড়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল হাড্ডিসার পিসিক। বলল, 'আপনি খামোকা ভয় করছেন, মশিয়ে। আপনার ছবি তোলার কোন দরকারই নেই আমার, কারণটা আগেই বলেছি—তাতে কিছু লাভ করতে পারব না আমি—সুতরাং, কোন বন্ধুকে এখানে আমি লুকিয়ে রাখব না। হঠাৎ কেউ এসে পড়বে, সে ভয়ও নেই। কাউকে না ডাকলে আমার এই স্টুডিওতে কেউ পা দেয় না। ট্যুরিস্টদের জন্যে এখানে আমি আদি রসের ছবি তুলি কিনা, তাই এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকি। যাকে ডাকি শুধু সেই আসে। আগামীকাল কাউকে ডাকিনি। পরশু দিন কয়েকজন আসবে, ওই আদি রসের ছবি তুলতে...' একটা হাত তুলে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা একত্রিত করে ইংরেজি O অক্ষরের মত একটা বৃত্ত তৈরি করল সে, তারপর অপর হাতের তর্জনী সেই গোলাকার গর্তে বারবার ঢোকাতে আর বের করতে শুরু করল।

মুহূর্তের জন্যে একটু হাসল রানা। তাই দেখে আনন্দে আটখানা হলো পিসিক। অট্টহাসি বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে, সেই সাথে আরও দ্রুত O-এর ভিতর ডান হাতের তর্জনী চালাচ্ছে। বেদম হাসিতে কাঁপছে সে, তাকে স্থির করার জন্যে একটা হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরল রানা, মৃদু হাসি লেগে আছে ওর ঠোঁটে।

ডান পায়ের হাঁটু ভাঁজ হয়ে বিদ্যুৎ বেগে উঠে এল রানার, হাঁটুটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেল পিসিকের দুই উরুর সংযোগ স্থলে। মাথাটা তীব্র ঝাঁকি খেল সামনের দিকে, হাত দুটোর অশ্লীল ক্রিয়া থেমে গেল, মরা সাপের মত ঝুলে পড়ল শরীরের দু'দিকে। অট্টহাসিটা গলায় আটকে গেছে, বদলে ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে আসছে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। আহত জায়গাটা চেপে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

ধীরসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা। তারপর উবু হয়ে বসে পিসিকের পালস দেখল। চলছে, আধঘণ্টার আগে জ্ঞান ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল ও, স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল আউটার অফিসে। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখে নিল একবার। তারপর টেবিলের কাছে ফিরে এসে তুলে

নিল টেলিফোনের রিসিভার। বিশেষ একটা নাম্বারে ডায়াল করল রানা। নিজের পরিচয় দিল না, শুধু বলল, 'আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছ?'

দুই সেকেন্ড পর অপর প্রান্ত থেকে বিস্ময় মেশানো উত্তর এল, 'পারছি।'

স্টুডিওর লোকেশনটা সংক্ষেপে জানাল রানা। রানা এজেন্সীর স্থানীয় শাখা প্রধান বলল, 'চিনে নেব।'

'একটা কার্গো সরাতে হবে। লন্ড্রি ভ্যান নিয়ে এসো। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সরিয়ে রাখা দরকার। অসুবিধে হবে না তো?'

'না।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল। তারপর এগোল দরজার দিকে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। কবাট দুটো নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একতলায়, সেখান থেকে নির্জন রাস্তায়।

হেঁটে মেইন রোডে পৌছতে তিন মিনিট লাগল ওর। ট্যাক্সির জন্যে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় ঝড় তুলে একটা লন্ড্রি ভ্যানকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। প্রায় ওর গা ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিল গাড়িটা, ঢুকে পড়ল অপ্রশস্ত রাস্তায়। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটার সাথে চোখাচোখি হলো একবার, কিন্তু রানাকে চিনতে পারলেও আচরণে তার কোন প্রকাশ ঘটল না। দ্রুত অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ড্রাইভার।

পরদিন শুক্রবার। দিনের বেশির ভাগটা ব্যয় হলো এটা সেটা কেনাকাটায়। একটা ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্টের দোকান থেকে একজোড়া হাইকিং বুট কিনল ও। রেডিমেড গার্মেন্টসের দোকান থেকে লম্বা উলেন মোজা, ডেনিশ ট্রাউজার, চেক উলেন শার্ট এবং একটা হ্যাভার স্যাক নিল। এছাড়া আরও কিনল কয়েক শিট ফোম রাবার, ফিতেওয়ালা শপিং ব্যাগ, চিকণ রশির একটা বল, একটা হান্টিং নাইফ, পাতলা দুটো পেইন্ট ব্রাশ, এবং পিঙ্ক ও ব্রাউন রঙের দুটো কৌটা। বড়সড় একটা তরমুজ কেনার কথা চিন্তা করল, কিন্তু সাপ্তাহিক ছুটি শেষ হবার আগেই সেটা পচে যাবে ভেবে আপাতত সেটা না কেনারই সিদ্ধান্ত নিল।

হোটেলে ফিরে এসে আগামীকাল সকালের জন্যে একটা সেলফ-ড্রাইভ কারের ব্যবস্থা করতে বলল রিসেপশনিস্টকে রানা। কাউন্টারে জমা দিল নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সটা। ওর পাসপোর্ট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স একই নাম বহন করছে এখন: আলেকজান্ডার অরগ্যান।

রিসেপশনিস্টকে আরও একটা নির্দেশ দিল রানা। বলল, 'উইক-এন্ডের জন্যে সমুদ্রের ধারে যে-কোন হোটেলের একটা কামরা বুক করুন আমার জন্যে, কিন্তু শাওয়ার থাকতে হবে।'

পরদিন সকালে রিসেপশনিস্ট ওকে জানাল, 'Zeebrugge-এর ফিশিং হারবার দেখা যায় হোটেলটা থেকে, কিন্তু কামরাটা খুবই সাদামাঠা এবং ছোট, চলবে আপনার?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'চলবে।' আধঘন্টা পর রেন্ট-এ-কারের একটা অসটিন নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও।

আট

ব্রাসেলসে রানা যখন কেনাকাটায় ব্যস্ত, ম্যাটাপ্যান তখন রোমের মেইন পোস্ট-অফিসের ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন এনকোয়েরীতে প্রদর্শনীর একটা বস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে।

আশপাশে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে সুসজ্জিত, সভ্য গরিলাটাকে দেখার জন্যে। মন চারেক ওজনের সাত ফিট লম্বা বিশাল ম্যাটাপ্যানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার অবসর নেই। মনের অবস্থা খুবই খারাপ তার। মেয়ে ভ্যালেন্টিনা কেমন রইল জানার জন্যে ছটফট করছে সে।

একজন কেরানীকে সমস্যাটা বোঝাতে পেরেছে ম্যাটাপ্যান: প্যারিসের একজন লোককে ফোন করতে চায় সে। লোকটার নাম ভিক্টর কাউলাস্কি। তার বাড়ির ঠিকানাও তার জানা আছে। কিন্তু ফোন আছে কিনা জানা নেই, সুতরাং ফোন নাম্বার জানারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। যদি থাকে, যোগাযোগ করা সম্ভব কিনা?

'সম্ভব কিনা জানি না,' একটা কাগজে সমস্ত তথ্য লিখে নিয়ে কেরানী বলল, 'এই চিরকুটটা নিয়ে অপারেটরের কাছে যান, দেখুন কতদূর কি করতে পারে সে আপনার জন্যে।'

অপারেটরকে চিরকুটটা দিয়ে অপেক্ষা করছে ম্যাটাপ্যান। একঘণ্টার উপর হয়ে গেছে, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। অপারেটর তাকে জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে প্যারিসের হেড পোস্ট অফিসে, সেখান থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

আরও আধঘণ্টা পর সুখবর দিল অপারেটর। রিসিভারটা ম্যাটাপ্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একমুখ হেসে বলল, 'নিন, আপনার বন্ধু ভিক্টর কাউলাস্কির সাথে কথা বলুন।'

'...হ্যাঁ, ডাক্তার বলেছে, রোগটা খুবই সাংঘাতিক,' ম্যাটাপ্যানের প্রশ্নের উত্তরে প্যারিস থেকে জানাচ্ছে তার বন্ধু এবং তার মেয়ের পালক-পিতা ভিক্টর কাউলাস্কি। 'হ্যাঁ, পাশের কামরায় শুয়ে আছে সে, ডাক্তার বিছানা থেকে নামতে নিষেধ করে দিয়েছে।...না-না, আগের সেই ফ্ল্যাটে নেই আমরা। এখন যেটায় আছি সেটা অনেক বড়।... কি?...ঠিকানা? দিচ্ছি...' ধীরে ধীরে প্যারিস থেকে ঠিকানাটা দিল কাউলাস্কি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সেটা একটা কাগজে লিখে নিল ম্যাটাপ্যান।

'ডাক্তার কি কোন রকম আশাই দেননি?' জানতে চাইল ম্যাটাপ্যান। অপর প্রান্তে কোন সাড়া নেই দেখে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল সে, 'হ্যালো? হ্যালো?'

আবার শোনা গেল কাউলাস্কির যান্ত্রিক, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'না...মানে কিছুই বলতে পারেননি ডাক্তার...এক মাস, এক হপ্তা— আবার এক বছরও টিকে যেতে

পারে...'

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল ম্যাটাপ্যানের। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল রিসিভার ধরা হাতটা তার কাঁপছে। কথা বলতে গিয়ে অনুভব করল আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে গলা। দ্রুত রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

প্যারিস। ভিক্টর কাউলাস্কির ফ্ল্যাট। স্ত্রী এবং পালক কন্যা ভ্যালেন্টিনাকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটেই দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করছে সে।

রোমে ম্যাটাপ্যান রিসিভার নামিয়ে রেখেছে বুঝতে পেরে কাউলাস্কিও ধীরে ধীরে ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। তারপর মুখ তুলে সামনে বসা ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন সার্ভিসের লোক দু'জনের দিকে তাকাল। দু'জনের হাতেই দুটো কোল্ট, ·৪৫ পুলিস স্পেশাল, কাউলাস্কির বুক এবং কপাল লক্ষ্য করে ধরা।

'প্যারিসে আসছে ম্যাটাপ্যান?' দু'জনের একজন জানতে চাইল।

'বলেনি আমাকে,' রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে আছে কাউলাস্কির মুখের চেহারা। 'হঠাৎ কানেকশন কেটে দিল।'

'এতবড় দুঃসংবাদ, আসতে তাকে হবেই, কি বলো?' ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন সার্ভিসের দ্বিতীয় লোকটা ভুরু নাচিয়ে বলল।

বোকার মত তাকিয়ে আছে কাউলাস্কি।

'যাই হোক,' দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'তোমার কাজ তুমি শেষ করেছ। এবার আরেকটু কষ্ট করতে হবে তোমাদেরকে। অন্দর মহলে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি একটা সুটকেসে কিছু প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিতে বলো। আমাদের সাথে এক জায়গায় যেতে হবে তোমাদেরকে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল কাউলাস্কি।

'আগেই বলেছি, গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এর সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপার জড়িত। আমরা চলে গেলে ফোন করে তুমি ম্যাটাপ্যানকে আবার সাবধান করে দাও, এ আমরা চাই না। তোমাদের চিন্তার কিছু নেই। ক'টা দিন সমুদ্রের ধারে নিখরচায় বেড়িয়ে আসবে, তার বেশি কিছু নয়। ওঠো, মিসেসকে তাড়াতাড়ি করতে বলো।'

ম্লান মুখে বসে থাকল কাউলাস্কি। চিন্তা করছে। এদের পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু ম্যাটাপ্যান তার বন্ধু, তার কোন ক্ষতি হতে দিতে চায় না সে। বলল, 'কিন্তু মি. ম্যাটাপ্যানকে কেন দরকার আপনাদের?'

'কেন দরকার তা বলতে নিষেধ আছে। তবে, তার কোন ক্ষতি করা হবে না। কিছু তথ্য চাইব আমরা। ব্যস।'

কাঁধ ঝাঁকাল কাউলাস্কি। হয়তো তাই, ভাবল সে। বলল, 'কিন্তু ভ্যালেন্টিনার কি হবে?'

'স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ি থামাব একবার, তুলে নেব ওকে,' অ্যাকশন সার্ভিসের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটা জানাল। 'হেডমিসট্রেসকে আগেই জানানো হয়েছে, ভ্যালেন্টিনার দাদী মৃত্যুশয্যায় তাঁকে শেষবার দেখার জন্যে ভ্যালেন্টিনাকে ছুটি দিতে হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোফা ত্যাগ করল কাউলাস্কি।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন ক'টা সাগর তীরে কাটাল রানা। একজোড়া সুইমিং ট্রাঙ্ক কিনে শনিবারটা জিবরাগ এর তীরে গায়ে রোদ খেলো, কয়েকবার গোসল করল উত্তর সাগরে, বাকি সময়টা ছোট্ট বন্দর শহরে একাকী ঘুরেফিরে বেড়াল। রোববারদিন সকালবেলা জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে গাড়িতে উঠল। অলস ভঙ্গিতে গাড়ি চালিয়ে গেন্ট আর ব্রাজেস-এর সরু গলিগুলোর ভিতর দিয়ে পৌঁছল ড্যাম-এ, সিকন রেস্তোরাঁয় বাঁশের আগুনে ঝলসানো মুরগীর লাঞ্চ খেলো, তারপর গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল ব্রাসেলসের দিকে। হোটেলে পৌঁছে রুম-সার্ভিসকে জানিয়ে রাখল আগামীকাল ভোরে বিছানায় ব্রেকফাস্ট চাই ওর, সাথে এক প্যাকেট লাঞ্চ। কথা প্রসঙ্গে রিসেপশনিস্টকে জানাল বালজ এর যুদ্ধে নিহত ওর বড় ভাইয়ের কবর দেখার জন্যে খুব ভোরে আরডেনেসের দিকে রওনা হয়ে যাবে ও।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন ক'টা বিছানায় শুয়ে কাটাল ম্যাটাপ্যান। তার ম্লান চেহারা দেখে খটকা লাগল মোনিকার। প্রশ্ন করতে ম্যাটাপ্যান সংক্ষেপে জানাল, 'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।'

'ক'দিন ছুটি নিলেই তো পারো, বাপু,' রাগের সাথেই বলল কথাটা মোনিকা। রাগ করার যথেষ্ট কারণও আছে। দিনের পর দিন গাধার মত খাটে লোকটা, বিশ্রামের ধার ধারে না। এ নিয়ে অনেক বকাঝকা করেছে মোনিকা, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তার কথা ম্যাটাপ্যান। 'শোনো, সোমবার থেকে সাতদিন তোমাকে যদি অফিসে দেখি, মাথা খাবে আমার। এই ক'দিন কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে তোমাকে।'

একদৃষ্টিতে মোনিকার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাটাপ্যান। নিজেকে যতটা ভালবাসে, তারচেয়েও বুঝি বেশি ভালবাসে মোনিকাকে। কিন্তু যতই ভালবাসুক, আজ হঠাৎ সে উপলব্ধি করছে, মোনিকা তার নিজের মেয়ে নয়। তবু, মোনিকাই এখন তার একমাত্র সান্ত্বনা। নিজের মেয়েটা মরতে চলেছে···।

সোমবারের ভোর। অফিসে আজ নামবে না ম্যাটাপ্যান। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া সাতদিনের ছুটিটাকে কাজে লাগাবে। ফ্রান্সে যাবে সে। মেয়েকে শেষ দেখা দেখবে। মনস্থির করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ম্যাটাপ্যান। পা টিপে টিপে বেরোল ঘর থেকে।

সোমবার ভোরে সেই সময় বিছানা ছেড়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে গোছগাছের কাজে হাত দিল রানা।

প্রথমে শাওয়ার সারল ও, দাড়ি কামাল, বিছানার পাশের টেবিলে রাখা ট্রে থেকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল। তালা খুলে ওয়ারড্রোব থেকে বের করল রাইফেল ভর্তি কেসটা। কেস খুলে এক এক করে বের করল রাইফেলের প্রতিটি পার্টস। তারপর যত্নের সাথে প্রতিটি পার্টস কয়েকবার করে মুড়ল ফোম রাবার দিয়ে। সবগুলো একত্রিত করে সরু রশি দিয়ে বেঁধে একটা বান্ডিল তৈরি করল, তারপর

বান্ডিলটা ঢুকিয়ে দিল রাকস্যাকের নিচে। এর উপর চাপাল রঙের কৌটা আর ব্রাশগুলো, ডেনিশ ট্রাউজার, চেক শার্ট, মোজা আর বুটজোড়া। সুতো দিয়ে বোনা ফোকরওয়ালা শপিং ব্যাগটা ঢোকাল রাকস্যাকের বাইরের একটা পকেটে, দ্বিতীয় পকেটে রাখল বুলেটের বাক্সটা।

ডোরাকাটা একটা শার্টের উপর ডাভ-গ্রে রঙের লাইটওয়েট স্যুট, একজোড়া হালকা কালো লেদার স্নেকার, কালো সিল্ক দিয়ে বোনা টাই পরল রানা। রাকস্যাকটা একহাতে নিয়ে নিচের গ্যারেজে নেমে এল ও। গাড়ির বুটে রাকস্যাকটা রেখে লক করে দিল। কেবিনে গিয়ে ডেলিভারি নিল অর্ডার দিয়ে রাখা প্যাকেট লাঞ্চটা।

সকাল ন'টা। পুরানো ই-চল্লিশ হাইওয়ে ধরে ব্রাসেলস ছেড়ে নামুরের দিকে ছুটছে অসটিন ঝড়ের বেগে। সমতল তৃণভূমিতে সকালের মিঠে রোদ ঝলমল করছে, মনে হচ্ছে গরম পড়বে আজ। রোড ম্যাপ অনুযায়ী আরদেনেসের লাগোয়া ছোট্ট শহর ব্যাসটোন নব্বুই মাইল দূরে। শহর ছাড়িয়ে দক্ষিণে আরও কয়েক মাইল এগোবে রানা, পাহাড় আর জঙ্গলের কোথাও নির্জন জায়গা খুঁজে নেবে। দুপুরের মধ্যেই শ'খানেক মাইল পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব, রাস্তার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছে ও। ওয়ালুন প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে সমতল রাস্তাটা সরলরেখার মত এগিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে দিগন্তরেখার আড়ালে। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল তুলল রানা।

সূর্য সুবিন্দু রেখার কাছে পৌঁছবার আগেই নামুর এবং মার্চ পেরিয়ে এল রানা। রাস্তার ধারের মাইলপোস্ট দেখে বুঝতে পারছে ব্যাসটোন দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে।

ছোট্ট শহর। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের শীতকালে Hasso von Manteuffel-এর King Tigar ট্যাঙ্কগুলো গোলা ছুঁড়ে গোটা শহরটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসের একবিন্দু চিহ্ন কোথাও অবশিষ্ট নেই দেখে মনে মনে বেলজিয়ানদের দেশপ্রেম এবং শ্রম-প্রবণতার প্রশংসা না করে পারল না রানা। ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন করে গড়ে তুলেছে তারা শহরটাকে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অবশ্য গোটা ইউরোপ এবং এশিয়ার জাপান ও কোরিয়ায়ও ভূরি ভূরি লক্ষ করা যায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই নিজের দেশ আর দেশবাসীর কথা মনে পড়ে গেল রানার। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দেশের বর্তমান হাল দেখে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভয় হয় ওর। ছোট্ট একটু জায়গা, তাতে গিজগিজ করছে কোটি কোটি মানুষ। খরা, পোকা আর বন্যার ত্রিমুখী আক্রমণে ফসলের দফা সারা। পাব পাব করেও পাওয়া আর হচ্ছে না তেল। সীমিত সম্পদ, তাও লুটেপুটে খাচ্ছে দুর্নীতি নামের রাক্ষসটা। নৈতিকতা এখন পরাজিত সৈনিক, বেশির ভাগ মানুষ তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে। এসবের পরে রয়েছে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ষড়যন্ত্র, ইজমের দৌরাত্ম্য, কর্মবিমুখতা, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। মাছ ধরার জাল পরা, অভুক্ত, হাড্ডিসার কুলবধূ বাসন্তীর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই গায়ের রোম দাঁড়িয়ে পড়ল রানার। কপালের পাশে দপ্ দপ্ করছে একটা শিরা।

বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে গাড়ি। সামনে জঙ্গলের ভিতর পাহাড়। ক্রমশ

আরও গভীর হচ্ছে বনভূমি।

কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ভাবছে রানা। দেশের ভাল চাইলে কাজ করতে হবে। সবাই শুরু করুক, এই আশায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'—বাংলাদেশের বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি লোককে এখন এই নীতিতেই চলতে হবে। ঝটপট একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। এবার দেশে ফিরে পোলট্রি ফার্ম আর গম চাষের প্রকল্পে হাত দেবে সে। অনেকদিনের পুরানো স্বপ্ন, উঠে পড়ে কাজে হাত না দিলে চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে।

মেঠো পথ, কিন্তু বেশ চওড়া। মাইলখানেক এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে ঘাস বিছানো সমতল ছোট্ট মাঠে নেমে সোজা এগিয়ে আবার প্রবেশ করল বনভূমিতে। গজ বিশেক এগিয়ে মাথা সমান উঁচু ঝোপের আড়ালে দাঁড় করাল গাড়ি।

সুশীতল ছায়া চারদিকে, আশপাশে মিষ্টি মধুর পাখির কোলাহল, বাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ—ভাল লেগে গেল জায়গাটাকে। গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরাল রানা। একজনের অভাব বোধ করছে হঠাৎ। পাশে সোহানা থাকলে বড় ভাল লাগত এখন। পরমুহূর্তে কাজের কথা মনে পড়তেই উবে গেল মন থেকে রোমান্সের আমেজটুকু। কঠোর হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা। এর পরই হয়তো সালমার কথা মনে পড়ে যাবে। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার। হাতের সিগারেটটা পায়ের সামনে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করল।

নব ধরে টান দিয়ে লক খুলে বুটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, রাকস্যাকটা বের করে রাখল বনেটের উপর।

স্যুট খুলে গাড়ির ব্যাক সীটে ভাঁজ করে রাখল। ডেনিশ স্ল্যাকসটা পরল, ডোরাকাটা শার্ট খুলে পরল লাম্বারজ্যাক চেক শার্ট। হাইকিং বুট আর উলেন মোজা জোড়াকে জায়গা ছেড়ে দিল শহুরে স্নেকার জোড়া। বুটের ভিতর গুঁজে নিল ট্রাউজারের নিচের অংশ।

.বান্ডিল খুলে এক এক করে বের করল রাইফেলের প্রতিটি অংশ। সময় নিয়ে, অত্যন্ত যত্ন এবং সাবধানতার সাথে অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে তৈরি করে ফেলল রাইফেলটা। ট্রাউজারের এক পকেটে ঢুকিয়ে নিল সাইলেন্সার, আরেক পকেটে টেলিস্কোপ সাইট। কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বিশটা শেল বের করে শার্টের বুক পকেটে ভরল, টিসু পেপারে জড়ানো এক্সপ্লোসিভ শেলটা রাখল শার্টের আরেক বুক পকেটে।

বাকি অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে রাইফেলটা গাড়ির বনেটে রেখে আবার পিছনের বুটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। সেটা খুলে মস্ত একটা তরমুজ বের করল। গত সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরার পথে বাজার থেকে কিনেছে এটা, সারারাত এই বুটের ভিতরই ছিল। বুটটা লক করে রঙের কৌটা, ব্রাশ এবং হান্টিং নাইফের সাথে রাকস্যাকের ভিতর রেখে দিল তরমুজটা।

গাড়িতে তালা লাগিয়ে ঠিক দুপুর বেলা রওনা হলো রানা।

দশ মিনিটের মধ্যে মনের মত লম্বা, অপ্রশস্ত একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেল

ও। জায়গাটার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তের দিকে তাকালে একশো পঞ্চাশ গজ পরিষ্কার দৃষ্টি চলে। একটা গাছের পাশে রাইফেলটা রেখে লম্বা পা ফেলে পদক্ষেপ গুনতে গুনতে এগোল, থামল একশো পঞ্চাশ পা এগিয়ে, আশপাশে তাকিয়ে রেখে আসা রাইফেলটার কাছ থেকে দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা গাছ খুঁজছে।

গাছ নির্বাচনের পর রাকস্যাকের ভিতর থেকে সব জিনিস ঘাসের উপর নামাল ও। হাঁটু গেড়ে বসে তুলি দিয়ে তরমুজের গায়ে শিল্প চর্চা শুরু করল। ফলটার উপর এবং নিচের গাঢ় সবুজ ত্বকে তামাটে রঙের প্রলেপ দিল ও, মাঝখানে লালচে রঙ মাখাল। রঙ দুটো তরল থাকতে থাকতেই তর্জনী দিয়ে তরমুজের গায়ে এক জোড়া চোখ, একটা নাক, গোঁফ এবং মুখ আঁকল।

ফলটার মাথায় খাড়াভাবে ছুরি ঢুকিয়ে দিল ও, ছুরির হাতল ধরে ধীরে ধীরে উপরে তুলল, তারপর অত্যন্ত সাবধানে সেটাকে নামাল সুতো দিয়ে ফাঁক ফাঁক করে বোনা শপিং ব্যাগে। ফাঁকগুলো বেশ বড় বড়, সুতোটাও মিহি, তাই তরমুজের আউট লাইন বা গায়ের নকশা কিছুই ঢাকা পড়েনি।

মাটি থেকে সাত ফিট উঁচুতে গাছের কাণ্ডে ছুরিটা গাঁথল রানা। ছুরির বাঁটে ঝুলিয়ে দিল ব্যাগটা। ব্যাকগ্রাউন্ডে গাছের সবুজ ছাল, লালচে এবং বাদামী তরমুজ ঠিক একটা গম্ভীর-দর্শন মানুষের কাটা মুণ্ডুর মত ঝুলছে। দু'পা পিছিয়ে এসে নিজের শিল্পকর্মটি পরখ করল রানা। আপন মনে হাসল একটু।

রঙের কৌটা আর তুলিগুলো দূরের একটা ঝোপের ভিতর ফেলে দিল রানা। রাকস্যাকটা তুলে নিয়ে ফিরে এল রাইফেলের কাছে। প্রথমে ফিট করল সাইলেন্সার, তারপর ব্যারেলের উপর টেলিস্কোপ সাইট। বোল্টটাকে পিছনে টেনে এনে একটা কারট্রিজ ভরল ব্রীচে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে তাকাল। ঝুলন্ত টার্গেটটাকে একেবারে সামনে দেখতে পেল ও, ফলে অনেক বড় দেখাচ্ছে তরমুজটাকে। তরমুজের গায়ে সেঁটে থাকা ব্যাগের সুতোগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চোখ, নাক, ঠোঁট—সব স্পষ্ট।

একটু সরে দাঁড়াল রানা, লক্ষ্য স্থির করার জন্যে হেলান দিল একটা গাছে। টেলিস্কোপের ক্রস চিহ্নটা ঠিক মত পড়েনি মাঝখানে, অ্যাডজাসটিং স্ক্রু ঘুরিয়ে সেন্টারে আনল সেটাকে। তারপর অত্যন্ত সাবধানে তরমুজের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল।

যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক কম ধাক্কা মারল রাইফেলটা। সাইলেন্সারটাও দারুণ সন্তুষ্ট করল ওকে। 'পুট' করে যে শব্দটা হলো, নির্জন একটা রাস্তার এপার থেকে গুলি করলে ওপার থেকেও বোধহয় শুনতে পাওয়া যাবে না। রাইফেলটাকে বগলদাবা করে এগিয়ে গেল রানা, দাঁড়াল তরমুজটার সামনে। ফলটার মাথার দিকে ডান পাশের কিনারা ঘেঁষে একটা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট, দু'টুকরো করে দিয়ে গেছে শপিং ব্যাগের একটা সুতোকে, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছে গাছের গায়ে। ফিরে এসে টেলিস্কোপ সাইটের সেটিং না বদলে আবার গুলি করল ও।

ফলাফল প্রায় আগের মতই, মাত্র আধ ইঞ্চির হেরফের। মোট চারবার গুলি করে নিশ্চিত হলো ও, ওর হাতের টিপ ঠিকই আছে, টেলিস্কোপটাই সামান্য

গোলমাল করছে—একটু উপরে, ডান দিক ঘেঁষে লাগছে বুলেট। স্ক্রু ঘুরিয়ে রি-অ্যাডজাস্ট করে নিল টেলিস্কোপ, তারপর আবার গুলি করল।

পরবর্তী গুলিটা একটু নিচের দিকে বাঁ দিক ঘেঁষে লাগল। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে তরমুজের কাছে হেঁটে এসে ফুটোটা পরীক্ষা করল রানা। মুখের নিচের বাম প্রান্তে লেগেছে বুলেট। টেলিস্কোপের নতুন পজিশন না বদলে আরও তিনটে গুলি ছুঁড়ল ও, প্রতিটি বুলেট একই এলাকায় গিয়ে বিদ্ধ হলো। দুটো স্ক্রু সামান্য ঘুরিয়ে আবার টেলিস্কোপ সাইট অ্যাডজাস্ট করল ও।

নয় নম্বর বুলেটটা তরমুজের কপাল ভেদ করে গেল, ঠিক যেখানে তাক করেছিল ও। এবার নিয়ে তৃতীয়বার তরমুজটার কাছে ফিরে এল ও। পকেট থেকে একটা সাদা চক বের করে গুলি লাগা এলাকাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করল—উপরের ডান দিকে কয়েকটা ফুটোকে আলাদা করল একটা বৃত্ত এঁকে, আরেকটা বৃত্ত আঁকল মুখের বাঁ দিকে, সবশেষে ছোট্ট একটা বৃত্ত আঁকল কপালের একমাত্র ফুটোকে ঘিরে।

এরপর গুলি ছুঁড়ে এক এক করে দুটো চোখ, নাকের ব্রীজ, উপরের ঠোঁট এবং চিবুক ফুটো করল রানা। শেষ ছয়টা গুলি দ্রুত ছুঁড়ল ও, সবগুলো মুণ্ডুর একটা পাশ লক্ষ্য করে। প্রথম তিনটে গুলি কপালের পাশ, কানের গর্ত, ঘাড় ভেদ করে গেল, পরবর্তী তিনটে ফুটো করল গাল, চোয়াল এবং খুলি। মাত্র একটা বুলেট সামান্য একটু লক্ষ্যচ্যুত হলো।

সন্তুষ্ট বোধ করছে রানা, রাইফেলটা ওকে পুরোপুরি খুশি করতে পেরেছে। পকেট থেকে বালসা-উড সিমেন্টের ছোট্ট একটা টিউব বের করল ও। টেলিস্কোপ সাইটের বর্তমান সেটিং শক্তভাবে বহাল রাখার জন্যে অ্যাডজাসটিং স্ক্রু দুটোর মাথায় খানিকটা করে তরল পদার্থ ঢেলে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসল রানা। আধঘন্টা পর আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল স্ক্রু দুটোর উপর সিমেন্ট লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল ও। শার্টের বুক পকেট থেকে এক্সপ্লোসিভ বুলেটটা বের করে রাইফেলের ব্রীচে ঢোকাল, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল তরমুজের ঠিক মাঝখানে, তারপর ট্রিগার টিপল।

সাইলেন্সারের মুখ থেকে নীলচে ধোঁয়ার শেষ রেশটুকু এঁকেবেঁকে বেরিয়ে যেতে রাইফেলটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল রানা, হেঁটে ফিরে এল ঝুলন্ত শপিং ব্যাগটার কাছে। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেছে ব্যাগটা, সেঁটে আছে গাছের গায়ে। প্রায় খালি হয়ে গেছে সেটা। বিশটা গুলি খেয়েও টুকরো টুকরো হয়নি তরমুজটা, কিন্তু শেষ বুলেটটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছে তাকে। প্রায় সবটাই গলে ছাতু হয়ে গেছে। ব্যাগের ফুটো গলে পড়ে গেছে মাটিতে। গাছের ছাল বেয়ে সড় সড় করে নামছে রস, সাথে লাল রঙের তরমুজ-বিচি। ব্যাগের তলায় আটকে আছে তরমুজের কয়েকটা মোটা বহিরাবরণ। ব্যাগটা ছুরির বাঁট থেকে নামিয়ে কাছাকাছি একটা ঝোপের ভিতর ফেলে দিল ও। ছুরিটা গাছের গা থেকে টান মেরে খুলে নিয়ে খাপে ভরে রাখল। রাইফেলের কাছে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল একটা। তারপর জায়গাটা ছেড়ে চলে এল গাড়ির কাছে।

গাড়িতে বসে রাইফেলটাকে আবার বিচ্ছিন্ন করল রানা। ফোম রাবার দিয়ে প্রতিটি পার্ট মুড়ল। সবগুলো একত্রিত করে সুতো দিয়ে বেঁধে বান্ডিলটা বুট, মোজা, শার্ট এবং স্ল্যাকসের সাথে রেখে দিল রাকস্যাকে। হাতের কাজ শেষ, এবার হামলা চালাল রানা প্যাকেট-লাঞ্চের উপর।

খাওয়া শেষ করে গাড়িতে স্টার্ট দিল ও, ফিরে এল মেন রোডে।

বিকেল ছয়টার একটু পর হোটেলে পৌঁছল রানা। রাকস্যাক নিয়ে উঠে এল নিজের কামরায়। টেলিফোনে রিসেপশনিস্টকে জানাল, ওর আর দরকার নেই গাড়িটার। ডিনারের জন্যে গোসল করার আগে একটা ঘণ্টা ব্যয় করল ও রাইফেলটার পিছনে। প্রত্যেকটি অংশ পরিষ্কার করে বিশেষ বিশেষ অংশগুলোয় তেল দিল, তারপর কেসে যথাযথভাবে ভরে নিয়ে ওয়ারড্রোবে তালাচাবির ভিতর বন্ধ করে রাখল। সেই রাতেরই অন্য এক সময় রাকস্যাক, সুতোর বল, ফোমরাবারের কিছু টুকরো বাইরের একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল ও। একুশটা ব্যবহৃত কার্ট্রিজ কেস পাক খেতে খেতে নেমে গেল মিউনিসিপ্যালিটির খালের তলায়।

রোম। পাঁচই অক্টোবর, সোমবার সকাল।

আবার রোমের মেইন পোস্ট-অফিসে এসেছে ম্যাটাপ্যান, ট্র্যাভেল এজেন্সীতে ফোন করে প্যারিস ফ্লাইটের সময়সূচী জেনে নিতে। ট্র্যাভেল এজেন্সী নিরাশ করল তাকে। আজকের ফ্লাইট একঘণ্টা আগে ছেড়ে গেছে। আজ আর কোন রোম টু প্যারিস সরাসরি ফ্লাইট নেই।...হ্যাঁ আগামীকাল অ্যালিটালিয়া এয়ারলাইন্সের একটা ফ্লাইট আছে, এগারোটা পনেরো মিনিটে ছেড়ে অরলি বিমানবন্দর নামবে দুপুরবেলা। রিটার্ন ফ্লাইট পরদিন। ভেবেচিন্তে আগামীকাল ফ্লাইটের একটা রিটার্ন টিকেট বুক করল ম্যাটাপ্যান। কমনমার্কেট-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পাসপোর্টের কোন সমস্যা না থাকায়, টিকেট বুক করতে কোন ঝক্কি পোহাতে হলো না তাকে।

পরদিন সকালে একটা সুটকেস হাতে শেষবার দেখা করল রানা বৃদ্ধ ম্যানিকিন পীসের সাথে।

'টার্গেট প্র্যাকটিস কেমন হলো!' হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের অফিসরুমে রানাকে বসিয়েই জানতে চাইল পীস।

'খুব ভাল,' বলল রানা।

ফোম রাবার দিয়ে মোড়া কয়েকটা লম্বা প্যাকেট পায়ের কাছ থেকে তুলে ডেস্কের উপর রাখল বেলজিয়ান লোকটা। মোড়ক খুলে পাতলা টিউবগুলো একটার পাশে একটা রাখছে সে, পালিশ করা ঝকঝকে ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি, দেখে মনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। রাইফেলের পার্টস ভরা কেসটা টেনে নিয়ে খুলল সেটা। একটা করে অংশ তুলে নিয়ে সেটার জন্যে তৈরি করা টিউবে ভরছে। প্রতিটি অংশ ফিট হয়ে গেল নিখুঁতভাবে।

রাইফেলের পার্টস ভরা প্রতিটি টিউব হাতে নিয়ে নাড়া দিয়ে দেখল রানা। সন্তুষ্ট হলো ও। 'নিখুঁত,' মৃদু কণ্ঠে বলল। টিউবগুলো ফোম রাবারে মুড়ে নিয়ে

প্রত্যেকটি ভরল ওর ফাইবার সুটকেসে।

'মজুরি নেবার জন্যে জেদ ধরে আপনাকে আমি অসম্মান করতে চাই না,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'কিন্তু আপনার কাজে আমি সন্তুষ্ট হয়ে সামান্য একটা জিনিস উপহার দিতে চাই।' পকেট থেকে ছোট্ট একটা সোনালী কেস বের করে টেবিলে রাখল ও।

একটু ইতস্তত করে কেসটা তুলে নিল ম্যানিকিন পীস। সেটা খুলতেই চোখমুখ উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার। হীরের একটা অত্যন্ত দামী আঙটি রয়েছে কেসে, 'মশিয়ে, এত দামী জিনিস...'

তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'দামের কথা ওঠে না। আমি আপনার গুণের মূল্য দিতে পারব না, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে এটা যদি রাখেন, আমি খুশি হব।'

'এমন দামী উপহার ফিরিয়ে দেব তেমন বোকা আমি নই,' চোখ টিপে নকল দাঁত বের করে হাসল বৃদ্ধ।

'আশা করি আপনার সাথে এটাই আমার শেষ দেখা,' বলল রানা। 'কিন্তু আবার দেখা হবে, যদি আপনি আমার নির্দেশগুলো অমান্য করেন। নির্দেশগুলোর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় মনে আছে,' তাড়াতাড়ি বলল পীস।

'আপনি ভয় পান, তা আমি চাই না,' বলল রানা। 'জানি, আপনার মত বুদ্ধিমান লোক সতর্কতা অবলম্বন না করে পারেন না। খদ্দেরদের হাতে আপনার খুন হওয়ার আশঙ্কা সব সময়ই আছে। সেজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া থাকে আপনার। আমার বেলায়ও নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেটা ঠিক কি, আমি জানি না। হয়তো কোন উকিলের কাছে সীল করা একটা চিঠি রেখে এসেছেন, আপনার মৃত্যু সংবাদ পেলে সেটা খুলবে সে। খুলে দেখবে আজকের তারিখে শুধু আমার সাথে দেখা করার কথা ছিল আপনার। খুনী হিসেবে আমাকেই সে সন্দেহ করবে। এ-ধরনের কোন না কোন সতর্কতা আপনি অবলম্বন করেছেন, সন্দেহ নেই। সেজন্যে আপনাকে খুন করলে আমার সমস্যা মিটবে না, বরং বাড়বে।'

বৃদ্ধ ম্যানিকিন পীস স্তম্ভিত হয়ে গেছে। লোকটা যাদু জানে নাকি? ভাবছে সে। একজন উকিলের কাছে সত্যিই একটা চিঠি জমা রেখে এসেছে সে, তার মৃত্যু হলে খোলা হবে সেটা। চিঠিতে পুলিসকে জানানো হয়েছে তার বাড়ির বাগানের একটা বিশেষ পাথরের নিচে ছোট্ট একটা স্টীলের বাক্স আছে, তাতে পীসের নিজের হাতে তৈরি করা একটা তালিকায় লেখা আছে প্রত্যেকদিন তার সাথে দেখা করার জন্যে কার কার আসার কথা। প্রতিদিন তালিকায় নতুন নাম সংযোজিত হয়। আজকের তারিখে পীস লিখেছে: একজন ইংরেজ দেখা করতে আসবে, ভিনসেন্ট গগালের বন্ধু, প্রায় ছয় ফিট লম্বা, নিজের পরিচয় দেয় অর্ক্যান নামে।

'কিন্তু,' বলছে রানা, 'আমার সম্পর্কে কোন কথা কাউকে যদি বলেন, খবর পাব আমি, এবং ফিরে আসব। যত সাবধানই হোন, আপনি আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না। মনে রাখবেন, আমি চলে যাবার সাথে সাথে আমার অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে আপনাকে।'

স্মিত হাসল বৃদ্ধ পীস। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মশিয়ে, আমি শুধু একটা কথাই বলতে

চাই। তা হলো, আমার তরফ থেকে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

'ধন্যবাদ,' বলে আর দাঁড়াল না রানা। ফাইবার সুটকেসটা ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

পীসের অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা মেন লাইন রেলওয়ে স্টেশনে চলে এল রানা, লেফট-লাগেজ অফিসে সুটকেসটা জমা দিয়ে টিকেট চেয়ে নিল, টিকেটটা ওয়ালেটের ভিতরের পকেটে আটকে রাখল পিন দিয়ে।

মৃদু স্বস্তির পরশ অনুভব করছে রানা। ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে ছুটোছুটি করে পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি পর্যায়ের কাজ শেষ করেছে ও। রাজসিক রেস্তোরাঁ সাইন-এ মধ্যাহ্ন ভোজন সারল ও। হেঁটে ফিরে এল অ্যামিগো হোটেলে। ফিরেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল, মিটিয়ে দিল বিল। যেভাবে উঠেছিল হোটেলে ঠিক সেইভাবে বেরিয়ে এল ও—পরনে নিখুঁতভাবে ফিট করা চেক শার্ট, চোখে গাঢ় রঙের চশমা, পিছনে পোর্টারের হাতে দামী দুটো সুটকেস।

রাইফেলটা নিরাপদে রেখে যাচ্ছে ও লেফট-লাগেজ অফিসে। জাল পরিচয়পত্র তিনটে ওর স্যুটের একটা ভিতরের পকেটে রয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছল ঠিক সময় মতই। লন্ডনগামী বোয়িং ব্রাসেলস ছাড়ল চারটের একটু পর। কাস্টমস অফিসাররা ওর একটা সুটকেস বেশ খুঁটিয়ে খুঁজে পেতে দেখল বটে, কিন্তু পেল না কিছুই। ডিনারে বেরোবার আগে সন্ধ্যা সাতটায় প্যাডিংটন প্যারেডে নিজের বাড়িতে শাওয়ার সারছে রানা।

নয়

মঙ্গলবার।

ঠিক এগারোটার সময় প্যারিসগামী বিমানে উঠে বসল বিশালদেহী ম্যাটাপ্যান। অবজারভেশন টেরেস থেকে কর্নেল বোল্যান্ডের দু'জন এজেন্ট ম্যাটাপ্যানকে প্লেনের পেটের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। প্লেন আকাশে উঠল ঠিক এগারোটা পনেরো মিনিটে। লোক দু'জন মেন হলরূমে নেমে এসে একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল। রোমের স্থানীয় একটা নাম্বারে ডায়াল করছে একজন, আরেকজন বুদের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

অপর প্রান্তের লোকটা নিজের পরিচয় দিল না। শুধু জানতে চাইল, 'এয়ারপোর্ট থেকে?'

কর্নেল বোল্যান্ডের এজেন্ট বলল, 'হ্যাঁ। রওনা হয়েছে ও। আলিটালিয়া ফোর-ফাইভ-ওয়ান। ল্যান্ডিং অরলি অ্যাট টুয়েলভ-টেন।'

দশ মিনিটের মধ্যে মেসেজটা পৌঁছে গেল প্যারিসে।

বাইরে বেরনো দায় ম্যাটাপ্যানের, চিড়িয়াখানার জীব মনে করে সবাই বিদঘুটে কৌতূহল দেখাতে শুরু করে। বিশেষ করে মেয়েদের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে সে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। এয়ারহোস্টেস মেয়েটা ওর কাছে প্রতি

এক মিনিট অন্তর আসছে, হাসছে, পাশের খালি সীটে বসে পড়ছে। চোখ, মুখ, কণ্ঠ, ভুরু, ঠোঁট—ভাব প্রকাশের এই পাঁচটা মাধ্যমকেই কাজে লাগাতে চাইছে মেয়েটা, 'কিছু লাগবে না আমার,' কর্কশ গলায় কথাটা বলে তাকে একটু ভয় পাইয়ে দিল ম্যাটাপ্যান।

পুরুষরা কেউ প্রেম নিবেদন করতে এল না, কিন্তু তাজ্জব হয়ে প্রকাণ্ড গরিলাটাকে দেখছে তো দেখছেই, চোখের আশ আর তাদের মেটে না।

নির্দিষ্ট সময়ে এয়ারপোর্টে নেমে টার্মিন্যাল ভবনের সামনে থামল প্লেন। আরোহীরা টারমাক পেরিয়ে কাঁচের একটা দরজা দিয়ে একটা টিন শেডে ঢুকছে। শেডের মাঝখানে মুখোমুখি বসে আছে দু'জন পুলিস অফিসার। সাদা পোশাক পরা এক টেকো লোক অগ্রসরমান আরোহীদের দিকে চোখ রেখে একজন পুলিস অফিসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'আসছে গরিলা। কালো বেরেট পরে।' এই মেসেজ আরও লোককে দিতে হবে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শান্ত ভঙ্গিতে চলে গেল টেকো।

অফিসাররা ফ্রেঞ্চ সিকিউরিটি পুলিসের লোক। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে এদের কাঁধে। বিদেশী আগন্তুক এবং ফেরত আসা দেশবাসীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা সেই দায়িত্বেরই একটা অংশ বিশেষ। দু'জন অফিসারের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাটাপ্যান। কেউই ভাল করে তাকাল না তার দিকে। ম্যাটাপ্যানের হলুদ ডিজএম্বারকেশন কার্ডে ঘটাং করে সীল মারল একজন অফিসার, অপরজন আইডেনটিটি কার্ডে নাম মাত্র চোখ বুলিয়ে ঘাড় নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল তাকে।

এগিয়ে গিয়ে কাস্টমস অফিসারদের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাটাপ্যান। টেকো লোকটা এইমাত্র কয়েকজন অফিসারের সাথে ফিস ফিস করে কথা বলে দূরে সরে গেছে।

সাথে লুকানো রিভলভার আছে, সেজন্যে একটু অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাটাপ্যান। জিনিসটা বোধহয় নিয়ে আসা উচিত হয়নি। নিয়ে আসার ইচ্ছাও তার ছিল না। কিন্তু অভ্যাসবশত বেরোবার আগে শোল্ডার হোলস্টারে ভরে নিয়েছিল, খেয়ালই করেনি। ভুলটা ধরা পড়েছিল প্লেনে চড়ার পর। তখন কিছু করার ছিল না।

ভাগ্যটা ভাল, ভাবল ম্যাটাপ্যান। কাস্টমসের লোকরা ওর প্রকাণ্ড শরীর দেখে এমন মুগ্ধ হলো যে ওকে চেক করার কোন চেষ্টাই করল না।

এয়ারফ্রান্সের বাসে চড়ে শহরের মাঝখানে এসে নামল ম্যাটাপ্যান। একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে চড়ে বসে ভিক্টর কাউলাস্কির দেয়া ঠিকানাটা বলল ড্রাইভারকে।

মেইন রোড লা লিবারেশন থেকে দু'বার বাঁ দিকে মোড় নিয়ে একটা সরু গলির মুখে এসে থামল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গলিতে ঢুকল ম্যাটাপ্যান। খানিকদূর এগিয়ে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দাঁড়াল ও। কাউলাস্কির দেয়া ঠিকানা মিলে যাচ্ছে। ফ্ল্যাটবাড়িটা নতুন। দরজা পেরিয়ে লম্বা একটা হলরূমে ঢুকল ম্যাটাপ্যান। এক পাশে লিফট, আরেক পাশে সিঁড়ি। দরজার কাছে দেয়ালে দুই

সারি লেটারবক্স। ভিক্টর কাউলাস্কির নাম লেখা লেটার বক্সটাও দেখতে পেল ম্যাটাপ্যান। তিন তলার তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে কাউলাস্কি ফ্যামিলি। সিঁড়ির দিকে এগোল ম্যাটাপ্যান।

ভ্যালেন্টিনাকে কেমন অবস্থায় দেখবে ভাবতে গিয়ে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুকটা। ইতোমধ্যেই মেয়েটা···অলক্ষুণে কথাটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল ম্যাটাপ্যান।

তিন তলায় উঠে সরু একটা প্যাসেজে ঢুকল সে। নাক বরাবর একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাটাপ্যান। এটাই তেইশ নম্বর ফ্ল্যাট। আর সব দরজার মতই এটারও গায়ে একটা কলিংবেলের বোতাম, তার নিচে ভাড়াটের নাম লেখা টাইপ করা একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। কাউলাস্কির এই ফ্ল্যাট প্যাসেজের শেষ মাথায়। ম্যাটাপ্যানের দু'পাশে আরও দুটো ফ্ল্যাটের দরজা রয়েছে, বাইশ এবং চব্বিশ নম্বর। কলিংবেল বাজাল ও।

ওর সামনের দরজাটা এক পলকে ছয় সাত ইঞ্চি খুলে গেল। লোহার একটা রড বিদ্যুৎবেগে নেমে এল ফাঁকটার উপর থেকে ম্যাটাপ্যানের মাথার দিকে।

প্রস্তুত ছিল না ম্যাটাপ্যান, কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি সাহায্য করল তাকে। চমকে উঠে মাথাটা পিছিয়ে নিতে গেল সে। পুরোপুরি সফল হলো না। লোহার রডটা কপালের হাড়ে লেগে পিছলে নেমে এল পুরু চামড়া সাথে নিয়ে। ম্যাটাপ্যানের দু'দিকের দরজা দুটো নিঃশব্দে খুলে গেছে এরই মধ্যে। লোকজন বেরিয়ে আসছে। পুরো চেহারা নিয়ে বিপদটা উদয় হতে সময় নিল মাত্র আধ সেকেন্ড। কিন্তু ম্যাটাপ্যানের জন্যে এই আধ সেকেন্ডই যথেষ্ট। বুদ্ধির ঘাটতি থাকতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের সমস্ত কৌশল রপ্ত আছে তার।

বিপদটা দেখার মুহূর্তেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল ম্যাটাপ্যান। প্যাসেজটা সংকীর্ণ। তার গায়ে যত শক্তিই থাকুক, নড়াচড়ার জায়গা না পেলে কিছুই সে করতে পারবে না। কপালের লম্বা ক্ষতটা থেকে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে দুই চোখে, তবু দু'পাশের দরজা দিয়ে দু'জন করে লোক বেরিয়ে আসছে, দেখতে ভুল করেনি সে। সামনের দরজায় রয়েছে আরও দু'জন লোক। চিন্তাভাবনার জন্যে কোন সময় না নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সামনের দিকে আধ খোলা দরজার উপর।

কপালে কবাটের ধাক্কা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল একজন লোক, ছিটকে ঘরের মাঝখানে গিয়ে পড়ল সে। দরজার কবাট দুটো প্রচণ্ড শব্দে বাড়ি খেল দু'পাশের দেয়ালে। পিছন থেকে বিদ্যুৎবেগে কয়েকটা হাত এগিয়ে এল ম্যাটাপ্যানের জ্যাকেট ধরার জন্যে। একটা হাত জ্যাকেটটাকে স্পর্শও করল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। প্রচণ্ড দমকা বাতাসের মত,হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল ম্যাটাপ্যান। এক সেকেন্ড আগে তার সামনে থেকে সরে যেতে পেরেছে ঘরের দ্বিতীয় লোকটা।

ঘরে ঢুকেই একটানে শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাটাপ্যান, গুলি করল দরজার দিকে। নল থেকে বুলেট বেরিয়ে যাবে, ঠিক এই সময় ঘরের দ্বিতীয় লোকটা ম্যাটাপ্যানের রিভলভার ধরা হাতের কব্জিতে

লোহার রডের একটা প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিল। ঝাঁকি খেয়ে নিচু হয়ে গেল রিভলভারের নল। ঘরে যারা ঢুকছে তাদের মধ্যে সবার আগে রয়েছে যে লোকটা তার হাঁটুতে গিয়ে লাগল গুলি। ঝাঁকি খেয়ে কোমর বাঁকা হয়ে গেল লোকটার, দু'হাত দিয়ে ধরতে গেল গুঁড়িয়ে যাওয়া হাঁটুটা, কিন্তু ধরতে পারেনি—পড়ে যাচ্ছে হুমড়ি খেয়ে।

এখনও মেঝেতে পড়েনি লোকটা। তাকে পাশ কাটিয়ে ম্যাটাপ্যানের দিকে ছুটে আসছে তিনজন লোক। আবার গুলি করার জন্যে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছে ম্যাটাপ্যান, এই সময় রিভলভার ধরা হাতের কব্জিতে লোহার রডের দ্বিতীয় বাড়িটা এসে লাগল। হাতের রিভলভারটা ছিটকে পড়ে যেতে হকচকিয়ে গেল ম্যাটাপ্যান। মুহূর্তে পাঁচজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর।

একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজনের লড়াইটা ঝাড়া তিন মিনিট স্থায়ী হলো। লড়ল আসলে একা ম্যাটাপ্যান, বাকি সবাই সারাক্ষণ আত্মরক্ষার জন্যে ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াল, এবং সুযোগ পেলেই সাইকেলের চেন, লোহার রড, এবং সেই সাথে অবিরাম ঘুষি ও লাথির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা করতে লাগল। এই তিন মিনিটে সম্পূর্ণ বদলে গেল ম্যাটাপ্যানের চেহারা। মুখে ছয়টা গুরুতর ক্ষতের সৃষ্টি হলো তার। একটা কান ছিঁড়ে গেছে, সামান্য একটু চামড়ায় আটকে ঝুলছে সেটা। নাকটা ভেঙে গেছে। কপালের মাঝখানে এবং এক পাশের ক্ষত দুটো থেকে অনবরত রক্ত গড়াচ্ছে। বাম চোখের নিচে থেকে চোয়াল পর্যন্ত মাংস কেটে বসে গেছে সাইকেলের চেনের দাগ। নিচের ঠোঁটটা মাঝখান থেকে দু'ফাঁক হয়ে গেছে, সেই সাথে সামনের দুটো দাঁত ঝরে পড়ে গেছে মেঝেতে।

চামড়ার তৈরি বালি ভর্তি ব্যাগের আঘাতগুলো মাথায় কোন ক্ষতের সৃষ্টি করেনি বটে, কিন্তু এই আঘাতগুলোই সবচেয়ে বেশি কাহিল করল ম্যাটাপ্যানকে। শরীরের এখানে সেখানে গোটা পঞ্চাশ রক্তাক্ত ক্ষত নিয়েও বীরবিক্রমে লড়ল সে। চোখের পলকে, বিদ্যুৎ গতিতে ঘরময় ধাওয়া করে বেড়াল সে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে। দু'বারই একটুর জন্যে রিভলভারটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে গিয়েও পারল না সে। লাথি মেরে প্রতিপক্ষরা সরিয়ে দিল রিভলভারটা তার নাগালের বাইরে। শেষ পর্যন্ত উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে যখন জ্ঞান হারাল সে, তখন প্রতিপক্ষদের মাত্র দু'জন পায়ের উপর ভর দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি চারজনের একজন শেষ, দ্বিতীয়জন প্রায় শেষ, বাঁচার কোন আশাই নেই তার—ম্যাটাপ্যান এক হাতে তার গলা আঁকড়ে ধরে মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে কণ্ঠনালী টেনে ছিঁড়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। সুবিধে হচ্ছে না দেখে লোকটাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর একটা পা রেখে দাঁড়িয়ে ছিল সে। মট্ মট্ করে এক পাশের প্রায় সব ক'টা পাঁজরের হাড় দু'টুকরো হয়ে গেছে তার। তৃতীয়জন হাঁটুতে গুলি খেয়ে অচল হয়ে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, ব্যথায় ককাচ্ছে। চতুর্থ লোকটার জ্ঞান নেই—দেয়ালের সাথে ঠুকে দিয়ে তার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে ম্যাটাপ্যান।

হাত-পা ছড়িয়ে ঘরের মেঝেতে নিঃসাড় পড়ে আছে ম্যাটাপ্যান। ক্ষতস্থানগুলো থেকে মন্থর বেগে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে মরেনি, এখনও বেঁচে আছে সে।

কর্নেল বোল্যান্ডের অ্যাকশন সার্ভিসের দু'জন লোক দ্রুত পরীক্ষা করল ম্যাটাপ্যানকে। বেঁচে আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই। পরস্পরের দিকে মুখ তুলে তাকাল তারা। কথা হলো না, দু'জনেই এখনও হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, কিন্তু একজন আরেকজনের উদ্বেগের হেতু পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল ইটালিয়ান গরিলাটার জ্ঞান আর কখনও ফিরবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের।

দলনেতা লোকটা উঠে দাঁড়াল দ্রুত। টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকল সে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ক্র্যাডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে স্থানীয় একটা নাম্বারে ডায়াল করল সে, বলল, '…হ্যাঁ, কাবু করা গেছে। …লড়েছে? একজনকে খুন করেছে ও। আরেকজন বাঁচবে না। আরও দু'জনের অবস্থা সাংঘাতিক গুরুতর। বাকি আমাদের দু'জনের অবস্থাও খুব ভাল নয়।' দম নেবার জন্যে থামল লোকটা। '…কি? হ্যাঁ, ইটালিয়ান বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রাখার অর্ডার দিয়েই তো সর্বনাশ করা হয়েছে, তা নাহলে…হ্যাঁ, জখম করতে হয়েছে বৈকি…শোনো, সালাদের ঝুড়ি (পুলিস ভ্যান) দরকার নেই আমাদের, দরকার একজোড়া অ্যাম্বুলেন্স। কুইক।' খটাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

পনেরো মিনিট পর একজন ডাক্তারসহ দুটো অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। ইতোমধ্যে হাত-পা বাঁধা হয়ে গেছে ম্যাটাপ্যানের। ডাক্তার পাঁচ মিনিট ধরে পরীক্ষা করল ওকে। বিহ্বলতা ফুটে উঠল তার চেহারায়। ম্যাটাপ্যানকে একটা ইঞ্জেকশন দিল। ইতোমধ্যে নিহত এবং আহতদেরকে স্ট্রেচারে তুলে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ম্যাটাপ্যানের হাতের মাংস থেকে সূচটা টেনে বের করে নিয়ে দলনেতার দিকে তাকাল ডাক্তার। 'আমার কোন কেরামতিই এর ক্ষেত্রে খাটবে না। এখানে কিছুই করতে পারব না আমি। এক্ষুণি একে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।'

দলনেতা অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদেরকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত দিল।

অজ্ঞান ম্যাটাপ্যানকে স্ট্রেচারে তুলে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, তার সাথে নেমে গেল ডাক্তারও। প্যাসেজে বেরিয়ে এসে দলনেতার সাথে যোগ দিল তার সহকারী। 'ভাগ্যিস গোটা ফ্ল্যাটটা খালি করে নিয়েছিলাম, তা নাহলে ভাবতে পারো…'

কর্কশ গলায় দলনেতা বলল, 'কে চায় ভাবতে? লোকাল অফিসকে ফোন করে লোক পাঠাতে বলো। এটা ওদের ফ্লোর, সাফ সুতরো ওরাই যা করার করবে।'

প্যারিসের বাইরে প্রাচীন এক দুর্গ। মিলিটারি ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে দুর্গটাকে। দুর্গের নিচে আলাদা একটা জগৎ তৈরি করেছে অ্যাকশন সার্ভিস। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে হুমকি বলে মনে করা হয় যাদেরকে, তাদের আটক করে রাখা হয় এখানে। বিশেষ ধরনের একটা জেলখানা এটা। জেলখানাটা আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা। নির্দিষ্ট একটা অংশে অ্যাকশন সার্ভিসের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ডিভিশনের কর্মকর্তাদেরও প্রবেশাধিকার নেই, এমন কি জেলখানার ডাক্তারদেরও

ওদিকে পা বাড়ানো নিষেধ।

সেদিনেরই দু'ঘণ্টা পরের ঘটনা। দুর্গের নিচের একটা নোংরা, ভিজে চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা কামরা। প্রস্রাব, ঘাম আর কারবোলিক অ্যাসিডের তীব্র গন্ধ বাতাসে। সরু একটা লোহার কটে শুয়ে আছে ম্যাটাপ্যান। কটের পায়াগুলো কংক্রিটের মেঝের ভিতর ঢোকানো। মোটা চটের একটা বিছানা, ভাঁজ করা তেল চিটচিটে একটা চাদর ছাড়া কটের উপর কিছু নেই। ম্যাটাপ্যানের দুই পায়ের গোড়ালি কটের দুটো পায়ার সাথে লেদার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। উরু এবং হাতের কব্জি দুটোয় দু'জোড়া স্ট্র্যাপ দেখা যাচ্ছে, আরেকটা দেখা যাচ্ছে বুকের সাথে বাঁধা। এখনও জ্ঞান ফেরেনি তার, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর ও অনিয়মিত ভাবে চালু আছে।

মুখ এবং শরীর থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলা হয়েছে। ক্ষতগুলোর কোনটায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, কোনটায় প্লাস্টার সাঁটা হয়েছে।

সাদা কোট পরা লোকটা একজন ডাক্তার। প্রায় একঘণ্টা ধরে ম্যাটাপ্যানকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল সে। নিঃশব্দে অনুসরণ করল দীর্ঘদেহী, সুবেশ এক লোককে, কামরা থেকে বেরিয়ে এল করিডরে। দীর্ঘদেহী কর্নেল বোল্যান্ড ঘুরে দাঁড়াল, মুখোমুখি হলো ডাক্তারের।

'কিসের সাথে ধাক্কা খেয়েছে বলুন তো লোকটা?' ডাক্তারই কথা বলছে প্রথম। 'ট্রেনের সাথে নয়তো?' তার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ফুটে উঠল।

গায়ে মাখল না কর্নেল। হাতের জ্বলন্ত সিগারের ডগায় চোখ রেখে বলল, 'লোকটাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমি, ডাক্তার।'

'এই অবস্থায়?' আঁতকে উঠল ডাক্তার। 'আপনি পাগল হয়েছেন, স্যার? ডান কব্জির হাড় ফেটে গেছে, বাম কান ফেলে দিয়েছি কেটে, নাক ভেঙে গেছে, কপালের হাড়ে চিড় ধরেছে, শরীরে তিপ্পান্নটা ক্ষত, স্লাইট ইন্টারন্যাল হেমোরেজিং, যার পরিণতি গুরুতর আকার ধারণ করে ওর মৃত্যু ঘটাতে পারে, অথবা আপনাআপনি রক্তপাত বন্ধ হয়ে যেতে পারে—সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা ওর মাথাটাকে নিয়ে। প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছে মগজ, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। খুলিটা ফাটেনি, তার একমাত্র কারণ সম্ভবত ওটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি—আপনার লোকজনের কোন কৃতিত্ব নেই এতে। যাই হোক, এই অবস্থায় আপনি ওকে প্রশ্ন করতে পারবেন বলে মনে করলে ভুল করবেন কর্নেল...' স্পষ্টবাদী ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাল।

মুখ তুলে তাকাল কর্নেল বোল্যান্ড। 'জ্ঞান ফিরবে কখন?'

'বলা সম্ভব নয়। আগামীকালও ফিরতে পারে, দু'চারদিন নাও ফিরতে পারে। জ্ঞান ফিরলেও সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় পাবেন না ওকে—মেডিক্যালি ফিটনেস আসতে কমপক্ষে দিন পনেরো লাগবে, যদি কংকাশনটা হালকা টাইপের হয়।'

'ওষুধপত্রের সাহায্যে কিছু করা যেতে পারে,' মৃদু কণ্ঠে বলল কর্নেল বোল্যান্ড।

'যেতে পারে। সে-ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু আমি ব্যবহার করি না। আপনি হয়তো অন্য কোন ডাক্তারকে দিয়ে ওসব প্রয়োগ করাবেন, কিন্তু তাতে

ক্ষতি হবার ষোলোআনা আশঙ্কা থাকবে। ওষুধ প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে কথা বলাতে পারবেন ওকে, কিন্তু কথাগুলো হবে সম্ভবত প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত রোগীর আবোলতাবোল প্রলাপের মত। ওর ব্রেনের ভিতরটা প্যাঁচ খেয়ে গেছে, লেজে-গোবরে জড়িয়ে গেছে—ভবিষ্যতে কখনও পরিষ্কার হতেও পারে, নাও পারে। তাছাড়া, ওষুধ ব্যবহার কার ওপর করবেন? আগে হুঁশ তো ফিরুক, বলা যায় না, জ্ঞান ফিরতেই হয়তো এক হপ্তার বেশি লেগে যাবে ওর।'

'হুঁ।'

কিন্তু ডাক্তারের অনুমান ঠিক হয়নি। নানান ধরনের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করায় তিনদিন পর চোখ মেলল ম্যাটাপ্যান। সেদিন অক্টোবর মাসের দশ তারিখ। সেদিনই প্রথম এবং শেষবারের মত অ্যাকশন সার্ভিসের প্রশ্নকর্তাদের সম্মুখীন হতে হলো তাকে।

ফ্রান্স মিশনে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুতি পর্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে রানা। ব্রাসেলস থেকে লন্ডনে ফিরে এসে তিনটে দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওর। আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যানের নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পকেটস্থ করে অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের হেডকোয়ার্টার ফানাম হাউজে এল ও, এখান থেকে সংগ্রহ করল একই নামে একটা ইন্টারন্যাশন্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স।

একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকান থেকে দুটো লেদার সুটকেস কিনল ও। একটা সুটকেসে পাদ্রীর পোশাক পরিচ্ছদ ভরল, প্রয়োজনে কোপেনহেগেনের ধর্মযাজক বেনসনের ছদ্মবেশ নেবার জন্যে। সুটকেসে কাপড়চোপড় তোলার আগে কোপেনহেগেন থেকে কেনা সাধারণ তিনটে শার্ট থেকে প্রস্তুতকারক কোম্পানীর লেবেল তুলে নিয়ে লন্ডনে কেনা ক্ল্যারিকাল শার্ট, ডগ কলার এবং কালো বিবে লাগিয়ে নিল। ওই তিনটে কাপড় থেকে লন্ডনের প্রস্তুতকারক কোম্পানীর লেবেল আগেই সরিয়ে ফেলেছে ও। একই সুটকেসে জায়গা করে নিল মার্কিন ছাত্র স্মার্টি টোয়েনের স্নেকার্স, মোজা, জিনস, সুইট-শার্ট এবং উইন্ডচিটার। সুটকেসের লাইনিং চিরে চামড়ার দুটো পর্দার মাঝখানে লুকিয়ে রাখল দুই বিদেশী পাসপোর্ট, অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো এদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে হবে ওকে। কাপড়-চোপড়ে ঠাসা এই সুটকেসটায় এরপর তোলা হলো ফ্রেঞ্চ ক্যাথেড্রালস সম্পর্কে লেখা ডেনিশ বই, দুই সেট চশমা—একটা ডেনিশ পাদ্রীর, অপরটা মার্কিন ছাত্রের—টিসু পেপারে সযত্নে মোড়া দুই ধরনের কন্ট্যাক্ট লেন্স এবং চুল রাঙাবার প্রয়োজনীয় কেমিকেলস্।

প্যারিসের ফ্রিয়া মার্কেট থেকে কেনা ফ্রান্সের তৈরি জুতো, মোজা, শার্ট এবং ট্রাউজার ঢুকল দ্বিতীয় সুটকেসে, সাথে থাকল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গ্রেট কোট এবং কালো বেরেট। লাইনিং চিরে ভিতরে ঢুকে গেল মধ্য বয়স্ক ফ্রেঞ্চবাসী মার্ক রোডিনের জাল পরিচয়পত্রগুলো। সুটকেসটার কিছুটা অংশ খালি রাখল রানা, অচিরেই এতে জায়গা দিতে হবে গোটা একটা স্নাইপার'স রাইফেল এবং অ্যামুনিশন ভর্তি কয়েক খণ্ড স্টীল টিউবকে।

তৃতীয় আরেকটা, একটু ছোট সুটকেসে আলেকজান্ডার অরগ্যানের জুতো,

আন্ডারওয়্যার, শার্ট, টাই, রুমাল এবং তিনটে কমপ্লিট স্যুট ভরা হলো। এটার লাইনিঙের ভিতর লুকিয়ে রাখা হলো একশো পাউন্ড নোটের মোটাতাজা একটা তাড়া। ব্রাসেলস থেকে ফিরে ওর ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার পাউন্ড তুলেছে রানা।

তিনটে সুটকেসে তালা লাগিয়ে চাবিগুলো রিঙে গলিয়ে রাখল ও। ডাভ-গ্রে রঙের স্যুটটা পরিষ্কার করে ইস্ত্রী করা হয়েছে, দেয়াল আলমারিতে একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলছে সেটা। ওটার বুক পকেটে রয়েছে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং পাঁচ ও দশ পাউন্ডের দুটো তাড়া, মোট পাঁচশো পাউন্ড।

ছোট্ট একটা হাতব্যাগে খুঁটিনাটি কিছু জিনিস, দাড়ি কামাবার যন্ত্র, পাজামা, স্পঞ্জের ব্যাগ ও তোয়ালে, এবং সবশেষে কেনা মিহি সুতো দিয়ে বোনা হালকা একটা হারনেস, দু'পাউন্ড ওজনের প্লাস্টার অভ প্যারিসের একটা ব্যাগ, কয়েক প্যাকেট ব্যান্ডেজ, আধডজন আঠা লাগানো প্লাস্টার রোল, তিন প্যাকেট কটন উল, একখানা ছোট কাঁচি ইত্যাদি ভরে নিল রানা।

প্রস্তুতি পর্বের সমস্ত কাজ শেষ। এখন টেলিফোন নাম্বার লেখা ছোট্ট একটা চিরকুটের জন্যে অপেক্ষা শুধু। ওটা এসে পৌঁছলেই আসল কাজে বেরিয়ে পড়তে পারে রানা।

অক্টোবরের নয় তারিখে অপেক্ষার অবসান ঘটল। ঢাকা থেকে এসেছে চিঠিটা। তাতে টাইপ করা একটা মাত্র লাইন, 'পারুর সাথে Molitor 5900-তে যোগাযোগ করো, দসুমা নারা। গুড লাক।'

দসুমা নারা ওরফে মাসুদ রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে পারু বলতে রূপাকে বোঝানো হচ্ছে।

দেরি না করে সকালেই টেলিফোন যোগে এয়ার প্যাসেজ বুকিংয়ের কাজটা সেরে ফেলল রানা। আগামীকাল বারোই অক্টোবর। সকালের ফ্লাইটে রওনা হয়ে যাচ্ছে ও।

প্যারিস। মাটির নিচে জেলখানার একটা সেল। একটা টেবিলের একধারে বসে আছে পাঁচজন লোক। টেবিলের সামনে ওক কাঠের ভারী একটা চেয়ার। চেয়ারের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ডদেহী ম্যাটাপ্যানকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়। মাথাটা অস্বাভাবিক নিচু হয়ে আছে তার, বুক ছুঁয়ে আছে চিবুক। দীর্ঘ, ভারী নিঃশ্বাসের সাথে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলার ভিতর থেকে। সেলের ভিতর আর কোন শব্দ নেই।

টেবিলের বাঁ দিকের কিনারায় ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে একটা টেবিল-ল্যাম্প। পাঁচশো পাওয়ারের অত্যুজ্জ্বল একটা বালব জ্বলছে। শেড দিয়ে ঢাকা ল্যাম্পের আলো টেবিলের সামনে ছয় ফিট দূরে চেয়ারের উপর গোল হয়ে পড়েছে, সেলের বাকি অংশে আলো নেই। আলোর বড়সড় বৃত্তের কিনারা এখানে সেখানে ছুঁয়ে আছে টেবিলটাকে। টেবিলে পড়ে থাকা একজনের কয়েকটা আঙুল, একজনের কব্জিসহ হাত, আরেকজনের আঙুলের ফাঁকে ধরা জলন্ত সিগারেট দেখা

যাচ্ছে, পাক খেতে খেতে সিলিংয়ের দিকে উঠে যাচ্ছে চিকন নীলচে ধোঁয়া।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল ম্যাটাপ্যান। চোখ দুটো প্রায় বুজে আছে, কুঁচকে আছে দু'চোখের চারপাশের চামড়া। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তার। টেবিলের খানিকটা দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু টেবিলের ওদিকে বসা লোকদের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

আবছা ভাবে মনে পড়ছে তার, ধরাধরি করে এই প্রকাণ্ড চেয়ারটায় তুলে দেয়া হয়েছে তাকে। চেয়ারের পায়াগুলো কংক্রিটের মেঝের সাথে স্থায়ীভাবে আটকানো। দুটো পায়ার সাথে তার পা দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে স্ট্র্যাপ দিয়ে। স্ট্র্যাপগুলো শক্ত চামড়া দিয়ে তৈরি, কিন্তু ভিতর দিকে তুলোর স্তর সাঁটা আছে। টান টান করে বাঁধা হলেও কোন রকম ব্যথা এখনও বোধ করছে না ম্যাটাপ্যান। শরীরটা হালকা তুলোর মত লাগছে তার। কোথাও কোন বেদনা নেই। বুঝতে পারছে সে, ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তীব্র, অসহ্য ব্যথাগুলোকে। ওষুধের প্রভাব শেষ হলেই আবার শুরু হবে সারা শরীর জুড়ে নির্দয় কামড়াকামড়ি।

চেয়ারটার দুই হাতলের সাথে ম্যাটাপ্যানের কব্জি দুটো স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা রয়েছে। আরেকটা স্ট্র্যাপ কোমরে আটকানো। তার বিশাল, লোমশ বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা হয়েছে শেষ স্ট্র্যাপটা। সবগুলো স্ট্র্যাপ ভিজে গেছে ঘামে।

কয়েক জোড়া দীর্ঘ, পেশীবহুল, লোমশ হাত এবং একটা যন্ত্র ছাড়া টেবিলটা খালি। যন্ত্রটা ছয় ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া। চার পাশে চকচকে পিতলের উঁচু কিনারা, মাঝখানটা গভীর। ভিতর থেকে পিতলের দু'ইঞ্চি লম্বা একটা আঙুল উঠে এসেছে, মাথায় প্লাসটিকের একটা সাদা নব। আঙুলটার পাশে একটা সুইচ, অফ এবং অন করার জন্যে। যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য বরাবর চিকন মাছের কাঁটার মত অসংখ্য খুদে সরল রেখা টানা রয়েছে, তার নিচে লেখা রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যা। সব শেষের চেয়ারে বসা লোকটার ফর্সা, লোমশ হাত পড়ে আছে যন্ত্রের কন্ট্রোলের কাছে, অলস ভঙ্গিতে ঠক্-ঠক্ করে মৃদু টোকা মারল সে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে।

সুইচ এবং কারেন্ট কন্ট্রোল থেকে দুটো তার বেরিয়ে এসে টেবিলের তলা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকেছে অদূরবর্তী ছোট একটা ইলেকট্রিক্যাল ট্র্যান্সফরমারে। সেটা থেকে কালো শক্ত রাবারে মোড়া একটা তার বেরিয়ে এসেছে, চেয়ারে বসা পাঁচজন লোকের পিছন দিকের দেয়ালে ফিট করা সকেটটার ভিতর গিয়ে ঢুকেছে।

সেলের দূর প্রান্তে ছোট্ট একটা টেবিল সামনে নিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছে আরেক লোক। তার সামনে একটা টেপ-রেকর্ডার। সবুজ রঙের 'অন' লেখা ছোট্ট আলোটা জ্বলছে, কিন্তু স্পুলগুলো এখনও অচল।

সেলের ভিতর ভাপসা গরম। ঘাম, ধোঁয়া, বমি আর ধাতব পদার্থের উৎকট গন্ধ বাতাসে।

মাঝখানের চেয়ারে বসা লোকটা হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল। কণ্ঠস্বর শান্ত, মার্জিত কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট এবং সুরটা দৃঢ়।

'মুখ খোলো, ম্যাটাপ্যান। যা জানো সব বলো।'

এক চুল নড়ছে না ম্যাটাপ্যান।

বক্তা একটু হাসল। 'তুমি আশ্চর্য এক সাহসী লোক, আমরা জানি,

ম্যাটাপ্যান। সেজন্যে তোমার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ব্যথা সহ্য করারও তো একটা সীমা আছে, তাই না? কি দরকার নিজেকে খামোকা কষ্ট দিয়ে? তারচেয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও, বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। সেটাই তো ভাল হবে তোমার জন্যে। কি বলো?'

দাঁতে দাঁত চেপে অনড় বসে আছে ম্যাটাপ্যান। মুখ তুলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করছে না। তীব্র আলোয় মুক্তোর মত ঝিকমিক করছে তার কপালের অসংখ্য ঘামের ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো। আগের চেয়ে ঘন ঘন ওঠা নামা করছে তার বুক, ভারী শব্দ হচ্ছে নিঃশ্বাস পতনের।

'তুমি তো জানো,' ঘরোয়া, খোশ-আলাপের সুরে মৃদু গলায় আবার কথা বলছে লোকটা, 'আমরা অ্যাকশন সার্ভিসের ডানপিটে কর্সিকান। একবার যখন আমাদের হাতে পড়েছ, তোমার আর কোন আশা নেই। সব রহস্য ফাঁস করে দাও, দেখবে, কত ভালবাসব তোমাকে আমরা।' একটু বিরতি নিল বক্তা, তারপর আচমকা প্রশ্ন করতে শুরু করল, 'আগস্টের শেষ ক'টা দিন কে ছিল তোমাদের সাথে, ম্যাটাপ্যান? কাকে পাহারা দিচ্ছিলে তোমরা? কোথায় গেছে সে? কোথায় আছে সে এখন? বলো, ভাই! সব কথা বলে নিজেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো। প্লীজ!' শেষ দিকে আবেদনের সুর ফুটে উঠল লোকটার কণ্ঠস্বরে, কিন্তু তা হাস্যকর শোনাল না মোটেও।

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ম্যাটাপ্যান। চোখ দুটো বন্ধ। মুখের আসল রঙ ঢাকা পড়ে গেছে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের আড়ালে। প্রকাণ্ড মুখটা আরও মস্ত দেখাচ্ছে এখানে সেখানে বেঢপভাবে ফুলে ওঠায়। মুখের ক্ষতগুলো থেকে লালচে রস বেরিয়ে ঘামের সাথে মিশে আছে, তীব্র আলোয় অদ্ভুত রঙচঙে চেহারা পেয়েছে মুখটা। দুই চোখের নিচে নীলচে ক্ষতের জন্যে, নাকি চোখ ধাঁধানো আলোর জন্যে, বলা মুশকিল, চোখ দুটো বুজে রেখেছে ম্যাটাপ্যান। মুখটা টেবিলের দিকে তুলে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল সে। ধীরে ধীরে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হলো, কথা বলতে চেষ্টা করছে সে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল খানিকটা কফের সাথে এক দলা থুথু, কোন শব্দ বেরোল না। পরমুহূর্তে 'অঁক' করে উঠল ম্যাটাপ্যান, পিচকারী দিয়ে বেরিয়ে এল তামাটে রঙের তরল, দুর্গন্ধময় বমি, কোলের উপর পড়ে দুই উরুর গা বেয়ে দু'পাশে গড়িয়ে নামছে। চুলগুলো এদিক ওদিক দুলছে তার, প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে নিঃশব্দে, মাথা নেড়ে।

'তুমি সাংঘাতিক শক্ত মানুষ, ম্যাটাপ্যান,' আবার শুরু করল বক্তা। 'আজ পর্যন্ত কেউ তোমাকে ভাঙতে পারেনি, জানি আমরা। কিন্তু ইস্পাতের কাঁকড়াগুলোর কথা ভুলে যেয়ো না, প্লীজ। এমনিতেই ভয়ঙ্কর পাজী ওগুলো, তার ওপর ওদের ঘাড়ে ভর করে আছে আরেক তুখোড় বদমাশ—ইলেকট্রিসিটি। একবার কামড় দিলে ছাড়তে চায় না। কি, মুখ খুলবে, ম্যাটাপ্যান? কে ছিল? কি নাম তার? তাকে লুকিয়ে রেখেছিলে, না? কেন, ম্যাটাপ্যান? বলো ভাই! সব কথা খুলে বলো আমাদেরকে।'

চিবুকটা লোমশ বুকে ঘষা খাচ্ছে ম্যাটাপ্যানের। চোখ দুটো আগের মতই বন্ধ। চুলগুলো দুলছে। মাথাটা এদিক ওদিক নড়ছে। ধীরে ধীরে স্থির হলো সে।

কিন্তু চিবুক ঠেকেই থাকল বুকের গায়ে। একটু কাত হলো মাথাটা। যেন ঝুঁকে পড়ে বন্ধ চোখ দিয়ে বুকে ডান দিকের এবং তারপর বাম দিকের বোঁটায় আটকে থাকা ইস্পাতের কাঁকড়া দুটোকে দেখছে। আরও একটু সামনে ঝুঁকল মাথাটা, এবারও যেন বন্ধ চোখ দিয়ে পুরুষাঙ্গ কামড়ে থাকা কাঁকড়াটাকে দেখার চেষ্টা করছে।

বক্তার ফর্সা দুই হাত টেবিল থেকে উপরে উঠল। বাম হাতের তালুতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরেছে সে, বাকি চারটে আঙুল প্রসারিত।

ইঙ্গিত পেয়ে টেবিলের শেষপ্রান্তে বসা লোকটার একটা হাত নড়ে উঠল ইলেকট্রিক সুইচের কাছে। পিতলের খাড়া আঙুলটার সাদা মাথা ধরে স্কেলের বাম দিক থেকে ডান দিকে খানিকটা সরাল সে। দুই লেখার ঘরে ছিল আঙুলটা, এখন সেটা চার লেখা ঘরের সামনে চলে এল। লোকটা এবার তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরল সুইচটা। পরমুহূর্তে সেটা অন করল সে।

ইস্পাতের কাঁকড়াগুলোর সাথে যোগাযোগ রয়েছে সুইচ থেকে বেরনো তারগুলোর। সুইচ অন হতেই ভোমরের মত মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল সেলের ভিতর, সাথে সাথেই জ্যান্ত হয়ে উঠল কাঁকড়াগুলো।

প্রকাণ্ড নগ্ন শরীরটা নিঃশব্দে, গ্যাস বেলুনের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে যাচ্ছে, অদৃশ্য দুটো হাত যেন ধীরে ধীরে তুলে ধরছে ম্যাটাপ্যানকে। হাত এবং পায়ের স্ট্র্যাপগুলো মাংস কেটে বসে আছে ভিতরে, হাড় কেটে বেরিয়ে যাবে যেন। দুই চোখের চার পাশ ফুলে থাকায় সামনের দিকে দৃষ্টি চলছে না ম্যাটাপ্যানের। ধীরে ধীরে উঁচু হলো মুখটা। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ দুটো চেয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে। যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। মাত্র আধ সেকেন্ড পর দানবীয় আর্তচিৎকার উঠে এল গলায় অনেক নিচের ফুসফুস থেকে। চিৎকার আর চিৎকার, ক্রমশ সেটা বাড়ছে। চেয়ারে বসা পাঁচজন লোকের গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। সাউন্ড প্রুফ সেলের ভিতর দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে তীক্ষ্ণ, কানের পর্দা ফাটানো অমানুষিক আর্তনাদ। থামছে না, বেড়েই চলেছে, অবিরাম, অবিরত।

বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিটে হেরে গেল ম্যাটাপ্যান। জীবনে এই প্রথম আত্মসমর্পণ করল সে। স্বীকার করল, হ্যাঁ, আগস্টের শেষ ক'টা দিন একজন লোক ছিল তাদের সাথে। না, লোকটাকে চেনে না সে, জীবনে কখনও দেখেনি। নাম? না, লোকটার নাম জানানো হয়নি তাকে।

তখনও টেপ-রেকর্ডার চালু করা হয়নি। কথাটা ম্যাটাপ্যানকে জানানো হলো। মাঝখানের চেয়ারে বসা লোকটা মৃদু হেসে বলল, 'তুমি যে প্রথম দিকে সত্য কথা বলবে না, এ আমরা জানি। সেজন্যে টেপ-রেকর্ডার চালু করিনি আমরা। কষ্ট কাকে বলে সে-অভিজ্ঞতা তো হয়েছে তোমার। আর একটু স্বাদ নাও।'

দশ সেকেন্ডের জন্যে ইলেকট্রিক কাঁকড়াগুলো আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। এক ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চি চওড়া এবং পোনে এক ইঞ্চি গভীর মাংস সহ ম্যাটাপ্যানের বাম বুকের বোঁটাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল শরীর থেকে।

'আহা-হা, চু-চু,' সহানুভূতি প্রকাশ করল বক্তা লোকটা। 'বড় দুঃখের কথা;

যাই বলো। ঠিক আছে, মেঝে থেকে কাঁকড়াটাকে তুলে তোমার নাভির ওপর বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। খেয়াল রাখা হবে যাতে নাভিটাকেও কুটুস করে কেটে না নেয়।'

রাত আটটার সময় শেষবারের মত অন করা হলো সুইচ, অমনি আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল কাঁকড়াগুলো। এর মধ্যে ম্যাটাপ্যানোর পুরুষাঙ্গ দু'বার কাটা পড়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। দরদর ঝরছে রক্ত।

আটবারের বার কোন চিৎকার করল না ম্যাটাপ্যান। শুধু চুল পরিমাণ ঘাড়টা কাত করল একবার। দ্রুত অফ করা হলো সুইচ।

'কে?' বক্তার কণ্ঠস্বর এখন আর আগের মত মৃদু নয়। কর্কশ হিংস্র ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছে সে, 'কে ছিল তোদের সাথে?'

'এ-ক-জন ই-টা-লি-য়া-ন···,' বিড় বিড় করে বলল ম্যাটাপ্যান।

কয়েক ঘণ্টায় দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার। জ্ঞান হারায়নি, তার কারণ দশ মিনিট পর পর ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে তার শরীরে। কিন্তু জ্ঞান না হারালেও শরীরে প্রাণ শক্তির বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। চাদরের উপর পড়ে আছে হাড়-মাংসের বাঁকাচোরা একটা পিণ্ড।

'নাম?'

ম্যাটাপ্যান নিথর।

'সুইচ অন করব, উত্তর দিতে তিন সেকেন্ডের বেশি দেরি হলে,' আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল বক্তা। 'নাম?'

থেমে থেমে, অতি কষ্টে এক একটা শব্দ উচ্চারণ করছে ম্যাটাপ্যান। ইচ্ছা শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। নিজের উপর কন্ট্রোল নেই। কি বলছে যেন জানে না নিজেই।

'সা-ন-তি-নো ভ্যা-লে-ন্টি···'

'লুকিয়ে ছিল কেন?' বক্তা প্রশ্ন করল। 'উদ্দেশ্য কি তার?'

'উ-সে-ন-কে আ-ঘা-ত- হা-ন-বে···'

'কোথায় এখন সে?'

'ই-ং-ল্যা-ন্ডে···'

'ওখান থেকে কোথায় যাবে?'

'জা-নি-না···'

'ইংল্যান্ডে কোথায় গেছে?'

'ল-ন্ড-নে···'

'ঠিকানা জানো?'

হুঁশ নেই ম্যাটাপ্যানের, যা জানে সব সত্য কথা বলে দিচ্ছে সে।

'জা-নি-না···'

একটু বিরতি নিল বক্তা, তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'সান্তিনো ভ্যালেন্টির আসল পরিচয় বলো।'

'মা-সু-দ রা-না···'

'ওহ্ গড!' অ্যাকশন সার্ভিসের পাঁচজন পদস্থ কর্মকর্তা আঁতকে উঠল

একযোগে।

'বেঁচে আছে তাহলে সে?'

'হ্যাঁ...'

'কবে আঘাত হানবে?'

'জা-নি-না...'

'তার প্ল্যান কি?'

'জা-নি-না...'

মাটির নিচে জেলখানার ঠিক বাইরে শহরতলি প্যারিস বহুবর্ণ আলোর ঝলমলে সাজ পোশাক পরে রাত্রিকালীন উৎসবে মেতে উঠেছে তখন। কাছেই একটা পার্ক। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অল্প বয়েসী যুবক যুবতীরা। ঝর্ণার ধারে বসে চোখে চোখে কথা বলছে প্রেমিক প্রেমিকারা। চার ঠোঁট এক করে স্বাদ নিচ্ছে স্বর্গ-সুধার। উচ্ছ্বাস ভরা চাপা নারী-কণ্ঠের সুরেলা হাসি বাতাসে কি অদ্ভুত মূর্ছনা তুলছে!

আরও পনেরো মিনিট জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো দুর্গন্ধময় বমিতে ভেজা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড—ম্যাটাপ্যানকে। প্রথম দশ মিনিট কয়েকশো প্রশ্নের উত্তরে মাত্র পাঁচবার 'জা-নি-না' বলল সে। শেষের পাঁচ মিনিট কিছুই বলল না। কারণ, পাঁচ মিনিট আগেই মারা গেছে ম্যাটাপ্যান।

নিশ্চিন্তে মরা সাপের মত ঘুমোচ্ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ফ্রান্সের প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রশাসন যন্ত্রটা। সেদিনই ভোর রাতের দিকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল তার, বিশাল দেহটা আড়মোড়া ভেঙে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। শুরু হলো মাত্র একজন লোকের বিরুদ্ধে বিশ্বের এক বৃহৎ শক্তির ব্যাপক অভিযান, স্মরণীয় কালের ভয়ঙ্করতম ম্যানহান্ট।

রাত আড়াইটা।

ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন সার্ভিসের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী চীফ কর্নেল বোল্যান্ডের বেডরুম। টেলিফোনের রিসিভার ধরা কর্নেলের বাঁ হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ক্রাডলে রিসিভারটা এমন আলতোভাবে নামিয়ে রাখল, যেন হীরের চেয়েও দামী সেটা। তারপর ঝট করে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, প্রকাণ্ড মুখটা আক্রোশে বিকৃত, ভীতিকর দেখাচ্ছে, খাঁচায় বন্দী হিংস্র বাঘের মত পায়চারি শুরু করল কামরার ভিতর।

মাত্র দশ মিনিট আগে কাঁচা ঘুম ভাঙানো হয়েছে কর্নেলের। পরনে এখনও স্লিপিং গাউন। গাউনের ফিতেটা কোমরে বাঁধা হয়নি, ঘরের কার্পেটে লুটাচ্ছে সেটা, একান্ত অনুগত লেজের মত এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক আসা যাওয়া করছে কর্নেলের পিছু পিছু।

কামরার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাকশন সার্ভিসের পাঁচজন পদস্থ অফিসার। পাঁচ জোড়া চোখ নিঃশব্দে অনুসরণ করছে অস্থিরভাবে পায়চারিরত কর্নেল বোল্যান্ডকে।

বেড সাইড টেবিলে জেমস ক্লিপ দিয়ে আটকানো কয়েকটা কাগজ পড়ে

রয়েছে। ম্যাটাপ্যানের স্বীকারোক্তি।

পায়চারি থামিয়ে বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলে রিস্টওয়াচ দেখল কর্নেল বোল্যান্ড। চেহারায় অধৈর্যের ছাপ ফুটে উঠল তার। কাপুকে ফোন করার আগেই সে খবর পাঠিয়েছে পার্সোন্যাল সেক্রেটারিকে। অথচ এখনও তার দেখা নেই। চরকির মত আধ পাক ঘুরে আবার টেলিফোনের দিকে এগোল সে। এমন সময় মৃদু নক হলো দরজায়।

'কাম ইন!' দরজার দিকে ফিরে হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল।

রাইটিং প্যাড আর কলম হাতে নিয়ে কামরায় ঢুকল মেয়েটা। সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। পাকা টসটসে আঙুরের মত লাগছে দেখতে। প্রসাধন নেই মুখে, তাজা ফুলের মত স্নিগ্ধ চেহারাটা। এক নজর দেখে নিল গম্ভীর-দর্শন পাঁচজন অফিসারকে। হাঁটার গতি না কমিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে বসের সামনে দাঁড়াল সে।

হাত তুলে বেডসাইড টেবিলটা দেখল কর্নেল বোল্যান্ড। 'বিছানায় বসে নোট নাও।'

'জ্বী, মশিয়ে,' বিছানায় বসে রিপোর্টটা একপাশে সরিয়ে রাখল পার্সোন্যাল সেক্রেটারি। টেবিলে রাইটিং প্যাড রেখে কলম বাগিয়ে ধরে ঝুঁকে পড়ল সেটার উপর।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বেডসাইড টেবিলের সামনে দাঁড়াল কর্নেল বোল্যান্ড। তার ভাবভঙ্গি এবং চেহারা থেকে সমস্ত উত্তেজনার ছাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আশ্চর্য শান্ত, গভীর চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে তাকে। এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য, কাজের সময় ভাবাবেগকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। কাপুর কাছ থেকে এইমাত্র পাওয়া নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে যাচ্ছে সে।

'ও-এ-এস সম্পর্কে সব জানা আছে তোমার, তাই না, জিনি?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল কর্নেল।

'জ্বী, মশিয়ে,' প্রশ্ন শুনে একটু বিস্মিত হলো জিনি, কিন্তু উত্তর দিতে দেরি করল না।

সিক্রেট আর্মি অরগানাইজেশন, সংক্ষেপে এবং উল্টো করে বলা হয় OAS, আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দেয়ার সময় জেনারেল দ্য গল বিরোধী এই গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকজনদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ও-এ-এস গোটা ফ্রান্স জুড়ে এক সময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল দ্য গল বেঁচে থাকতেই। দ্য গলের মৃত্যুর পরও এদের কর্মতৎপরতা কমেনি। তবে মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে ও-এ-এস। আলজিরিয়াকে আবার ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করার শপথ ভুলে এরা এখন লুটপাট, ডাকাতি, খুন-খারাবি, কিডন্যাপ ইত্যাদি অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

জেনারেল দ্য গলকে খুন করার জন্যে মোট ছয়বার চেষ্টা করে সিক্রেট আর্মি অরগানাইজেশন, প্রতিবারই ব্যর্থ হয় তারা। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তাঁর উপরও তাদের বিদ্বেষ কম নয়, কেননা তিনিও একজন দ্য গল পন্থী হিসেবে পরিচিত। দেস্তাঁ প্রেসিডেন্ট হবার পর থেকে বহুবার গুজব রটেছে যে ও-এ-এস

তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্র করছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর প্রাণের উপর কোন হামলা হয়নি। তা সত্ত্বেও সিক্রেট আর্মি অরগানাইজেশন সম্পর্কে বর্তমান ফ্রেঞ্চ প্রশাসন দারুণ উদ্বিগ্ন। ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা, ফ্রান্সের আইনরক্ষক বাহিনীগুলো দেশ জুড়ে ও-এ-এস-এর পরিচালিত হাঙ্গামার ধাক্কা সামলাতেই অধিকাংশ সময় এবং শ্রম ব্যয় করে। ও-এ-এস অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সংগঠন, গোটা ফ্রান্স জুড়ে তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এদের পক্ষে সম্ভব।

'প্রথমে বিস্তারিত একটা রিপোর্ট তৈরি করবে,' শুরু করল কর্নেল বোল্যান্ড। 'রিপোর্টের মূল বক্তব্য—প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তাঁর বিরুদ্ধে ও-এ-এসের ষড়যন্ত্র। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, এবার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্ল্যান এঁটেছে ওরা। ওদের প্রায় সমস্ত লোককে আমরা চিনি। তাই প্রেসিডেন্টকে খুন করার জন্যে তারা সংগঠনের বাইরে থেকে একজন বিদেশী খুনীকে ভাড়া করেছে। এ ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করে এগোচ্ছে। সংগঠনের চীফ ছাড়া এই ভাড়াটে খুনীর পরিচয় সম্পর্কে কারও কিছু জানা নেই, এবং চীফ লোকটার হদিস আমাদের জানা নেই। ভাড়াটে খুনী সম্পর্কে আমরা শুধু জানতে পেরেছি সান্তিনো ভ্যালেন্টি ছদ্মনাম নিয়ে রোম থেকে লন্ডনে পৌঁছেছে সে। এই মুহূর্তে সে কোথায়, আমরা তা জানি না। গোপনে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। প্রথম রিপোর্ট এখানেই শেষ। রিপোর্টের নিচে ফুটনোট থাকবে।' একটু বিরতি নিল কর্নেল। কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ফুটনোটে পরিষ্কার অফিশিয়াল নির্দেশ থাকবে, এই রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশ করা নিষেধ। ফ্রেঞ্চ প্রশাসন টের পেয়ে গেছে, এ-খবর ও-এ-এস-এর কর্মকর্তা বা তার নিযুক্ত ভাড়াটে খুনীর কানে যদি যায়, তারা সাবধান হয়ে যাবে, এবং সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের হবু খুনীকে আটকানোর কোন আশাই থাকবে না।'

থামল কর্নেল। টেবিলের কিনারায় দু'হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকল একটু, তারপর আবার বলল, 'এই রিপোর্টের একটা করে টাইপড় কপি, আমার সই-সহ, মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্য ও সব মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক চীফ সেক্রেটারির কাছে যাবে। এছাড়া একটা করে কপি SDECE-এর চীফ, প্রেসিডেন্ট হাউজের চীফ সিকিউরিটি অফিসার, চীফ অভ পারসোন্যাল স্টাফ, ডিরেক্টর অভ সুরেত, চীফ অভ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, চীফ অভ মেট্রোপলিটান পুলিস, চীফ অভ ডিটেকটিভ ফোর্স, চীফ অভ হোমিসাইড ডিভিশন এবং সুরেতের পাঁচ বিভাগের পাঁচ প্রধানের কাছেও পাঠাতে হবে।'

শর্টহ্যান্ডে দ্রুত সব লিখে নিয়েছে জিনি। কর্নেল থামতে সে-ও রাইটিং প্যাড থেকে মুখ তুলে তাকাল।

অন্যমনস্কভাবে সিধে হয়ে দাঁড়াল কর্নেল বোল্যান্ড। টেবিল থেকে চুরুটের বাক্সটা তুলে নিয়ে একটা চুরুট ধরাল। পায়চারি শুরু করল আবার।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে অ্যাকশন সার্ভিসের পাঁচজন অফিসার। গম্ভীর, থমথমে প্রত্যেকের চেহারা।

কর্নেলকে অনুসরণ করছে জিনির দৃষ্টি।

ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে ফিরে এল কর্নেল বোল্যান্ড। 'এবার একটা সংক্ষিপ্ত

নোটিস তৈরি করো। আজ সকাল আটটায় আমার এই বাড়িতে টপ সিক্রেট মীটিং বসবে। বৈঠকে অংশ গ্রহণ করার জন্যে নোটিস যাবে সুরেতের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কর্নেল প্যাপন, ফ্রেঞ্চ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ জেনারেল মনরো, মেট্রোপলিটান পুলিস ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ম্যাক্স বার্না, ডিটেকটিভ ফোর্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ গ্রিমাউদ, প্রেসিডেন্ট হাউজের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ সিকিউরিটি অফিসার লেফটেন্যান্ট রঁদে এবং সুরেতের পাঁচ বিভাগের পাঁচজন উপপ্রধানসহ পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের তিনজন সরকারী সচিবের কাছে।' কথা শেষ করে ভুরু কুঁচকে ভাবছে কর্নেল বোল্যান্ড, বৈঠকের আলোচ্য বিষয় কি হবে তা নোটিসে উল্লেখ করার দরকার আছে কি?...না নেই—কারণ, কাপু রাত শেষ হবার আগেই এদের সবাইকে সাক্ষাৎ দেবেন, তাঁর কাছ থেকে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট নির্দেশ পাবে। মাসুদ রানার এই গোপন এবং নীরব হুমকিটা মোকাবিলা করার জন্যে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দেবেন বলে ঠিক করেছেন। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো পাঁচজন অফিসারের দিকে তাকাল কর্নেল বোল্যান্ড। বলল, 'নোটিসগুলো তোমরা যার যার হাতে দিয়ে আসবে।'

নিঃশব্দে মাথা কাত করল পাঁচজন।

জেমস ক্লিপ দিয়ে আটকানো রিপোর্টটা জিনিকে দেখাল কর্নেল বোল্যান্ড। 'ডজন দুই কপি করতে হবে এটার। সব কাজ শেষ হলে এখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।'

কথা শেষ করে দ্রুত পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল কর্নেল। দশ মিনিট পর নিচে থেকে ভেসে এল একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ। কর্নেল বোল্যান্ডকে নিয়ে গেট পেরোল গাড়িটা, তীরবেগে ছুটে চলল কাপু উ সেনের দুর্গম দুর্গ অভিমুখে।

সকাল আটটা। কর্নেল বোল্যান্ডের স্টাডিরুমে গুরুত্বপূর্ণ টপ-সিক্রেট বৈঠক চলছে। নোটিস পেয়ে প্রত্যেকে যথাসময়ে হাজির হতে গাফলতি করেনি। এরা সবাই কাপু উ সেনের একান্ত অনুগত, ইউনিয়ন কর্সের একনিষ্ঠ সেবক। পরবর্তী কাপু হবার সম্ভাবনা আছে, এদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে দু'একজন।

বৈঠকের শুরুতেই সবাইকে পড়তে দেয়া হলো ম্যাটাপ্যানের টাইপ করা স্বীকারোক্তি। নিঃশব্দে পড়া শেষ করল সবাই।

মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করার জন্যে কোন্ পন্থা সবচেয়ে বেশি উপযোগী, সে-পন্থা অবলম্বন করতে হলে কোন্ পথে এগোতে হবে তা পরিষ্কার ভাবে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিয়েছে কাপু উ সেন। সুতরাং, চলতি গোপন বৈঠকে কথা এবং সময় কোনটাই বেশি খরচ করতে হলো না। সর্বসম্মতিক্রমে কর্নেল বোল্যান্ডকে সমন্বয় সাধনকারীর দায়িত্ব দেয়া হলো। এখন থেকে প্রত্যেকের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট করবে সবাই তার কাছে, সে সরাসরি সেই রিপোর্ট দাখিল করবে কাপুর কাছে। সভাপতির আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল বোল্যান্ড। তাকে অবিচল, গম্ভীর দেখাচ্ছে। অনুচ্চ, ভরাট গলায় কথা বলতে শুরু করল সে।

'মাসুদ রানা সম্পর্কে আপনাদেরকে নতুন করে কিছু বলার নেই আমার। তাকে জীবিত ধরার জন্যে কাপু স্বয়ং তাঁর মহামূল্যবান সময় দিচ্ছেন, এ-থেকেই

বোঝা যায় লোকটার ওপর তাঁর কী ভীষণ ক্রোধ রয়েছে।' একটু বিরতি নিল কর্নেল। প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকাল। তারপর আবার শুরু করল, 'কাপুর নির্দেশ আমরা সবাই পেয়েছি, তবু তাঁর নির্দেশ বুঝতে যাতে কারও ভুল না হয়, তাই আমি সংক্ষেপে তাঁর নির্দেশগুলোই আবার সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। এক, গোটা ফ্রেঞ্চ প্রশাসনকে মাসুদ রানার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে হবে। সেজন্যেই রটানো হয়েছে, মাসুদ রানা প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তাঁকে খুন করতে আসছে। দুই,...কিন্তু গোটা ব্যাপারটা চেপে রাখতে হবে, সাধারণ্যে প্রকাশ করা চলবে না। উদ্দেশ্য: মাসুদ রানা সতর্ক হবার সুযোগ যেন না পায়। তিন, নিরুদ্দেশ একজন লোক, যে সম্ভাব্য সব উপায়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে, তাকে খুঁজে বের করা পুলিস, স্পাই, সেনাবাহিনী—কারও পক্ষে সম্ভব নয়—এটা একটা বিশেষ ধরনের কাজ, সেজন্যে বিশেষ ধরনের লোক দরকার। মহামান্য কাপুর ধারণা, কাজটা গোয়েন্দা বিভাগের। বুদ্ধিমান একজন গোয়েন্দাই শুধু মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করতে পারে।'

'কিন্তু,' সুরেতের উপপ্রধান বিশাল বপু কর্নেল প্যাপন তার মাথা-জোড়া মস্ত টাকে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'কাপু যে গোয়েন্দার ওপর এই কাজের দায়িত্ব চাপাতে চাইছেন সে লোক কর্সিকান নয়। তাকে আমরা কি ভাবে রাজি করাব...'

বিরক্তি ফুটে উঠল কর্নেল বোল্যান্ডের চেহারায়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল না, 'হ্যাঁ, কাপু ক্লড র‍্যাবোর নাম বলেছেন। সে কর্সিকান নয়। তার মত উপযুক্ত গোয়েন্দা, কাপুর ধারণা, গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টি বোধহয় নেই। সেজন্যেই তিনি এই লোককে দায়িত্বটা দিতে চেয়েছেন।' এতক্ষণে বিশাল বপু কর্নেল প্যাপনের দিকে তাকাল কর্নেল বোল্যান্ড। 'আপনি বুঝতে ভুল করেছেন, কর্নেল প্যাপন। হোমিসাইড, ডিটেকটিভ ফোর্স এবং ব্রিগেড-ক্রিমিনেলির চীফ ক্লড র‍্যাবো জানবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তাঁর জীবন বিপন্ন, এবং তাকে দায়িত্বটা নিতে বলবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চীফ সেক্রেটারি অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং। তার মানে, আমরা নিজেরা তাকে রাজি করাতে যাচ্ছি না।'

'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা তার চীফ সেক্রেটারি,' বলল কর্নেল প্যাপন, 'এরাও কেউ কর্সিকান নয়।'

'আমরা সবাই তা জানি,' বলল কর্নেল বোল্যান্ড। 'সেজন্যে কিভাবে কি করতে হবে তাও আমাকে বলে দিয়েছেন কাপু। আমরা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছি তারা আজ অফিশিয়াল আওয়ার শুরু হবার সাথে সাথে যার যার বিভাগের প্রধানকে নিয়ে মীটিং করব। প্রধানরা ইতিমধ্যে ও-এ-এস-এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছে, সুতরাং অধস্তনদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে তারা। গোটা দায়িত্বটা ক্লড র‍্যাবোর ওপর ছেড়ে দেয়া হোক, একমাত্র সেই প্রেসিডেন্টকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই পরামর্শ আমরা সবাই যার যার প্রধানকে দেব। পনেরো আনা কাজ এতেই হাসিল হয়ে যাবে। এরপর প্রধানরাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে রাজি করাবে, অথবা তারা সরাসরি প্রস্তাব দেবে ক্লড র‍্যাবোকে। ব্যাপারটা শুনেই ক্লড র‍্যাবো বুঝতে পারবে, কাজটা বিশেষভাবে তার, একজন গোয়েন্দার—সুতরাং, দায়িত্বটা নিতে উৎসাহই বোধ

করবে সে।'

ডিটেকটিভ ফোর্সের উপপ্রধান মরিস গ্রিমাউদ গদি মোড়া চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। ছোটখাট শরীর, খুব কম কথা বলে। কাপু একে মাঝে মধ্যে বুদ্ধির সাগর বলে ডাকে। কর্নেল বোল্যান্ড থামতেই সে বলল, 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও পরিষ্কার হলো না। মাসুদ রানাকে যদি বিপদ বলে মেনেও নেই, তাকে ধরার জন্যে বাইরের লোকের সাহায্য চাওয়ার দরকার পড়ছে কেন? তার মানে কি এই যে কাপু আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না?'

'না, ব্যাপারটা তা নয়,' বলল কর্নেল বোল্যান্ড। 'রানাকে ধরার আগে অনেক বাধার প্রাচীর টপকাতে হবে। কাপু চাইছেন বাধা টপকাবার কাজগুলো অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হোক। আসল কাজে হাত আমরাই দেব।'

ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের বাঘা জেনারেল তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে ধরে থাকা অবস্থায় বলে উঠল, 'কাপুর বিপদটা যে কোথায়, সেটাই দেখতে পাচ্ছি না আমি। অনেক দিন পর আজ আবার কাপুর আস্তানায় ঢোকার সৌভাগ্য হলো আমার। কি দেখলাম? মাই গড, একেই বলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কাপু নিজে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তবু পঁচিশ জায়গায় দাঁড় করিয়ে চেক করা হয়েছে আমাকে। ওই দুর্গম দুর্গে মাসুদ রানা ঢুকতে পারবে? পারবে—তবে সাতশো কারবাইনধারীর লাশ টপকাতে হবে ব্যাটাকে।'

'তাই তো!' একযোগে বলে উঠল কয়েকজন।

কর্নেল বোল্যান্ডের চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। আগের মতই গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। মৃদু গলায় সে বলল, 'কাপুর প্রাসাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা স্মরণ করে এই একই প্রশ্ন উদয় হয়েছিল আমার মনে। প্রশ্নটা তুলে কাপুর কড়া ধমক খেতে হয়েছে আমাকে। সে যাই হোক, ভুল ধারণাটার এখুনি অবসান হওয়া দরকার। মাসুদ রানা কাপুর জন্যে কোনরকম বিপদ নয়। কাপুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন নিখুঁত যে আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও তা বাধা পাবে, কাপুকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

'তাহলে এই তোড়জোড়, গোটা প্রশাসনকে লেলিয়ে দেয়া...' বিশাল বপু কর্নেল প্যাপনের চর্বিসর্বস্ব থলথলে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। '...এসবের দরকার কি?'

'এসব দরকার তাকে ধরার জন্যে। যাতে সে কোনমতেই বিপদ আঁচ করতে পেরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে সফল না হয়। গোপনে ছোবল মারার চেষ্টা করবে সে, কিন্তু কাজটা অসম্ভব, এই সত্য বুঝতে পারবে সে এক সময়, তখনই পিছু হটতে চাইবে, কিন্তু তাকে পিছু হটতে দেয়া হবে না। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। কে বলতে পারে সে কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে কোনদিক থেকে আক্রমণ করবে? আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোথাও সামান্য একটা ছিদ্র রয়ে গেছে কিনা কে বলতে পারে? আশ্চর্য বুদ্ধিমান ওই বাঙালী যুবক একবার পরাজিত করেছিল কাপুকে—আবারও করবে না, সে-নিশ্চয়তা কোথায়?' মৃদু হাসি ফুটল কর্নেল বোল্যান্ডের পুরু ঠোঁটে। 'অবশ্য আমার মনে হয়, বিপদটা কাপুর, একথা ভাবা হাস্যকর বোকামি ছাড়া কিছুই নয় আমাদের। বিপদ আসলে মাসুদ রানার।

সে পাগল হয়ে গেছে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু এক সময় তার হুঁশ ফিরবে. তখনই চেষ্টা করবে সে পালিয়ে যেতে, কিন্তু তার ফিরে যাওয়ার সমস্ত পথ আমরা বন্ধ করে দেব।'

একটু বিরতি নিল কর্নেল বোল্যান্ড। পুরু ঠোঁট থেকে মুছে গেছে হাসির রেশ, এখন আবার তাকে আগের মত গম্ভীর দেখাচ্ছে। বলল, 'কাপুর শেষ নির্দেশটাই সবচেয়ে জরুরী। মাসুদ রানাকে জীবিত অবস্থায় তাঁর সামনে হাজির করতে হবে। এর অন্যথা তিনি সহ্য করবেন না।'

তিন মিনিট পর বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

লন্ডন। সেদিনেরই বিকেল। চারটে বাজতে বিশ মিনিট বাকি। লন্ডনের সেরা সী-ফুড বিশেষজ্ঞদের তৈরি ব্যয়বহুল লাঞ্চ খেয়ে কানিংথাম থেকে কার্জন স্ট্রীটে বেরিয়ে এল রানা। এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল, অপর হাতে সিগারেট। বাঁক নিয়ে সাউথ অডলি স্ট্রীটে ঢোকার সময় ভাবছে, লন্ডনে এটাই সম্ভবত শেষ লাঞ্চ ওর। আবার কবে আসা হবে, কে জানে।

হাতের সব কাজ শেষ, মনটা হালকা থাকারই কথা। কিন্তু আজ সকাল থেকে কেন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে আছে, মুষড়ে আছে মনটা। দু'একবার অদ্ভুত একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—কোথায় যেন কি সব আয়োজন চলছে তার বিরুদ্ধে। সাধারণত এমন হয় না। কিন্তু কোথাও যদি ওর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হয়, কিভাবে যেন টের পেয়ে যায় ও। মনের এই কুঁকড়ে থাকা ভাবটা কি তারই পূর্বাভাস দিচ্ছে?

ও বেঁচে আছে, দেশত্যাগ করেছে উ সেনকে খুন করার জন্যে—এখবর ইউনিয়ন কর্স পাবার পরমুহূর্ত থেকে ফ্রান্স জুড়ে কি ঘটতে শুরু করবে, অনুমান করতে পারে রানা। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে উ সেন। সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করে তার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করবে রানা, এটা বুঝতে পেরে উ সেনও সম্ভাব্য সব উপায়ে ওকে ঠেকাবার বা খুন করার চেষ্টা করবে। তার প্রথম কাজই হবে যেভাবে হোক ফ্রান্সের প্রশাসনকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা। অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী উ সেনের পক্ষে কাজটা পানির মত সহজ।

ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রানা জানে, ওর সম্পর্কে কোন নতুন খবর ইউনিয়ন কর্স পাবে না। বিদেশীদের মধ্যে মাত্র তিনজন জানে ও বেঁচে আছে। গগলকে বাদ দিলে দু'জন—ম্যাটাপ্যান এবং মোনিকা। এদের কারও কাছ থেকে খবরটা আদায় করার কোন সম্ভাবনা নেই ইউনিয়ন কর্সের। সন্দেহবশত এদেরকে যদি ধরেও কর্স, মোনিকা স্রেফ আত্মহত্যা করবে, কিন্তু মুখ খুলবে না। আর ম্যাটাপ্যান? গভীরভাবে চিন্তা করছে রানা। কি করবে ম্যাটাপ্যান? না, আত্মহত্যা করবে না সে। প্রথমে কয়েকজন কর্সিকান খুন করবে সে, তারপর বাকিগুলোর হাতে খুন হবে।

সে যাই হোক, মনের এই নিস্তেজ ভাবটা কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়, ভাবছে রানা। ফ্রান্সে যদি ওর বিরুদ্ধে ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়ও, তাতেই বা ভয় পাবার কি আছে? সে-ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিতে পারে ভেবেই তো অতিরিক্ত সময়

নিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এগোচ্ছে ও।

আবার নিজের প্ল্যান এবং পন্থাটা খুঁটিয়ে বিচার করল রানা। আত্মবিশ্বাস ফিরে এল ওর মনে। কোন ফুটো, কোন খুঁত নেই ওর প্ল্যানে। প্রস্তুতি পর্বের কোথাও এখন পর্যন্ত কোন ভুল করেনি ও। হালকা হয়ে গেল মনটা। যেখানে যত খুশি পরিকল্পনা নেয়া হোক ওর বিরুদ্ধে, কিছুই এসে যায় না তাতে। ওর খোঁজ পাওয়ার, ওকে ধরার সাধ্য কারও নেই।

তাছাড়া, ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে ও, ভাবল রানা, ভাগ্য তো ওকেই সাহায্য করবে। অর্থাৎ ওর এই ব্যক্তিগত অ্যাসাইনমেন্টে বড় একটা ভূমিকা রয়েছে ভাগ্যের, মনে মনে একথাটা স্বীকার করতেই হলো রানাকে।

প্যারিস। রাত দশটা।

বিস্ময়ে আচ্ছন্নের মত কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলেন দুনিয়ার সেরা গোয়েন্দা ক্লড র‍্যাবো। অদ্ভুত একটা কাজের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তাঁর ঘাড়ে। কাজটার ধরন, এর সাফল্যের গুরুত্ব, ব্যর্থতার খেসারত এবং গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটানা সত্তর মিনিট তাঁকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

কনফারেন্স রুমে ঢুকতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, এগিয়ে এসে তাঁর সাথে করমর্দন করেন, এবং সাদরে টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিলের শেষ মাথায় নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসান। সভার কাজ শুরু হবার আগে তাঁকে একটা রিপোর্ট পড়তে দেয়া হয়। রিপোর্টটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ও-এ-এস-এর ষড়যন্ত্র এবং তার ভাড়াটে খুনী সম্পর্কে। এটা অ্যাকশন সার্ভিসের চীফ কর্নেল বোল্যান্ডের তৈরি। আজ সকালে অফিসে পৌঁছেই এর একটা কপি নিজের টেবিলে দেখেছেন তিনি, এবং পড়েছেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার আর পড়ার প্রয়োজনবোধ করলেন না। রিপোর্টটায় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। এবং লক্ষ করলেন, উপস্থিত হোমড়া চোমড়া ছত্রিশজন বিভাগীয় প্রধান ও উপপ্রধানরা তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। ক্লড র‍্যাবোর মনে ঝনঝন করে এখনও একটা প্রশ্নই বাজছে, আমাকে ডাকার কারণ কি? সবার উন্মুখ দৃষ্টি আমার দিকে কেন?

এমন সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর বলার ভঙ্গিতে পরামর্শ বা অনুরোধের সুর ফুটল না। মৃদু, কিন্তু গম্ভীর গলায় তিনি শুধু জানালেন ঠিক কি করতে হবে তাঁকে: এই জাতীয় গুরুত্ববহনকারী দায়িত্ব পালন করার জন্যে হাতের সমস্ত কাজ এই মুহূর্ত থেকে স্থগিত রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্যে ফ্রেঞ্চ প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগ দিবারাত্র একপায়ে খাড়া থাকবে, যখন তখন যে-কোন তথ্য চাইতে পারবেন তিনি, এবং সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে তা সরবরাহ করা হবে। উপস্থিত ছত্রিশজন প্রধান এবং উপপ্রধানদের একত্রিত প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে, এঁরা সবাই তাঁর দেয়া কাজের নির্দেশ বিনা বাক্যে সম্পন্ন করতে রাজি। দায়িত্বটা পালন করতে খরচপাতি যা লাগে লাগবে, কোন রকম সীমা বেঁধে দেয়া হচ্ছে না।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাণ বিপন্ন, এ খবর গোপন রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একবার নয়, তিনবার ব্যাখ্যা দিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তাঁর কথা শুনে ক্রমশ দমে যেতে লাগল ক্লড র‍্যাবোর মন। এরা চাইছে—না, দাবি করছে যা সম্ভব নয় তাই। কোন্ পথে এগোবে সে? সূত্র কোথায়? অপরাধই সংঘটিত হয়নি এখনও—সূত্র আসবে কোত্থেকে? সাক্ষী, তাও নেই। দু'জন সাক্ষীর একজন নাকি দুর্ঘটনাবশত মারা গেছে। আরেকজন ও-এ-এস-এর চীফ, তার অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে কারও কোন তথ্য জানা নেই। জানা থাকলেও লোকটার সাথে কথা বলার সুযোগ হত না তাঁর। থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা নাম, তাও সেটা একটা ছদ্মনাম এবং নির্ঘাত পরিবর্তনশীল। দুনিয়ার যে কোন জায়গায় থাকতে পারে এই লোক। কোথায় তাকে খুঁজবেন তিনি?

রোগা পাতলা শরীরের ক্লড র‍্যাবো অত্যন্ত সাধারণ চেহারার, সাধারণ পোশাকধারী পঞ্চাশোত্তীর্ণ একজন প্রৌঢ়, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবান একজন পুলিসের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। ভদ্রলোক মৃদুভাষী। কথা বলার সময় তাঁর হাবভাবে অদ্ভুত একটা বিনয় ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁকে যারা চেনে তারা জানে, ন্যায় এবং সত্যের সমর্থনে তাঁর মত জেদী লোক ফ্রান্সে আর দ্বিতীয়টি নেই।

চেহারায় অদ্ভুত একটা দেবসুলভ সহনশীলতার ছাপ রয়েছে র‍্যাবোর। কোন পরিস্থিতিতেই তিনি ধৈর্য হারান না। অপরাধীর প্রতি ঠাণ্ডা অথচ নির্মম মনোভাব তাঁর মজ্জাগত। তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে কাজের প্রতি একাগ্র মনোযোগ, এবং নিষ্ঠা। যে কোন কাজকেই একটা সাঙ্কেতিক ধাঁধা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথমে অঙ্কটা জেনে নেন, তারপর নিয়ম ধরে তার উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। একটা কেস শেষ করতে অন্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি সময় নিয়ে থাকেন তিনি, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে ভুল হবার যেমন সম্ভাবনা থাকে, তাঁর ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন সম্ভাবনা একেবারে থাকে না বললেই চলে। এখানেই তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য। ক্লড র‍্যাবো আত্মপ্রচারকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন।

অত্যন্ত সাদামাঠা জীবন তাঁর। শহরতলির ছোট একটা বাড়িতে থাকেন। প্রচুর, অগুণতি আইনের এবং ক্রিমোনোলজির বই ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু এই বাড়িতে নেই। তিনি বিয়ে করেননি। বই এবং কাজ ছাড়া আরও একটা জিনিসের সাথে গভীর প্রেম আছে তাঁর, সেটা হলো তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। ক্লড র‍্যাবোর দাড়িটা মেহদী দিয়ে রাঙানো বলে মনে হয়।

সোনালী ফ্রেমের বাইফোকাল একটা চশমা পরেন তিনি। ঘুমের সময়টা ছাড়া তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হলো ক্যান্সারের দোসর জ্বলন্ত চুরুট।

বাইরে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে অফিসে ফিরে যেতে বললেন তিনি। কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁকে একটা লিফট দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। কালো মার্সিডিজের ব্যাক সীটে বসে চোখ বুজে মন্ত্রী মহোদয় কি যেন ভাবছেন। আর ক্লড র‍্যাবো ঘন ঘন চুরুটে ফুঁক দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়ছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর মেহদী রঙের দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন।

'আপনার কি নতুন একটা অফিসের দরকার হবে?' চোখ মেলে পাশে বসা

রোগা পাতলা লোকটার দিকে তাকালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

'প্রয়োজন দেখি না,' মৃদু গলায় বললেন ক্লড র‍্যাবো।

'যখনই যা প্রয়োজন হবে, সরাসরি আমাকে জানাতে পারেন আপনি,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন।

'একজন সহকারী দরকার হবে আমার,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'আমার একান্ত সচিব চার্লস ক্যারনকে নিতে পারি?'

একটু ভাবলেন মন্ত্রী মহোদয়, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। আর কাউকে দরকার হবে?'

'না। কিন্তু চার্লসকে সব কথা জানাতে হবে আমার।'

'ঠিক আছে। তবে ঘণ্টাখানেক পর সব জানাবেন ওকে। এ ব্যাপারে আর সবার মতামত চাইব আমি, দেখি ওদের কারও আপত্তি আছে কিনা। ফলাফল এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে জানাতে পারব বলে আশা করি। তবে, চার্লস ক্যারন ছাড়া আর কারও কিছু জানা চলবে না। যত বেশি লোক জানবে ততই বাড়বে ব্যাপারটা সংবাদপত্রে রটে যাবার ভয়।'

'আর কেউ জানবে না,' চুরুট কামড়ে ধরে অন্যমনস্কভাবে বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'শুধু ক্যারন।'

'শেষ আরেকটা কথা,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, 'আপনি সভায় উপস্থিত হবার আগেই সবাই আলোচনাক্রমে ঠিক করেছে আপনার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একটা করে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে গোটা গ্রুপের সামনে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমার কনফারেন্স রুমে মীটিং বসবে, আপনি সবাইকে পড়ে শোনাবেন রিপোর্টটা। রাত ঠিক দশটার সময়।'

'কিন্তু...'

'এর প্রয়োজন আছে,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, 'আপনার ওপর দায়িত্ব চাপানো হলেও, আর সব বিভাগ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকছে না। প্রতিদিন একবার সবার মিলিত হওয়া দরকার, তাহলে পরস্পরের অগ্রগতি সম্পর্কে সবাই জানতে পারবে।' একটু বিরতি নিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'সবাই যার যার পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ শুরু করলেও, আমরা কিন্তু আপনার ওপরই ভরসা করছি। প্রেসিডেন্টের কোন রকম ক্ষতি করার আগেই লোকটাকে ধরতে হবে আপনার। কাজটা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব, জানি। লোকটার নির্দিষ্ট কোন টাইম-টেবল আছে কিনা, থাকলে সেটা কি, এসব কিছুই আমরা জানি না। হয়তো আগামীকাল সকালকেই বেছে নিয়েছে সে, কিংবা হয়তো আগামী মাসের শেষ দিকের কোন একটা দিনে আঘাত হানবে বলে ঠিক করেছে।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' কথা বলার সময় ক্লড র‍্যাবোর মুখ থেকে মৃদু ধোঁয়া বেরোল।

'বলুন,' সাগ্রহে জানতে চাইলেন মন্ত্রী মহোদয়।

'লোকটাকে খুঁজে দিলাম, সেখানেই কি আমার দায়িত্ব শেষ?'

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন, মশিয়ে র‍্যাবো?'

একটু চিন্তা করলেন বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা, তারপর মৃদু হেসে বললেন,

'ডেকে নিয়ে এসে আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাবার ভঙ্গিটার মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্বাভাবিকতা আছে। তাই কেন যেন মনে হচ্ছে, কাজটা পুরোপুরি শেষ করার আগেই বোধহয় আমার ঘাড় থেকে তুলে নেয়া হবে দায়িত্বটা।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ক্লড র‍্যাবোর দিকে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, মশিয়ে র‍্যাবো। অ্যাকশন সার্ভিসের ইচ্ছা, আপনি শুধু লোকটার হদিস জানাবেন, বাকি কাজ তারাই করবে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ক্লড র‍্যাবো। 'তাতে আমার আপত্তি নেই।'

স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়লেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বললেন, 'ধন্যবাদ, মশিয়ে র‍্যাবো। মনে রাখবেন, ফ্রান্সের সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুলিস এখন আপনি। এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে জাতির কর্নধারকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার ওপর। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি।'

নিঃশব্দে নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ক্লড র‍্যাবো। গাড়ি ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তিনি নামতে উদ্যত হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, মশিয়ে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

ছোট্ট অফিসের সর্বত্র ক্লড র‍্যাবোর ব্যক্তিগত সরল রুচির ছাপ সুস্পষ্ট। কামরাটা এতই সাদাসিধে ভাবে সাজানো যে মনেই হয় না এখানে বসে একজন লোক ফ্রান্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটে বিভাগকে পরিচালনা করেন। কামরাটা দৈর্ঘ্যে চোদ্দ ফিট, প্রস্থে বারো ফিট। দক্ষিণ দিকে দুটো ভারী পর্দা টাঙানো জানালা। জানালাগুলোর সামনে দাঁড়ালে বুলেভার্ড সেন্ট মিবেল, তারপর নদীটাকে দেখতে পাওয়া যায়। কামরায় দুটো ডেস্ক। একটা জানালার সামনে, অপরটা পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে—ক্লড র‍্যাবোর ব্যক্তিগত সচিবের জন্যে। দরজাটা জানালাগুলোর উল্টো দিকে।

ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ার দুটো ছাড়া আসবাব বলতে আর রয়েছে কাঠের একটা খাড়া পিঠওয়ালা হাতলহীন চেয়ার, দরজার পাশে একটা আর্ম চেয়ার, বড় আকারের ছয়টা ফাইলিং কেবিনেট দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম দেয়াল জুড়ে, এগুলোর মাথায় সুন্দরভাবে সাজানো রেফারেন্স আর ল বুক, জানালার পাশে লম্বা একটা বুক কেস, তাতে মোটা মোটা অসংখ্য বই সাজানো রয়েছে। দেয়ালের উপরের অংশে, জানালা দুটোর মাথার কাছে দুটো বড় বড় তৈলচিত্র শোভা পাচ্ছে। একটা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য গলের, অপরটি বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিসকার দেস্তাঁর।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন ক্লড র‍্যাবো। ছোটখাট মানুষটা প্রায় ডুবে গেছেন মস্ত চেয়ারের কোলে। একটা হাত চেয়ারের হাতলে লম্বা হয়ে পড়ে আছে, আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরুটটা আপন মনে নীলচে ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখ বুজে আছেন ক্লড র‍্যাবো। দেখে মনে হতে পারে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

অফিসে প্রবেশ করার পর প্রায় এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এর মধ্যে দুটো মাত্র কাজ করেছেন ক্লড র‍্যাবো। তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, ঠিক একঘণ্টা পাঁচ মিনিট পর সে যেন তাঁর সাথে দেখা করে। এবং নিজের ডেস্ক

থেকে সমস্ত ফাইল সরিয়ে ফেলেছেন।

ঠিক এক ঘণ্টা পর ঝন ঝন শব্দে ফোন বাজল। চোখ খুলে টেলিফোনের দিকে তাকালেন ক্লড র‍্যাবো। দ্বিতীয়বার রিঙ হবার পর হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিলেন তিনি, কানের কাছে ধরে জানতে চাইলেন, 'মশিয়ে?'

অপরপ্রান্ত থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মশিয়ে ক্লড, আপনার ব্যক্তিগত সচিবকে আপনি সহকারী হিসেবে নিতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, মশিয়ে,' দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে দিলেন ক্লড র‍্যাবো। চুরুটে মৃদু একটা টান দিয়ে আবার তিনি হেলান দিলেন চেয়ারে। চোখ বুজলেন। নাক দিয়ে মিহি ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর মৃদু নক হলো দরজায়।

চোখ মেললেন ক্লড র‍্যাবো। দেখতে পাচ্ছেন, ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে যাচ্ছে। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এক যুবক প্রবেশ করল কামরায়। সবিনয়ে একটু মাথা নোয়াল সে, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ক্লড র‍্যাবোর ডেস্কের সামনে দাঁড়াল।

সিধে হয়ে বসলেন ক্লড র‍্যাবো। তাঁর সরল মুখে স্নেহের হাসি ফুটে উঠেছে। 'বসো, ক্যারন,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। চার্লস ক্যারন হাতলহীন কাঠের চেয়ারে নিঃশব্দে বসল, 'তারপর বলো, আমার নাতনী সুসনা আর আমার বেটি পদেমা ভাল তো?' ব্যগ্রভাবে আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচে জড়িয়ে পড়ে চুপ করেই থাকলেন।

'ওরা দু'জনেই ভাল আছে,' মুখস্থ বুলির মত বলল চার্লস ক্যারন। কাজ শুরুর আগে প্রতিদিন এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাকে। 'মজার একটা খবর আছে,' বলল ক্যারন। লক্ষ করল, মুহূর্তে আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বসের মুখটা, চোখ দুটো কি এক আশায় চক চক করছে। 'আপনি ড্রয়িং-এর যে সরঞ্জাম উপহার দিয়েছিলেন, তার প্রতিদান হিসেবে সুসনা এক কাণ্ডই করেছে…'

'কি ব্যাপার?' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন ক্লড র‍্যাবো।

'ফটো দেখে হুবহু আপনার একটা ছবি এঁকে ফেলেছে…'

টেবিলে চাপড় মেরে ছেলেমানুষের মত হোঃ হোঃ করে হেসে ফেললেন ক্লড র‍্যাবো। তারপর বললেন, 'কি, আমি বলিনি? তোমার মেয়ের লম্বা লম্বা আঙুল দেখে তখনই আমি বুঝেছিলাম, এ মেয়ে জাত শিল্পী হয়ে জন্মেছে।' হঠাৎ গম্ভীর হলেন ক্লড র‍্যাবো। বললেন, 'দুনিয়াজোড়া যখন খ্যাতি হবে ওর, আমাকে নিয়ে আলোচনা না করে শিল্প-সমালোচকদের কোন উপায় থাকবে না তখন। শিল্পীর প্রথম সৃষ্টি একজন বুড়ো লোক, যার একমাত্র শখ রসুনের চাটনি তৈরি করা…' অত্যন্ত কৌশলে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন ক্লড র‍্যাবো। গত হপ্তায় এক বোতল রসুনের চাটনি নিজের হাতে তৈরি করে চার্লস ক্যারনের স্ত্রী পদেমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর তৈরি চাটনির প্রশংসা পাবার জন্যে ছেলেমানুষের মত ব্যগ্র হয়ে ওঠেন তিনি। কেউ যদি তাঁর চাটনি খেয়ে কোন মন্তব্য না করে, তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান। অবশ্য চাটনির প্রশংসা পাবার জন্যে তাঁর এই দুর্বলতার কথা খুব কম লোকেই জানে। চার্লস ক্যারনেরও ব্যাপারটা জানা নেই। জানা থাকলে আজ

তাকে এই তিরস্কার সহ্য করতে হত না।

ক্যারন ইতস্তত করছে। কি যেন বলতে চায় সে, কিন্তু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

'কিছু বলবে, ক্যারন?'

'হ্যাঁ...না, মানে—পদেমা আপনাকে ফোন করতে চেয়েছিল, কিন্তু ধমক দিয়ে ওকে আমি...'

'কেন?'

'আপনি ব্যস্ত মানুষ, আপনাকে এসব ব্যাপারে বিরক্ত করা অন্যায়...'

'কিন্তু ফোন করতে চেয়েছিল কেন?'

'আপনার রসুনের চাটনির ব্যাপারে,' ইতস্তত করছে চার্লস। 'খুব নাকি ভাল লেগেছে...'

'আচ্ছা!' খুশিতে অদ্ভুত বদলে গেল প্রৌঢ় ক্লড র‍্যাবোর চেহারা। চশমার ভিতর চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে, ফুলে উঠেছে দু'দিকের গাল, ঠোঁটের দুই কোণ কানের লতি ছোঁয় ছোঁয়। আনন্দ উপচে পড়ছে তাঁর চেহারা থেকে। 'খুব ভাল লেগেছে, তাই বলল বুঝি? বেশ বেশ, আর এক বোতল তাহলে পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, সময় হলেই...' হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, পদেমা ফোন করতে চেয়েছিল। 'কেন?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ফোন করতে চেয়েছিল কেন?'

ইতস্তত করছে এখনও চার্লস ক্যারন। বলল, 'আরেক বোতল চাটনি চাইবে...কিন্তু ওকে আমি ধমক...'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্লড র‍্যাবোর। দপ্ করে জ্বলে উঠল চোখ দুটো। নিমেষে প্রচণ্ড রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠল তাঁর। 'তুমি একটা অপদার্থ!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'কমনসেন্স কি জিনিস, তাই তোমার জানা নেই! তুমি...'

অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে চার্লস ক্যারন। কার সঙ্গে বসে রয়েছে সে? ইনিই কি ক্লড র‍্যাবো, তার বস্? বিশ্বাস করতে হিমশিম খাচ্ছে সে। ক্লড র‍্যাবোকে উঁচু গলায় কথা পর্যন্ত বলতে শোনেনি কেউ কোনদিন, রাগ করতে দেখা তো দূরের কথা, সেই ব্যক্তি রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন, তার দিকে তর্জনী তুলে শাসাচ্ছেন! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, অথচ বাস্তব সত্য। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল ক্যারন।

'ছি-ছি-ছি!' ক্লড র‍্যাবো তার সচিবকে ঠাস করে একটা চড় মারা থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছেন। 'সুস্বাদু একটা খাবার জিনিস, মেয়েটার ভাল লেগেছে বলেই না আরেক বোতল চাইছে—আর তুমি কিনা তাকে ধমক মেরে...তারপর স্পর্ধার বলিহারি, আমাকে আবার শোনাচ্ছ!' একটা হাত উঁচু করলেন তিনি, তর্জনী খাড়া করে শাসাতে শুরু করলেন, 'ফের যদি ওকে টেলিফোন করতে বাধা দাও, পস্তাতে হবে তোমাকে। যদি ভাল চাও, মাফ চেয়ে নিয়ো পদেমার কাছে। এবং, এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তুমি।'

কথা শেষ করেই ঝপ করে চেয়ারে হেলান দিলেন ক্লড র‍্যাবো। চোখ বুজে চুপচাপ, নিঃসাড় বসে রইলেন।

বোকার মত নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চার্লস ক্যারন। বিস্ময়ের ছাপ এখনও লেগে রয়েছে মুখে। জীবনে যা কল্পনাও করা যায় না, এই মুহূর্তে তাই ঘটে গেছে। কিসের লক্ষণ এটা? তার বস্ কি পাগল টাগল হয়ে যাচ্ছেন? হঠাৎ মনে পড়ল, তাকে চলে যেতে বলেছেন বস্। ধীরে ধীরে, যন্ত্র চালিত পুতুলের মত ঘুরে দাঁড়াল সে, এগোল দরজার দিকে। ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার? ভাবছে সে।

দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে ক্যারন, পিছন থেকে অতি পরিচিত মৃদু, নরম, স্নেহের ডাক শুনতে পেল সে: 'ক্যারন, এদিকে এসো।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ক্যারন। দেখল চেয়ারে সিধে হয়ে বসেছেন ক্লড র‍্যাবো। ধীরেসুস্থে তিনি একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করছেন। ঠোঁটের কোণে সেই বিখ্যাত সরল হাসিটা লেগে রয়েছে। ত্রিশ সেকেন্ড আগের মানুষটাকে চেনার কোন উপায়ই নেই।

এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল ক্যারন। তার দিকে মুখ তুলে তাকালেন ক্লড র‍্যাবো। একটু হেসে বললেন, 'বসো। তোমার সাথে অত্যন্ত জরুরী আলাপ আছে।'

ধীরে ধীরে বসল ক্যারন। বসের স্বাভাবিক আচরণটাকেও কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখছে সে।

কিন্তু রসুনের চাটনি সম্পর্কে ক্লড র‍্যাবো আর কোন কথাই তুললেন না। ক্যারন চেয়ারে বসতেই ডেস্কের তালা খুলে কর্নেল বোল্যান্ডের রিপোর্টটা বের করে তার সামনে রাখলেন তিনি। বললেন, 'পড়ো।'

এক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটতে না কাটতে আরেক বিস্ময়ের ধাক্কা। দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ও-এ-এস-এর ষড়যন্ত্রের রিপোর্টটা পড়তে পড়তে মুখ থেকে রক্ত নেমে গেল ক্যারনের, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। পড়া শেষ হতেই ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল সে বসের দিকে।

'এবার মন দিয়ে শোনো,' বললেন ক্লড র‍্যাবো, 'এ ব্যাপারে আমার ওপর কি দায়িত্ব চাপানো হয়েছে।' স্বভাবসুলভ মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে কথা বলে যাচ্ছেন তিনি। আজ বিকেলের মীটিংয়ে যা যা ঘটেছে, প্রায় সবই শোনালেন ক্যারনকে।

নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে ক্যারন।

আধঘণ্টা পর থামলেন ক্লড র‍্যাবো।

'মাই গড!' আঁতকে উঠে বলল ক্যারন। 'মশিয়ে, ওরা আপনার ওপর অন্যায় করেছে।' মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল সে, তারপর মুখ তুলে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকাল বসের দিকে। 'মশিয়ে, এর একটাই অর্থ—দায়িত্বটা ওরা আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছে, তার কারণ কেউ তার নিজের ঘাড়ে এটা নিতে চায়নি। এটা একটা অসম্ভব কাজ। শুনতে সাধারণ, মাত্র একজন লোককে খুঁজে বের করা, কিন্তু কাজটায় সফল হওয়া না হওয়া স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার। ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেই ঝুঁকিটা ওরা কেউ নিতে চায়নি।' একটু বিরতি নিল ক্যারন, তারপর বলল, 'মশিয়ে, আপনি ব্যর্থ হলে তার পরিণতি কি হবে, বুঝতে পারছেন তো? ওরা সব দোষ চাপাবে আপনার একার ঘাড়ে।'

'জানি, ক্যারন,' খুব সহজ গলায় বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'ওরা দোষ দেবে সে

ভয়ে নয়, আমরা ব্যর্থ হলে আমাদের প্রেসিডেন্ট মারা যাবেন এই কথা ভেবে এ-কাজে সফল হবার চেষ্টা করব আমরা। আর দেরি না করে এখুনি আমি কাজে হাত দিতে চাই।'

'কিন্তু, মশিয়ে, আমরা শুরু করব কোথা থেকে?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ক্যারন।

'ফ্রান্সের সবচেয়ে ক্ষমতাবান দু'জন পুলিস আমরা. সেই ক্ষমতা আমরা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করব,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'কোথা থেকে শুরু করব? কেন, তুমি তোমার ডেস্কের পিছন থেকে আর আমি আমার ডেস্কের পিছন থেকে শুরু করব। যাও, নিজের জায়গায় বসে প্যাড টেনে নাও।'

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল ক্যারন। নিজের ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসল।

'নোট নাও,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিভাগীয় কোন কাজের ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করা চলবে না। এই কামরায় যতগুলো টেলিফোন আছে সবগুলোর কানেকশন কেটে দিতে হবে। পরিবর্তে মাত্র একটা নতুন টেলিফোন আনতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যাও, ওদেরকে বলো দশটা বাইরের লাইন আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে, সাথে একজন স্থায়ী অপারেটর দরকার। কোন রকম অজুহাত দেখাবার চেষ্টা করলে চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আলাপ করে নিতে বলবে। অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যদি বাধা বা অসুবিধের সম্মুখীন হও, সরাসরি ডিপার্টমেন্টাল চীফের সাথে গিয়ে দেখা করবে, এবং আমার নাম বলবে। লিখিত অফিশিয়াল নির্দেশ কাল সকালের মধ্যে সব বিভাগে পৌঁছে যাবে। তাতে আমার যে কোন অনুরোধ সাথে সাথে রক্ষা করার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে। একটা সার্কুলার মেমোর‍্যানডাম তৈরি করো, প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানের কাছে যাবে, যারা আজকের বিকেলের মীটিংয়ে উপস্থিত ছিল। তাতে ঘোষণা থাকবে এখন থেকে তুমি আমার ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব বহন করছ, কোন কাজে তুমি কোন বিশেষ সুবিধে চাইলে সবাইকে মনে করতে হবে সেটা আমারই অনুরোধ। বুঝেছ?'

লেখা শেষ করে মুখ তুলল ক্যারন। 'বুঝেছি, মশিয়ে। রাত শেষ হবার আগেই শেষ করতে পারব সব। কোন্‌টা আগে?'

'টেলিফোন লাইন। সবচেয়ে ভাল অপারেটরকে যেন দেয় এরা।'

'ঠিক আছে, মশিয়ে। লাইনের ব্যবস্থা হলে?'

চিন্তাভাবনার জন্যে এক মুহূর্তও ব্যয় করছেন না ক্লড র‍্যাবো। তা লক্ষ করে ক্যারন বুঝল, কি করতে হবে না হবে তা আগেই মনে মনে স্থির করে রেখেছেন বস্‌।

'লাইন পাবার পর সাতটা দেশের হোমিসাইড ডিভিশনের প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইব আমি,' চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কথা বলছেন ক্লড র‍্যাবো। 'ইন্টারপোলের বৈঠকগুলোয় এঁরা প্রায় সবাই উপস্থিত হন, তাই এঁদের প্রায় প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিনি আমি। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য শুধু ডেপুটি চীফকে চিনি। একজনকে না পেলে আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করবে।'

মুখ তুলে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল ক্যারন।

'দেশগুলোর নাম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অর্থাৎ ওয়াশিংটনের ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার। বৃটেন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট (ক্রাইম) কমিশনার। বেলজিয়াম। হল্যান্ড। ইটালি। ওয়েস্ট জার্মানী। সাউথ আফ্রিকা। বাড়িতে বা অফিসে, যাকে যেখানে পাও তার সাথে সেখানে যোগাযোগ করো।'

চুপ করে গেলেন ক্লড র‍্যাবো, সহকারীকে লিখে শেষ করার সময় দিচ্ছেন। তারপর আবার বললেন, 'এঁদের প্রত্যেকের সাথে একে একে যোগাযোগ করার সময় জানাবে ইন্টারপোলের কমিউনিকেশন রূম থেকে আমার সাথে তাঁদের টেলিফোন যোগাযোগ ঘটবে সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে, বিশ মিনিট পর পর। হোমিসাইড চীফেরা কে কখন তাঁর কমিউনিকেশন রূমে উপস্থিত থাকতে পারবেন সেই সময়টা জেনে নিয়ে ইন্টারপোল কমিউনিকেশন রূমে গিয়ে তাঁর সাথে আমার কথা বলার জন্যে কল বুক করে রেখো। কলগুলো পারসন-টু পারসন হতে হবে, ফ্রীকোয়েন্সি UHF, কোন মতেই অন্য কেউ যেন শুনতে না পায়। প্রত্যেককে বোঝাবে আমি যা বলতে চাই তা শুধুমাত্র তাঁর একার কানের জন্যে বলা হবে, মেসেজটা শুধু ফ্রান্সের জন্যে নয়, সম্ভবত তাঁর দেশের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে। সাতটা কলের সিডিউল ছ'টার আগেই লিখিতভাবে জানাবে আমাকে।'

দ্রুত সব নোট করে নিল ক্যারন।

চুরুট ধরাবার জন্যে একটু থেমেছেন ক্লড র‍্যাবো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'এখন আমি হোমিসাইডে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য, ফ্রান্সে কোন দুষ্কর্মের জন্যে সন্দেহ করা হয়েছিল, অথচ গ্রেফতার করা হয়নি এমন কোন বিদেশী খুনী সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় কিনা দেখা। তোমার কোন জিজ্ঞাস্য আছে?'

'না, মশিয়ে,' ক্যারন বলল। 'আমি বরং কাজ শুরু করে দিই।' কথা শেষ করে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

'রসুনের চাটনি,...' বললেন ক্লড র‍্যাবো।

মাঝপথে থেমে গেল ক্যারনের হাত। সবিস্ময়ে ঝট করে মুখ তুলে বসের দিকে তাকাল সে।

'...পেতে একটু দেরি হবে পদেমার, কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়ো।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লড র‍্যাবো।

'ঠিক আছে, মশিয়ে,' বেশি কথা বলার ঝুঁকি নিল না ক্যারন। বসের পিছন দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, যতক্ষণ না তিনি ছোট ছোট পদক্ষেপে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। দূরের গির্জায় তখন এগারোই অক্টোবরের শেষ বারোটা ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে।

দশ

মাঝরাত। মস্ত বপু আর সারা শরীরে মণ খানেক চর্বি নিয়ে গাড়ি থেকে নামল ফ্রেঞ্চ

সুরেতের উপপ্রধান কর্নেল প্যাপন। দোতলার একটা কামরায় আলো জ্বলছে দেখে লুইসা পিয়েত্রোর মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। অমনি সারা শরীরে একটা পুলকের ঢেউ বয়ে গেল। স্ত্রী লায়নস্ ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক মীটিংয়ে যোগ দিতে দেশের বাইরে গেছে, এই সুযোগে সব ক'টা মহাদেশও বেড়িয়ে আসবে—এবং বাড়ি খালি থাকার সুযোগে কর্নেল প্যাপনও রোজ রাতে চুটিয়ে প্রেম করছে তার নতুন বান্ধবী লুইসা পিয়েত্রোর সাথে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার সময় মুচকি হাসল প্যাপন। আশ্চর্য খেল দেয় মেয়েটা, ঢোক গিলে ভাবল সে, শরীরও বটে একখানা, ঠিক যেন একটা ঢেউ ওঠা নদী। স্ত্রী ফিরে এলেও এ জিনিস হারানো চলবে না, অন্য একটা বাড়িতে গোপনে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

করিডরে উঠে প্যাপন দেখল লুইসা পিয়েত্রোর কামরার দরজা খোলা, পর্দা ঝুলছে। অদ্ভুত একটা তৃপ্তি বোধ করল প্যাপন। ফিরতে তার যত দেরিই হোক, তার জন্যে রাত জেগে বসে থাকে মেয়েটা। ভাবল, সে-ও লুইসার কাছে সেক্স পার্টনার হিসেবে কম লোভনীয় নয়।

পর্দা সরিয়ে বেডরূমে ঢুকল প্যাপন। বিছানা খালি, সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে লুইসা পিয়েত্রো। হাতে একটা মদের গ্লাস। কর্নেলকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু সাথে সাথে টলতে শুরু করল। কর্নেলের মনে হলো, পিয়েত্রো বুঝি টলে পড়েই যাবে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে মেয়েটাকে ধরল সে, টেনে বুকের উপর আনল।

ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে কর্নেল প্যাপনকে দেখছে লুইসা পিয়েত্রো। 'কে? কে তুমি?' জড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে কথা বলছে সে, 'আমার কর্নেল প্যাপন?' কর্নেলের বুকে মুখ ঘষতে শুরু করল সে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'তুমি নির্মম! তুমি নিষ্ঠুর! রাত জেগে দুশ্চিন্তায় ছটফট করি, অথচ একটা ফোন করে আমাকে শান্ত করার কথা তোমার মনে থাকে না।'

ব্যস্তভাবে কর্নেল বলল, 'কতবার বলেছি তোমাকে, আমার জন্যে জেগে বসে থেকো না তুমি। জানোই তো, পুলিসের চাকরি করি, ইচ্ছা থাকলেও সব সময় ফোন করা সম্ভব নয়। তুমি...'

'তুমি আমাকে ভালবাস না,' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল লুইসা। হাত দিয়ে কর্নেলের বুকে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চাইছে। বাঁ হাতের গ্লাসটা মুখের সামনে তুলল সে। 'মনের দুঃখে আজ আমি মাতাল হয়েছি। তুমি যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।'

গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছে লুইসা, কিন্তু তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে মৃদু শব্দে হাসল কর্নেল প্যাপন। 'মাতাল হয়েছ, ভাল করেছ। তোমার সব দুঃখ আজ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব।' নিচু হয়ে একটা হাত লুইসার হাঁটু দুটোর পিছন দিকে নিয়ে গেল কর্নেল, আরেকটা হাত লুইসার বগলের তলা দিয়ে অপর দিকের কাঁধে তুলে দিল। মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিল সে লুইসাকে, এগোল বিছানার দিকে। কিন্তু তার পিঠে দমাদম ঘুষি মারছে লুইসা, চেঁচাচ্ছে, 'নামাও আমাকে, ছাড়ো আমাকে...তুমি পাষাণ, একটা খবর পর্যন্ত যে দেয় না তার সাথে শোব না...'

হোঃ হোঃ হাসছে কর্নেল প্যাপন। বিছানায় শুইয়ে দিল সে লুইসাকে। সিধে

হয়ে দাঁড়াল। দ্রুত কাপড় ছেড়ে দিগম্বর হতে ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না সে।

বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে লুইসা পিয়েত্রো। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, কালো লোমে ঢাকা উদোম বেঢপ শরীরটা দেখে ঘৃণায় গা রী রী করে উঠল তার। বিছানায় উঠে তার পাশে মস্ত শিম্পাঞ্জীর মত উবু হয়ে বসল কর্নেল প্যাপন। গাউনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে অন্তর্বাস টানাটানি করছে। তার মুখের উপর থাবা বসিয়ে দিল লুইসা পিয়েত্রো। পরমুহূর্তে গড়িয়ে উপুড় হয়ে শুলো।

'প্লীজ, লুইসা!' আবেদনের সুরে বলল কর্নেল প্যাপন। 'তোমাকে পাব এই আশায় সারাদিন অপেক্ষা করেছি। এখন যদি ফিরিয়ে দাও, পাগল হয়ে যাব আমি।'

'সারাদিন করেছটা কি? আমার কথা মনে পড়েনি...'

লুইসার নিতম্বে হাত রেখে কর্নেল প্যাপন বলল, 'আরে, কি ঝামেলায় যে জড়িয়ে পড়েছি, শুনলে আঁতকে উঠবে তুমি, একনিমেষে ছুটে যাবে নেশা।'

'মিথ্যে কথা। আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছ।'

'আরে না!' কর্নেল প্যাপন দু'হাত দিয়ে ধরে চিৎ করল লুইসাকে। লুইসা বাধা দিল না দেখে খই ফুটতে শুরু করল তার মুখে। 'একটা হত্যা ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, বুঝলে? আল কাপুর বিরুদ্ধে।'

মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে গেল লুইসার শরীর। 'দূর, দূর!' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল সে, 'স্রেফ গুল ছাড়ছ। তুমিই না বলো, তোমাদের কাপুকে ছুঁতে হলে ছয়শো সশস্ত্র গার্ডের লাশ টপকে যেতে হবে? তাকে খুন করতে চাইবে এমন পাগল কে আছে!'

অত্যন্ত দক্ষ হাতে লুইসার কাপড় খুলছে কর্নেল প্যাপন। বলল, 'খবরটা মিথ্যে হতে পারে না। এমন শারীরিক কষ্ট দেয়া হয়েছে যে ম্যাটাপ্যান মিথ্যে কথা বলতেই পারে না। লোকটা কাপুর পুরানো এক শত্রু, বাংলাদেশের একজন স্পাই—মাসুদ রানা। বদ্ধ একটা পাগল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'দূর, বিশ্বাস হয় না...'

'বিশ্বাস না হবারই কথা।' বলল কর্নেল। কাপড়চোপড় সরানো শেষ করেছে সে, এখন হাত দিয়ে স্পর্শ নিচ্ছে ঢেউ ওঠা নদীর।

আধঘণ্টা পর ঘুমিয়ে পড়েছে কর্নেল প্যাপন। নাক ডাকছে। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে নামল লুইসা পিয়েত্রো। কাপড় পরার জন্যে সময় নিল না, পা টিপে টিপে বেডরূম থেকে বেরিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল। মাঝখানের দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করল সে। দ্রুত এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে।

একটা Molitor নাম্বার ডায়াল করল লুইসা পিয়েত্রো। অপরপ্রান্ত থেকে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। সে জানে, অপরপ্রান্তে চালু হয়ে গেছে একটা টেপরেকর্ডার। ঝাড়া দুই মিনিট একটানা কথা বলে গেল সে। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর দরজা খুলে পা টিপে টিপে ফিরে এল শোবার ঘরে। বিছানায় শুয়ে কর্নেলের গলা জড়িয়ে ধরল এক হাতে। লাভ নেই, জানে ও, তবু প্রার্থনা করছে মনে মনে রানার জন্যে। নিঃশব্দে ভিজে যাচ্ছে মাথার বালিশ চোখের পানিতে। সব শেষ! ঠেকিয়ে দেবে ওরা মাসুদ রানাকে। জানাজানি হয়ে

গেছে সব।

প্যারিস। দূতাবাস পাড়ার একটি ছোট্ট, একতলা বাড়ি। গোটা বাড়িতে একটা মাত্র প্রাণী, সারারাত জেগে বসে আছে শোবার ঘরে। লুইসা পিয়েত্রোর মেসেজ পাবার পর থেকে সাতদিনের সিগারেট এক রাতে পুড়িয়ে ফেলেছে রূপা। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে সোফার উপর হেলান দিল ও। মনস্থির করতে পারছে না কিছুতেই। এখন তার কর্তব্য কি? মাসুদ রানার সাথে যোগাযোগ করে তাকে সব জানিয়ে দেশে ফিরে যেতে বলবে? লাভ নেই। আগেই ঢাকার মীটিংয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে রানা, কারও কাছ থেকে কোন নির্দেশ বা অনুরোধ যেন তার কাছে না যায়, গেলে সে তা রক্ষা করবে না।

কিন্তু লুইসা পিয়েত্রোর মেসেজ পাবার পর চুপ করে বসে থাকাও যায় না। বিপদটা অকল্পনীয়। মরার আগে সর্বনাশ যা করার করে গেছে ম্যাটাপ্যান। ইউনিয়ন কর্স এখন জানে রানা বেঁচে আছে। শুধু তাই নয়, সান্তিনো ভ্যালেন্টি ছদ্মনাম নিয়ে রোম থেকে লন্ডনে পৌঁছেছে, এবং তার উদ্দেশ্য উ সেনকে খুন করা—কিছুই জানতে বাকি নেই ওদের। এখন শুধু সময়ের প্রশ্ন, রানা ধরা পড়বেই। আর ইউনিয়ন কর্সের হাতে ধরা পড়া মানে...মানেটা স্মরণ করতে গিয়ে শিউরে উঠল রূপা।

রানাকে সতর্ক করার চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলল রূপা। তার কথায় কান দেবে না রানা! কিন্তু হেডকোয়ার্টার থেকে যদি সরাসরি মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশ পায়, হয়তো সিদ্ধান্ত পাল্টাবে সে। কিন্তু, ভাবছে রূপা, ঢাকার সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে সে? যোগাযোগ করতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয়। ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ থেকে কল বুক করলে মেসেজটা গোপন থাকবে না। উ সেন অত্যন্ত কৌশলে ফ্রান্সের সরকারী প্রশাসনকে খেপিয়ে তুলেছে রানার বিরুদ্ধে, ন্যাশনাল সুরেতের শাখা DST-এর লোকেরা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক কলগুলো টেপ করার জন্যে আড়ি পাতা যন্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। মেসেজ পাঠাবার সময়ই হয়তো ধরা পড়ে যাবে সে। এবং ধরা পড়া মানে...আবার একবার শিউরে উঠল রূপা।

বাংলাদেশ দূতাবাসের সাহায্য নেবে কিনা ভাবল একবার। সাথে সাথে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল। কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিয়েছে ঢাকা অফিস, কোনভাবেই দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা চলবে না। দূতাবাসে গেলে তাকে চিনতেই অস্বীকার করবে ওরা, সাহায্য করা তো দূরের কথা।

তাহলে?

ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেল। দিনের আলোয় আরও প্রকট মনে হলো সমস্যাটাকে। ওর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ভবিষ্যৎ। ওর ভুল সিদ্ধান্তের ফলে রানা যদি ধরা পড়ে, রানাহীন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কানা হয়ে যাবে। এর উপর নির্ভর করছে ওর নিজের জীবনও। ভাগ্য যদি প্রসন্ন না হয়, তাকেও দুনিয়ার বুক থেকে এক নিমেষে ঝরে পড়তে হবে অকালে।

সোফা ছেড়ে উঠল রূপা। বাথরুমে ঢুকে আধঘণ্টা ভিজল শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে। মাথাটা ঠাণ্ডা হলো না তবু। দোদুল-দোল দুলছে মন। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না।

বাথরুম থেকে সেজেগুঁজে বেরোল, কিন্তু বাইরে যাবার ব্যাপারে এখনও কিছু ঠিক করেনি। কিচেনে ঢুকে কফি তৈরি করল এক কাপ। ড্রয়িংরুমে বসে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে শেষ করল কাপটা। দরজা খুলে বারান্দা থেকে তুলে নিল সংবাদপত্রের প্রভাত সংস্করণটা। সোফায় ফিরে এসে চোখের সামনে মেলে ধরল কাগজটা। উল্লেখযোগ্য অনেক খবরই রয়েছে, কিন্তু সবই ওর কাছে তাৎপর্যহীন লাগছে। নামিয়ে রাখল কাগজটা পাশে। একটা মাত্র নাম বাজছে কানে। বারবার তার চেহারাটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মাসুদ রানা।

বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার পথ কি?

শেষ পর্যন্ত বেলা ন'টা বেজে গেল। অস্থিরতা কাটিয়ে উঠল রূপা। যা হয় হবে, ঝুঁকিটা নিজের উপর দিয়েই নেবে সে। ফোন করবে ঢাকায়। আন-অফিশিয়াল ফোন নাম্বার জানা আছে তার, খোঁজ করলেও এই নাম্বারে মালিককে খুঁজে পাবে না কেউ কোনদিন।

বাড়িতে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল রূপা। গাড়িটা গ্যারেজেই থাকল। পায়ে হেঁটে মেইন রোডে এসে হাত তুলে দাঁড় করাল ধাবমান একটা ট্যাক্সিকে। 'জার দু নর্দে যাব,' উঠে বসে বলল ড্রাইভারকে। স্টেশনের সম্মুখ চাতালে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ও। ট্যাক্সি নিয়ে ড্রাইভার অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

রাস্তা পেরিয়ে একটা কাফেতে ঢুকল রূপা। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কফি আর টেলিফোনের জন্যে একটা ধাতব চাকতির অর্ডার দিল। চাকতিটা নিয়ে কি যেন ভাবল একটু। তারপর কাউন্টারে কফি রেখে কাফের পিছন দিকে চলে গেল টেলিফোন করতে। ডাইরেক্টরী এনকোয়েরির নাম্বারে ডায়াল করে প্রশ্ন করতেই অপারেটর ওকে ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাল। ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের নাম্বারটা মুখস্থ করতে করতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রূপা।

কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে একশো মিটার এগোল রূপা, রাস্তা পেরোল, তারপর আবার একটা কাফেতে ঢুকে টেলিফোন ব্যবহার করল। এবার এনকোয়েরিকে জিজ্ঞেস করল, আন্তর্জাতিক টেলিফোন কল বুক করা যায় কাছাকাছি এমন কোন পোস্টাফিস আছে কিনা। উত্তর এল, মেইন লাইন রেলওয়ে স্টেশনের মোড়ে সে-রকম একটা পোস্টাফিস আছে।

তিন মিনিটের পথ পেরিয়ে পোস্টাফিসে পৌঁছল রূপা। সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে দুরু দুরু করছে বুকের ভিতরটা। হাতের তালু ঘামছে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল সে। ইতস্তত না করে রিসিভার তুলল ও। ডায়াল করে অপারেটরকে বলল, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটা অভিজাত হোটেলের সাথে যোগাযোগ করতে চায় সে। হোটেলের একটা ফোন নাম্বারও অপারেটরকে জানাতে ভুল করল না। কিন্তু নাম্বারটা কার দখলে, বা যার সাথে সে কথা বলতে

চায় তার নাম কি তা উল্লেখ করল না।

এরপর শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রূপা বুদের ভিতর। উদ্বেগে আর আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে গেছে। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে তবু কোন সাড়া নেই রিসিভারে। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল রূপা। মনে হলো, এই মুহূর্তে পোস্টাফিস থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত ওর। ফ্রান্সের জাতীয় সুরেতের এসপিওনাজ শাখায় (DST) ইউনিয়ন কর্সের লোকই বেশি। তারা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ঢাকায় কেউ ফোন করতে চাইলেই খবরটা জেনে যাবে তারা। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গেছে। হয়তো জীপ নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।

আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল রূপার চেহারা। কি করবে, দ্রুত ভাবছে—এমন সময় অপারেটর বলল, 'কথা বলুন।'

'আপনি কে বলছেন?' একটানা বিচিত্র যান্ত্রিক গোলযোগের ভিতর শোনা গেল অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর।

প্রশ্নের উত্তর দিল না রূপা, বলল, 'আমি একজন বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলতে চাই। মিস নাহাসো। ওকে দিন।'

রিসিভার থেকে তীব্র ঝড়ের একটানা গর্জন আসছে, তার মধ্যে অস্পষ্টভাবে কানে এল, 'অপেক্ষা করুন।'

তারপর ক্লিক-ক্লিক কতকগুলো যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে, এবং ক্লান্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'নাহাসো বলছি।'

'আমি পারু,' জাপানী ভাষায় দ্রুত কথা বলছে রূপা, 'শোনো, হাতে সময় কম। যা বলছি কাগজে টুকে নাও। শুরু করছি। নারার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে। রিপিট। নারার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে। একজনকে কথা বলানো হয়েছে। মরার আগে বলে গেছে সব। শেষ। লিখেছ?'

অস্ফুট, প্রায় শোনা গেল না সোহানার কণ্ঠস্বর, 'হ্যাঁ।'

রিসিভার রেখে বিল মিটিয়ে পোস্টাফিস থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল রূপা। এক মিনিটের মধ্যে মেইন লাইন স্টেশনের লোকারণ্যে হারিয়ে গেল সে।

দু'মিনিট পর পোস্টাফিসের সামনে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে থামল একটা জীপ। লাফ দিয়ে দু'জন DST-এর লোক নামল সেটা থেকে, ছুটে ঢুকে গেল দালানটার ভিতরে। সুইচবোর্ড অপারেটরের কাছ থেকে রূপার চেহারার এবং পোশাকের বর্ণনা ছাড়া আর কিছু পেল না তারা। কিন্তু এও কম পাওয়া নয়। প্যারিসে শাড়ি পরা বাংলাদেশী নারী সংখ্যায় খুব বেশি নেই, সুতরাং মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে তেমন বেগ পেতে হবে না।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।

আন্তমহাদেশীয় টেলিফোন কল রিসিভ করার জন্যে স্থানীয় একটা অভিজাত হোটেলে বি-সি-আই-এর একটা টেলিফোন আছে, প্রয়োজনে এই সেটটার সাথে সরাসরি হেডকোয়ার্টারের কমিউনিকেশন রূমের একটা সেটের সংযোগ ঘটানো যায়। বি-সি-আই-এর হাই অফিশিয়াল এবং স্পেশাল এজেন্টস ছাড়া এই সেটের

নাম্বার আর কারও জানা নেই।

কমিউনিকেশন রুম থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মত করিডরে বেরিয়ে এল সোহানা। হাতে কাগজের একটা টুকরো। ঠিক এই সময় নিজের কামরা থেকে বেরোল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে সে। তাকে দেখেই ছুটতে শুরু করল সোহানা।

হাইহিলের দ্রুত খটাখট শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহেল। ঘুরল। হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল সোহানা।

'কি...' প্রশ্ন শুরু করে সারতে পারল না সোহেল, হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিল সোহানা তার দিকে। কথা বলবে, সে-শক্তি এখনও ফিরে আসেনি ওর।

ভাঁজ খুলে কাগজে লেখা মেসেজটা পড়তে শুরু করল সোহেল। ছোট্ট মেসেজ। প্রথমবার দ্রুত পড়ে গেল সোহেল। দ্বিতীয়বার প্রতিটি বাক্য পড়া শেষ করে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিল। তৃতীয়বার কয়েক সেকেন্ড বিরতির ব্যবধানে পড়ছিল প্রতিটি শব্দ। চেহারায় কোনই প্রতিক্রিয়া নেই। কাগজটা থেকে মুখ তুলে তাকাল সোহানার দিকে। মৃদু গলায় বলল, 'এসো।' বলেই সোহানাকে পাশ কাটিয়ে নিজের কামরার দিকে এগোল সে।

সোহেলের নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন হাবভাব লক্ষ করে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে সোহানা। তিন সেকেন্ড একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। মেসেজটায় রানার জন্যে যে সাংঘাতিক বিপদের ঘোষণা রয়েছে, সোহেল ভাইয়ের কি তা নজরে পড়েনি? ভাবতে ভাবতে ঘুরে দাঁড়াল সোহানা, অনুসরণ করল সোহেলকে।

চক্কর খেয়ে গেছে সোহেলের মাথা, মুহূর্তে সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছে সে। সোহানা ভয় পেয়ে যাবে ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে সে। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভিতর। সব রাগ গিয়ে পড়ছে রানার উপর। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ছটফট করছিল ও। কারও কথায় কান দেয়নি। বসের উপরও একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠল সোহেলের মনে। তিনি অন্তত বাধা দিতে পারতেন রানাকে।

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল সোহেলের। কামরায় ঢুকে সোজা এগিয়ে গিয়ে বসল নিজের রিভলভিং চেয়ারে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল সোহানা। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল।

'বসো,' গলাটা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল সোহেল।

'এই মুহূর্তে সাবধান করা উচিত রানাকে, তাই না?' বসল না সোহানা, দু'হাত দিয়ে ডেস্কের কিনারা শক্ত করে ধরে ঝুঁকে পড়ল সোহেলের দিকে। দু'চোখে ব্যাকুল দৃষ্টি।

'সাবধান করে কোন লাভ হবে না,' বলল সোহেল। 'অপারেশন বাতিল করে ফিরে আসার জন্যে অফিশিয়াল নির্দেশ জানাতে হবে ওকে। এখন আর সফল হবার কোন আশা নেই রানার। ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গিয়ে না থাকলেই হয়।'

'কিন্তু যোগাযোগ করব কিভাবে?'

'ওর লন্ডনের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার মধ্যে ঝুঁকি আছে,' বলল সোহেল। আড়চোখে তাকাল ইন্টারকম সেটটার দিকে। বসের সাথে আলোচনার

আগেই অফিশিয়াল নির্দেশ দিতে চায় সে রানাকে। কিন্তু আরও কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে এখন কোন উপায় নেই আমাদের। তুমি যাও, কমিউনিকেশন রুম থেকে সরাসরি ফোন করো রানাকে। আমি বসের চেম্বারে যাচ্ছি মীটিং ডাকার প্রস্তাব নিয়ে।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সোহানা। ছুটে বেরিয়ে গেল সে সোহেলের কামরা থেকে।

কপালে হাত দিয়ে বসে রইল সোহেল। মুহূর্তের জন্যে দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে বিকৃত হয়ে উঠল মুখের চেহারা। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পরিষ্কার জানা আছে তার, একটা ফোন কল রানাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে যথেষ্ট নয়। রানা এই অফিশিয়াল নির্দেশ গ্রাহ্যই করবে না। নিজে যা ভাল মনে করে, তাই চিরকাল করে এসেছে ও। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। রানাকে ফিরিয়ে আনতে পারে মাত্র একজনই। তিনি মেজর জেনারেল রাহাত খান। একমাত্র তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে সরাসরি নির্দেশ পেলে গ্রাহ্য না করে পারবে না রানা।

এখন, ভাবছে সোহেল, বসকে রাজি করাতে পারলেই হয়।

ওদিকে কমিউনিকেশন রুম থেকে সরাসরি লন্ডনে রানার ফোন নাম্বারে রিঙ করছে সোহানা। ঝন ঝন করে ফোনের বেল বাজছে অপর প্রান্তে। সাড়া নেই। কেউ রিসিভার তুলছে না। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের স্বেদ বিন্দু মুছল সোহানা। কানের সাথে চেপে ধরে আছে রিসিভারটা। রানা নেই বাড়িতে? ধরা পড়ে গেছে? গলার কাছে একটা কান্নার প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে সোহানা। অপরপ্রান্তে ফোনের বেল বাজছে। রিসিভার তুলছে না কেউ।

লন্ডন।

ঘুম থেকে আজ কাক ভোরে উঠেছে রানা। অনেক কাজ হাতে।

আগের সন্ধ্যায় সুটকেস তিনটে পরীক্ষা করার জন্যে খালি করে আবার সব জিনিস একটা একটা করে ভরে রেখেছে ও। স্পঞ্জের ব্যাগ আর দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি, হ্যান্ড-গ্রিপে এই দুটো জিনিস তুলতে বাকি আছে শুধু।

ঘুম থেকে উঠে কফি তৈরি করে খেয়েছে, বাথরুম এবং শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে। তারপর হ্যান্ড-গ্রিপে স্পঞ্জের ব্যাগ আর দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি ভরে তিনটে সুটকেসের সাথে সেটাকেও দাঁড় করিয়ে রেখেছে দরজার একপাশে।

ছোট্ট কিচেনে ঢুকে মামুলি ব্রেকফাস্ট তৈরি করল রানা। ভাজা ডিম, অরেঞ্জ জুস, এবং আরও এক কাপ কালো কফি। ব্রেকফাস্ট শেষ করে অবশিষ্ট ডিম দুটো ভেঙে বেসিনে ফেলে দিল ও, দুধের আধখালি টিনটাও উপুড় করে ধরল বেসিনে। অরেঞ্জ জুসটুকু ফেলতে গিয়ে মায়া অনুভব করল, তাই গলায় ঢেলে খালি করল বোতলটা। আবর্জনা জমা করার প্লাস্টিকের ঢাকনিওয়ালা বাস্কেটে বোতল, দুধের খালি টিন, ডিমের খোসা ইত্যাদি ফেলল ও। ওর অনুপস্থিতিতে কিছুই যেন পচে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।

এরপর পোশাক পরতে শুরু করল সে। বেছে নিল সিল্কের পোলো-নেকড সোয়েটার, ডাভ-গ্রে রঙের স্যুট, গাঢ় বাদামী রঙের মোজা এবং সরু কালো মোকাসিন জুতো। স্যুটের পকেটে ভরল অরগ্যানের সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র,

নগদ এক হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড।

পোশাক পরা শেষ হলো। এরপর চোখে লাগাল গাঢ় রঙের চশমাটা।

নয়টা পনেরো মিনিটে দু'হাতে দুটো করে ব্যাগ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। বারান্দায় হাতের জিনিস নামিয়ে রেখে দরজায় তালা মারল। কৌতূহলী প্রতিবেশীরা বিরক্ত করতে এল না কেউ। অবশ্য গত রাতে একজন এসেছিল। তাকে রানা জানিয়েছে, আইসল্যান্ডে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে আজ রওনা হয়ে যাবে ও।

সাউথ অডলে স্ট্রীট খুব দূরে নয়, হেঁটেই পৌঁছে গেল রানা। দ্রুত ধাবমান একটা ট্যাক্সি থামাল হাত তুলে। 'লন্ডন এয়ারপোর্ট,' ড্রাইভারকে জানাল ও। 'দু'নম্বর বিল্ডিং।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। ঠিক সেই সময় রানার বাড়িতে টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।

হাই অফিশিয়াল এবং স্পেশাল এজেন্টদের নিয়ে মীটিং বসেছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারে। আলোচ্য বিষয়: রানা ইন ডেঞ্জার।

মীটিং শুরু হলো সবাইকে রূপার পাঠানো মেসেজের কপি পড়তে দিয়ে। রানা বিপদগ্রস্ত, বা তার বিপদের মাত্রা, ধরন ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতে কেউ কোন প্রশ্ন তুলল না। মেসেজটা পড়ার পর এ ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকল না যে রানার অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ায় তার আর কোন আশা নেই। ইউনিয়ন কর্সের খপ্পর থেকে প্রাণে বাঁচতে হলে তাকে পিছু হটতে হবে, ফিরে আসতে হবে দেশে।

কিন্তু রানার সাথে যোগাযোগ করা হবে কিভাবে? প্রথমে এ প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা শুরু হলো।

সোহানা তার রিপোর্টে জানাল, রানার লন্ডনের বাড়িতে ঘণ্টা দুই ধরে ফোন করেও কোন সাড়া পায়নি সে। কমিউনিকেশন রূমের একজন কর্মী দশ মিনিট পর পর এখনও রিঙ করছে, রানার সাড়া পাওয়া গেলেই খবর পাঠাবে সে।

'রানা এখন কোথায়?' এই প্রথম প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। অদ্ভুত একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করছে আজ সবাই তাঁর আচরণে। আস্ত একটা চুরুট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন তিনি, কিন্তু তাতে অগ্নিসংযোগ করেননি। আগুন ধরাতে ভুলে গেছেন, ব্যাপারটা তাও হতে পারে না। এ ধরনের ব্যাপারে ভুলটা বড় জোর দু'এক মিনিট স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু আগুনহীন চুরুটটাকে তিনি প্রায় মিনিট পনেরো ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন। শুধু তাই নয়, মুঠোয় রয়েছে গ্যাস লাইটারটা, সেটা নাড়াচাড়া করছেন, কখনও সেটার দিকে তাকিয়ে থাকছেন, কিন্তু চুরুট ধরাবার কোন লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তার কণ্ঠস্বরটাও আজ কানে বাজল সবার। আশ্চর্য মৃদু শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। তাতে ঝাঁঝ নেই, নেই রাগ, তিরস্কার বা কাঠিন্য।

'কোথায়, আমরা তা জানি না,' ম্লান গলায় বলল সোহেল। পর মুহূর্তে গলা

চড়ে গেল তার, 'কিন্তু স্যার, যেভাবেই হোক ওকে থামাতে হবে। আমাদের কারও কথা শুনবে না ও। এ ব্যাপারে আমি আপনার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা করি। গোটা ফ্রান্স চষে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা রানাকে. তার আগে...'

নিঃশব্দে একটা তর্জনী খাড়া করলেন মেজর জেনারেল। অর্থাৎ সোহেলকে থামতে ইঙ্গিত করছেন তিনি। কথা শেষ না করে চুপ করে গেল সোহেল।

'গোটা ফ্রান্স চষবে ওরা, কারেক্ট,' রাহাত খান বললেন. 'কিন্তু কার খোঁজে? দীর্ঘদেহী একজন বিদেশীর খোঁজে, তাই না? চলতি মৌসুমে দশ লক্ষ বিদেশী ট্যুরিস্ট ঢুকবে ফ্রান্সে। যতদূর জানি, রানাকে খুঁজে বের করার জন্যে ইউনিয়ন কর্সের হাতে তেমন কোন সূত্র নেই। রানা ছদ্মবেশ নিয়ে থাকবে. ছদ্মনাম ব্যবহার করবে. এবং একজন প্রফেশন্যাল হিসেবে অবশ্যই জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করছে সে।' সোহেলের বুকের দিকে তর্জনী খাড়া করলেন তিনি, 'এই মুহূর্তে ওর বিপদটা কোথায় দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

আপাদমস্তক চমকে উঠল সোহেল। বসের কথায় শুধু যে চোখ খুলে গেল তাই নয়, নিজের বুদ্ধি এবং কল্পনা শক্তির দৈন্যতা উপলব্ধি করে মনটা সেই সাথে একটু দমেও গেল। বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানা ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারবে বলে মনে করেন, স্যার?'

গম্ভীর হলেন রাহাত খান। বললেন, 'তা নির্ভর করে ওর আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধি এবং প্ল্যানিংয়ের ওপর।'

সোহেল বসের সাথে একা কুলিয়ে উঠতে পারছে না লক্ষ করে এবার তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল সোহানা। বলল, 'আমি মনে করি, রানাকে সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন আছে, স্যার। এ কাজটা রূপাই করতে পারবে, প্রথমবার রানা তাকে ফোন করলেই,' অত্যন্ত সাবধানে, ভেবেচিন্তে কথা বলছে সোহানা, 'এই মুহূর্তে ফ্রান্স ত্যাগ করা উচিত রানার। ও যদি না চায়, ওকে বাধ্য করা উচিত। বাধ্য করার একমাত্র অস্ত্র শুধু আপনার হাতেই আছে, স্যার। আর কারও কথা শুনবে না ও।'

'থিওরি হিসেবে তোমার এই বক্তব্য কারেক্ট,' মেজর জেনারেল বললেন।

'যা ঘটে গেছে, এরপর কি রানার কোন আশা আছে বলে মনে করেন আপনি?' সোজা প্রশ্নটা সোজাভাবে করল সোহানা।

'নেই,' মেজর জেনারেল রাহাত খান সোজা উত্তর দিলেন। ধীরেসুস্থে চুরুটে আগুন ধরালেন তিনি। কিন্তু তাঁর হাত কাঁপছে, এটা আবিষ্কার করে কলজে শুকিয়ে গেল সোহেলের। 'কিন্তু রানা একজন প্রফেশন্যাল। আরেক অর্থে, আমিও তাই। একজন প্রফেশন্যাল আরেকজন প্রফেশন্যালের পরিকল্পিত অপারেশনকে খাটো করে দেখতে পছন্দ করে না।'

'স্যার, ওকে ফিরিয়ে আনুন!' আবেদনের সুরে হঠাৎ বলে উঠল সোহানা। তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, কারও কারও গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল সাথে সাথে।

ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়ার আড়ালে রাহাত খান যেন মুখ লুকালেন। সবাই শুধু তাঁর ভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'পারি না। পারলে, আনতাম। নিজের পথে চলে গেছে ও। সে কোথায়, কি করতে যাচ্ছে—কিছুই

জানা নেই আমাদের।'

'রূপাকে দিয়ে...'

'সম্ভব নয়,' বললেন মেজর জেনারেল। 'তাতে শত্রুদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হবে রূপার অস্তিত্ব।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। এখনও তাঁর মুখ ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য। তারপর বললেন, 'রানাকে থামাবার সাধ্য এখন কারও নেই। আমারও না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি—রওনা হয়ে গেছে সে প্যারিসের উদ্দেশে। প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে, এইবার ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।'

সেই উ সেন-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮০

এক

প্যারিস।

সকাল ছ'টার একটু পর নিজের অফিসে ফিরে এলেন কমিশেয়ার ক্লড র‍্যাঁবো। তাঁর একান্ত সচিব চার্লস ক্যারন তখনও শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে ডেস্কে বসে কাজ করছে।

ফাইলিং কেবিনেটের উপর একটা ইলেকট্রিক কফি পারকুলেটর রয়েছে, পাশেই একসার কাগজের কাপ, এক টিন কনডেন্সড মিল্ক, এবং ছোট এক ব্যাগ চিনি। নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে প্রৌঢ় ক্লড র‍্যাঁবো সেদিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'এক কাপ কফি হলে মন্দ হত না, কি বলো?'

সকালের তাজা বাতাস ফুর ফুর করে জানালা দিয়ে ঢুকে ক্লড র‍্যাঁবোর উষ্ক-খুষ্ক একমাথা কাঁচাপাকা চুলকে আরও ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে দিচ্ছে। চার্লস ক্যারন বসের চেহারায় রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি লক্ষ করে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়ল।

সহকারী কফি তৈরি করছে, এই ফাঁকে ডেস্কের উপর একরাশ কাগজের ভাঁজ খুলে সেগুলোর উপর ঝুঁকে পড়লেন ক্লড র‍্যাঁবো, কথা বলতে শুরু করলেন, 'গত পনেরো বছরের রেকর্ডপত্র ঘেঁটে কিছুই পাওয়া গেল না। এই সময়ের মধ্যে মাত্র একজন বিদেশী খুনী ফ্রান্সের মাটিতে তৎপর হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আজ সে বেঁচে নেই। এই লোকটা ছাড়া ভাড়াটে চারজন খুনীর সন্ধান পেয়েছি, এদের তিনজনই জেল খাটছে এখনও, চতুর্থ জন যাবজ্জীবন খাটছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাছাড়া, এরা সবাই সাধারণ খুনী, ফ্রান্সের একজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার যোগ্যতা রাখে না।'

ফাইলিং কেবিনেটের কাছে দাঁড়িয়ে বসের দিকে ভুরু কুঁচকে, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে চার্লস ক্যারন। বলল, 'ওর পরিচয় জানতে হলে বিদেশেই খোঁজ-খবর করতে হবে তাহলে।'

'হ্যাঁ,' বললেন ক্লড র‍্যাঁবো। 'এ-ধরনের একজন লোক নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন জায়গা থেকে ট্রেনিং পেয়েছে, এবং তার অভিজ্ঞতার ঝুলিও বেশ ভারী হতে বাধ্য। দুনিয়ার সেরা একজন খুনী না হলে তাকে ও-এ এস ভাড়া করত না। প্রেসিডেন্টদেরকে না হলেও, সমমানের নিরাপত্তা প্রহরাধীন ব্যক্তিদেরকে খুন করার অভিজ্ঞতা তার না থেকেই পারে না। যাই হোক, তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে বলো এবার।'

বসের ডেস্কে ধূমায়িত এক কাপ কফি রেখে নিজের ডেস্কে ফিরে গেল চার্লস ক্যারন। টাইপ করা একটা কাগজ তুলে নিল সে। কাগজের ডান দিকে সাতটা

দেশের নাম টাইপ করা, প্রতিটি দেশের নামের সাথে সে-দেশের হোমিসাইড ডিভিশনের প্রধান বা উপ-প্রধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাগজটার বাঁ দিকে কার সাথে কখন টেলিফোন যোগাযোগ করবেন কুড র‍্যাবো তার নির্ধারিত সময়সূচী টাইপ করা রয়েছে। বসের নির্দেশ পাবার পর নির্দেশটার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছে ক্যারনকে। সান্তিনো ভ্যালেন্টি রোম থেকে লন্ডনে পৌঁচেছে, সুতরাং, কুড র‍্যাবো তার খোঁজ ইংল্যান্ডের কাছেই চাইবেন, এটা বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। তাই সবার আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ক্রাইম সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করেছে সে। সান্তিনো ভ্যালেন্টির আসল পরিচয় কি জানার জন্যে বাকি ছয়টা দেশের সাথে যোগাযোগ করবেন বস্, এটা বুঝতেও অসুবিধে হয়নি তার।

'মশিয়ে,' ক্যারন বলল, 'লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিসে আলাদা কোন হোমিসাইড সেকশন নেই, তাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ক্রাইম সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর...'

'খুব ভাল করেছ,' মুচকি হেসে বললেন কুড র‍্যাবো। 'অ্যান্থনী গ্যালিভার আমার বিশেষ বন্ধু। অনুরোধ করলে গোপনীয়তা রক্ষা করবে, এ বিশ্বাস করা যায়। ক'টার সময়?'

'সাড়ে সাতটা।'

'তোমার তালিকায় সবশেষে কে রয়েছেন?'

'ইটালির বিলি গফ,কমিশনার হোমিসাইড ডিভিশন, সাড়ে দশটায়।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন কুড র‍্যাবো। শেষ চুমুক দিলেন কফির কাপে। একটা নতুন চুরুট ধরালেন। লালচে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে চোখ বুজে হাত বুলালেন ক'বার। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি জানো, আসলে কাজটা তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আমি অদৃশ্য একটা হাতের কারসাজি অনুভব করছি। কি যেন লুকানো হচ্ছে আমাকে। যাই হোক, এটা আমার সন্দেহপ্রবণ মনের অনুমান মাত্র, সত্য নাও হতে পারে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক এবার।'

বসের কথা শুনে বিস্মিত হলো ক্যারন। কিন্তু যতটুকু তিনি বলেন তার বেশি জানার কৌতূহল কেউ প্রকাশ করলে তিনি বিরক্ত হন, একথাটা জানা থাকায় বসকে সে কোন প্রশ্ন করল না। নতুন একটা চিন্তার খোরাক পাওয়া গেছে, এতেই সে খুশি।

লন্ডন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। ক্রাইম সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অ্যান্থনী গ্যালিভার টেলিফোনের রিসিভার রেখে কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কপালে চিন্তার রেখা, গভীর তন্ময়তার সাথে কি যেন ভাবছে। 'মাই গড!' অস্ফুটে বিস্ময় ধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। মাথা নিচু করে দ্রুত বেরিয়ে এল সে কমিউনিকেশন রূম থেকে। একসাথে তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে গেল দোতলায়, নিজের অফিসে।

খবরটা হজম করার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় নিল সে। এমন একটা দুনিয়া কাঁপানো সংবাদ, অথচ বন্ধু কুড র‍্যাবো তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন, এ-খবর ছড়ানো চলবে না। মুচকি একটু হাসল অ্যান্থনী গ্যালিভার।

ছড়াতে হবে না, এ-খবরের গায়ে পাখা গজাবে।

পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, একজন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠাল সে। কালো কমপ্লিট স্যুট পরা পি-এ, হাতে নোট বুক নিয়ে তখুনি এসে পৌঁছল।

'এক্ষুণি সেন্ট্রাল রেকর্ডে যাও। কথা বলবে স্বয়ং চীফ সুপারিনটেনডেন্টের সাথে। বলবে, এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ, এই মুহূর্তে এর বেশি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কাজটা হলো, এ-দেশের জীবিত সব ক'টা পেশাদার আততায়ী সম্পর্কে···'

'আততায়ী, স্যার?' চোখ কপালে উঠে গেল পি-এ-র।

'হ্যাঁ, আততায়ী,' অ্যান্থনী গ্যালিভার গম্ভীর হয়ে বলল, 'সাধারণ খুনী নয়, কড়া নিরাপত্তাধীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দেশের মাথা—এদেরকে খুন করার যোগ্যতা রাখে এমন একজন আততায়ীকে খুঁজছি আমরা।'

'কিন্তু, স্যার, এ-ধরনের কাজ সাধারণ স্পেশাল ব্রাঞ্চ···'

'জানি,' বলল অ্যান্থনী গ্যালিভার। 'রুটিন চেক শেষ করে স্পেশাল ব্রাঞ্চকেই দেব দায়িত্বটা। শোনো, দুপুরের আগে রেজাল্ট পেলে খুশি হব, চীফ সুপারিনটেনডেন্টকে এ-কথাটা জানাতেও ভুলো না।'

'ইয়েস, স্যার।'

পি-এ বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর পরই অ্যান্থনী গ্যালিভার ফোন করল স্পেশাল ব্রাঞ্চের চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ওয়ার্ডকে। ওয়ার্ড জানাল দশ মিনিটের মধ্যে ছুটি নিয়ে গলফ খেলতে রওনা হবে সে। গ্যালিভার বলল, 'সিরিয়াস টাইপের টপ সিক্রেট ব্যাপার। প্রধান মন্ত্রীর বিদেশী বন্ধুর বিপদ।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর স্পেশাল ব্রাঞ্চের চীফ বলল, 'কি চাও তুমি?'

'আধ ঘণ্টার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'চলে এসো।'

আধঘণ্টার জায়গায় দেড় ঘণ্টা স্থায়ী হলো ওদের আলোচনা। দ্রুত গরম কফি খেতে গিয়ে দু'জনেরই জিভ পুড়ে গেল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দেশীয় এবং দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আগত বিদেশী রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সুতরাং সম্ভাব্য পলিটিক্যাল কিলার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অন্য যে-কোন শাখার চেয়ে অনেক বেশি। ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখার আগেই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ওয়ার্ড অ্যান্থনী গ্যালিভারকে নিরাশ করল।

বলল, 'ফ্রান্স যে-ধরনের খুনীকে খুঁজছে সে-ধরনের কোন খুনীকে ইংল্যান্ড জন্ম দেয়নি, থ্যাঙ্কস গড। সান্তিনো ভ্যালেন্টি ব্রিটিশ নয়, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। তবে, সাবধানের মার নেই, তাই ফাইল পত্র ঘেঁটে দেখব। তার আগে সান্তিনো ভ্যালেন্টির খবর যোগাড় করার জন্যে একজন ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্টকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারও আগে জানতে চাই, ব্যাপারটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানালে আমাদের ওপর ভবিষ্যতে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে মনে করো তুমি?'

অ্যান্থনী গ্যালিভার হাসল। বলল, 'ক্লড র‍্যাঁবো আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, সে-

দায়িত্ব আমি তোমার কাছে হস্তান্তর করছি। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার মালিক তুমি। প্রতিক্রিয়া বিরূপ হবে মনে করলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারো। তবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে না জানাবারই অনুরোধ করব তোমাকে।'

'কেন?'

'দরকার মনে করলে ফ্রান্সের ঊর্ধ্বতন মহল থেকেই আমাদের ঊর্ধ্বতন মহলকে জানানো হবে,' -বলল অ্যান্থনী গ্যালিভার। 'ব্যাপারটা এখনও বোধহয় তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি, তাই তারা জানাতে চাইছে না।'

'হুঁ,' গম্ভীর হলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের চীফ। কিন্তু এ ব্যাপারে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে সম্পর্কে কোন আভাস দিল না।

অ্যান্থনী গ্যালিভার বিদায় নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল। লাঞ্চের আগেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ফোনে তাকে জানাল, 'আমার অনুমানই সত্য। আমাদের রেকর্ডে প্রথম শ্রেণীর পলিটিক্যাল কিলার একজনও নেই।'

'ক্লড র‍্যাবোর তদন্ত পরিচালনা পদ্ধতি চিরকালই উদ্ভট, জানোই তো,' ক্রাইম সেকশনের অ্যান্থনী গ্যালিভার বলল, 'লোকটাকে ধরা ওর কাছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লোকটার জন্ম, দেশ, নাগরিকত্ব, অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। যাই হোক, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যেটার ওপর, সে-ব্যাপারে আমরা ওকে সাহায্য করতে পারছি না, একথা ওকে জানিয়ে দেব আমি। সান্তিনো ভ্যালেন্টির ব্যাপারে কি জানাব ওকে? স্পেশাল ব্রাঞ্চ কি লোকটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিচ্ছে?'

'অবশ্যই,' ওয়ার্ড জানাল, 'ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েডকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি আমি। দায়িত্বটা জাতীয় গুরুত্ব বহন করছে, পরিষ্কার বুঝেছে সে। ইতিমধ্যে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজে।'

'ধন্যবাদ, ওয়ার্ড,' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল অ্যান্থনী গ্যালিভার। নিজের কাঁধ থেকে ঝামেলাটা নেমে যাওয়ায় আরাম বোধ করছে সে। 'এ ব্যাপারে ম্যালকম লয়েডই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, কোন সন্দেহ নেই।'

অ্যান্থনী গ্যালিভারের পি-এ সেন্ট্রাল রেকর্ড থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এল লাঞ্চ আওয়ারে। তার কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল গ্যালিভার। এবার প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে মেসেজ লিখতে বসল সে। লিখল, 'আজকের তারিখে আপনার বিশেষ অনুরোধের উত্তরে জানাচ্ছি সমস্ত ক্রিমিন্যাল রেকর্ডপত্র খুঁজেও সে ধরনের কোন ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাইনি। আরও তথ্যানুসন্ধানের জন্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ছদ্মনামধারী লোকটাকে খুঁজে বের করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড। কোন সুখবর পাওযা মাত্র তিনি আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।' মেসেজ পাঠাবার সময়— '১২ অক্টোবর, বেলা সাড়ে বারোটা।'

ব্রাসেলস এয়ারপোর্টে দুপুর ঠিক বারোটার সময় রানাকে নিয়ে নামল প্লেন। মেইন টার্মিন্যাল বিল্ডিংয়ের একটা অটোমেটিক লকারে সুটকেস তিনটে রেখে শহরে ঢুকছে ও। সাথে থাকছে শুধু হ্যান্ডগ্রিপটা, তাতে নিত্য ব্যবহার্য ব্যক্তিগত

জিনিস ছাড়া রয়েছে প্লাস্টার অভ প্যারিস, কটন উলের প্যাড এবং ব্যান্ডেজ। ট্যাক্সি নিয়ে মেইন রেলওয়ে স্টেশনে পৌছল ও, ট্যাক্সিকে বিদায় করে দিয়ে হাজির হলো লেফট লাগেজ অফিসে।

রাইফেল ভরা ফাইভার সুটকেসটা একহপ্তা আগে কেরানী যে শেলফে তুলে রেখেছিল সেখানেই পড়ে রয়েছে দেখতে পেল রানা। স্লিপ দেখিয়ে সুটকেসটা ফেরত নিল ও। বাইরে বেরিয়ে এসে স্টেশনের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে সস্তা, নোংরা একটা হোটেল খুঁজে বের করল। দুনিয়ার সব প্রধান রেলওয়ে স্টেশনের কাছেপিঠে এই ধরনের হোটেল থাকে, যেখানে বোর্ডারদেরকে কোন অহেতুক প্রশ্ন করা হয় না, নগদ পয়সা ঢাললে যে-কেউ এখানে আশ্রয় এবং আহারের নিশ্চয়তা পেতে পারে।

শুধু এক রাতের জন্যে সিঙ্গেল একটা কামরা ভাড়া নিল রানা। স্থানীয় বেলজিয়ান টাকায় অগ্রিম মিটিয়ে দিল ভাড়া (এয়ারপোর্টে নেমেই কিছু ব্রিটিশ মুদ্রা বেলজিয়ান মুদ্রায় রূপান্তরিত করে নিয়েছে ও)। পোর্টারের সাহায্য না নিয়ে সুটকেসটা নিজেই বয়ে নিয়ে গেল দোতলায় নিজের কামরায়। কামরায় ঢুকে প্রথমেই ভাল ভাবে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। বেসিনের ঠাণ্ডা পানির কল ছেড়ে দিয়ে হ্যান্ডগ্রিপ থেকে বের করল প্লাস্টার এবং ব্যান্ডেজ। তারপর কাজে বসল।

কাজ শেষ করার পর দু'ঘণ্টার উপর সময় লাগল প্লাস্টারটা শুকাতে। দীর্ঘ এই সময়টা শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলের মত ভারী পা-টা একটা টুলের উপর তুলে বসে রইল রানা। ফিলটার টিপড্ সিগারেট পোড়াল কয়েকটা, জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘের গায়ে শিশুর মত সরল একটা বয়স্ক লোকের মুখ দেখল বারবার। অদ্ভুত একটা জ্বালা অনুভব করছে ও। গিলটি মিয়া, সালমা, সালমার প্রেমিক—এদের কথা মনে পড়লেই মাথায় আগুন ধরে যায় ওর, শরীরের ভিতর শিরায় উপশিরায় অন্ধ আক্রোশে ছুটোছুটি শুরু করে দেয় রক্ত প্রবাহ। এই প্রতিক্রিয়া শুভ লক্ষণ নয়, জানে রানা। তাই ভয় পায়। ভাবাবেগ প্রশ্রয় পেলে কাজে ভুল থেকে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে। এই কাজটায় অন্তত কোন ভুল করার ঝুঁকি নিতে চায় না রানা। মেঘের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে পরীক্ষা করল আবার প্লাস্টারটা। না, আরও শক্ত না হলে পা-টা নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না।

রাইফেল ভরা ফাইবার সুটকেসটা এখন খালি অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। হঠাৎ যদি মেরামতের কাজে কখনও দরকার হয় ভেবে অবশিষ্ট কয়েক আউন্স প্লাস্টারের সাথে বেঁচে যাওয়া খানিকটা ব্যান্ডেজ হ্যান্ডগ্রিপে ভরে রেখেছে সে। সোয়া দুই ঘণ্টা পর প্লাস্টারটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো রানা। লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে জিনিসটা। দু'হাত দিয়ে ধরে ধীরে ধীরে টুল থেকে নামাল ভারী পা-টা। দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল কোনমতে। হাঁটতে গিয়ে হেসে ফেলল রানা। ভান করার দরকার হবে না, এমনিতেই খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। সস্তা দরের ফাইবার সুটকেসটা খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল কামরায় এমন কিছু থেকে যাচ্ছে কিনা যা সন্দেহের কারণ হতে পারে। সিগারেটের

অবশিষ্টাংশ আর ছাই জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল অ্যাশট্রেটা। তারপর তৈরি হলো বেরিয়ে পড়ার জন্যে।

সিঁড়ির নিচে নেমে ডেস্কের পিছনের কামরায় কেরানীকে বসে লাঞ্চ খেতে দেখে খুশি হলো রানা। কিন্তু হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজা মাত্র একটাই, এবং সেটার কাছে যেতে হবে ডেস্কের পাশ ঘেঁষে, তখন এদিকে তাকালে তাকে পরিষ্কার দেখতে পাবে লোকটা। কামরার ভিতর থেকে ওর পা দেখতে না পেলেও, এগোবার ভঙ্গি দেখেই টের পেয়ে যাবে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ও। খানিক আগে যে লোককে দিব্যি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে দেখেছে তাকে খোঁড়াতে দেখলে বিস্মিত হবে সে, হয়তো খাবার ফেলেই ছুটে বেরিয়ে আসবে ব্যাপার কি জানার জন্যে। ঝুঁকিটা নিতে রাজি নয় রানা। বেরিয়ে যাবার দরজা দিয়ে কেউ ঢুকছে না, লক্ষ করল ও। কাঁচের কবাট দুটোর উপর চোখ রেখে হ্যান্ডগ্রিপটা বুকের সাথে চেপে ধরে দুই হাতের কনুই আর দুই পায়ের হাঁটু মেঝেতে রাখল ও, হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগোল।

ডেস্কের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে উঠে দাঁড়াল রানা। কাঁচের কবাট খুলে বেরিয়ে এল ঝাঁ ঝাঁ রোদে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেইন রোড পর্যন্ত হেঁটে এল রানা। ঝড় তুলে ধাবমান একটা ট্যাক্সি ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল ওর সামনে। সেটায় উঠে পড়ল রানা। আবার ছুটে চলল ট্যাক্সি এয়ারপোর্ট অভিমুখে।

হাতে পাসপোর্ট নিয়ে আলিটালিয়া এয়ার-লাইন্সের কাউন্টারে হাজির হলো রানা। মেয়েটার মুখে কোমল, মমতা মাখানো সহানুভূতির হাসি ফুটল।

'অরগ্যানের নামে মিলানের একটা টিকেট রিজার্ভ করা হয়েছে দু'দিন আগে, দেখো তো,' বলল রানা।

বিকেলের মিলান ফ্লাইটের বুকিং চেক করে দেখল মেয়েটা। দেড় ঘণ্টা পর ছাড়বে প্লেন। 'হ্যাঁ, মশিয়ে,' বলল সে। 'টিকেট রিজার্ভ করা হয়েছে, কিন্তু দাম দেয়া হয়নি। এখন দেবেন?'

এখানেও নগদ টাকা দিয়ে টিকেট নিল রানা। একজন পোর্টারের সাহায্যে লকার থেকে সুটকেস তিনটে আনিয়ে নিয়ে কাস্টমস শেডে ঢুকল। বেলজিয়াম ত্যাগ করছে ও, সুতরাং চেকিংটা তেমন খুঁটিয়ে করা হলো না, শুধু পাসপোর্ট দেখে ছাড়পত্র দেয়া হলো ওকে। প্যাসেঞ্জার ডিপারচার লাউঞ্জের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় বসে ধীরেসুস্থে লাঞ্চ খেয়ে হাতের সময়টা ব্যয় করল ও।

এই ব্যস্ততার যুগেও মানুষের দুর্দশা দেখে মানুষ কাতর হয়, তার প্রমাণ পাচ্ছে রানা। ওর পায়ের অবস্থা দেখে সবাই ওর সাথে অযাচিত ভাবে ভাল ব্যবহার করছে। কোচে ওঠার সময় অনেকগুলো সাহায্যের হাত এগিয়ে এল। প্লেনের কাছে কোচ থামতে সবাই নামতে সাহায্য করতে চাইলেও সবিনয়ে জানাল রানা, একাই নামতে পারবে সে। সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের দরজা পর্যন্ত উঠতে অস্বাভাবিক সময় নিল রানা। ওর চোখমুখ দেখে কারও বুঝতে বাকি থাকল না যে বেচারার ভারি কষ্ট হচ্ছে। সুন্দরী ইটালিয়ান এয়ারহোস্টেস ওর হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করল, ওকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে প্লেনের মাঝখানে দুই সারি

মুখোমুখি সীটের একটিতে বসিয়ে দিল, এখানে পা নাড়াচাড়া করার জন্যে সবচেয়ে বেশি জায়গা রয়েছে।

আরোহীরা রানার সামনে দিয়ে নিজেদের সীটে যাবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে, যাতে রানার পায়ের সাথে ধাক্কা-টাক্কা লেগে না যায়। রানা ওদিকে সীটে হেলান দিয়ে হাসছে, সবাইকে বোঝাতে চাইছে নিজের দুর্দশায় মন খারাপ করে নেই সে।

চারটে পনেরো মিনিটে প্লেন আকাশে উঠল। এয়ারপোর্টটাকে একপাক ঘুরে দক্ষিণ-মুখো হয়ে উড়ে চলল মিলানের দিকে।

লন্ডন। বারোই অক্টোবর। দুপুর একটা।

কাজ-পাগল লোক বলতে যা বোঝায়, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড ঠিক তাই। দীর্ঘদেহী, ক্লিনশেভ, উন্নত নাসিকার অধিকারী ম্যালকম লয়েডের সবচেয়ে বড় গুণ কোন্ কাজের কি গুরুত্ব তা বুঝতে কখনও সে ভুল করে না। কাজটা যত বড়ই হোক, যত জটিল আর অসম্ভব বলেই মনে হোক, ভয় পায় না সে।

চীফের কাছ থেকে নতুন দায়িত্বটা বুঝে নিয়ে দ্রুত নিজের অফিসে ফিরে এল সে। চেহারার বর্ণনা, ছদ্ম একটা নাম—ব্যস, এর বেশি কিছু জানানো হয়নি তাকে। কুছ পরোয়া নেই, কাজ শুরু করার জন্যে এটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। নিজস্ব নিয়মে লোকটাকে সে খুঁজে বের করে ফেলবে, এ আত্মবিশ্বাস তার আছে।

রিসার্চের কাজ করছে এমন দু'জন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে হাতের কাজ বাক্সবন্দী করে রাখার নির্দেশ দিয়ে ডেকে পাঠাল সে। যাকে খুঁজতে হবে তার চেহারার বর্ণনা দিল, ছদ্মনামটা জানাল, কিন্তু কেন তাকে খোঁজা হচ্ছে তা বলল না। ঠিক কোন্ সূত্র ধরে এগোতে হবে সে-সম্পর্কেও নির্দিষ্ট নির্দেশ পেল তারা ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েডের কাছ থেকে।

কাজ বুঝিয়ে দেবার এমনই গুণ, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর দু'জন দায়িত্বটাকে জলবৎ তরলং জ্ঞান করল। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা সান্তিনো ভ্যালেন্টিকে খুঁজে বের করে ফেলবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কাজে।

মিলান। লিনেট এয়ারপোর্টে রানার প্লেন নামল বিকেল ছ'টার একটু পর। সিঁড়ির পাদদেশে নামতে ওকে সাহায্য করল মমতাময়ী এয়ারহোস্টেস মেয়েটা। টারমাক থেকে ওর হাত ধরে মেইন টার্মিন্যাল বিল্ডিংয়ে নিয়ে এল একজন গ্রাউন্ড হোস্টেস।

পাসপোর্ট চেকিংটা স্রেফ একটা অনুষ্ঠানিকতা মাত্র, বিনা ঝামেলায় ঢুকে গেল। এরপরই শুরু হলো বিপজ্জনক কাস্টমস চেকিং। মুহূর্তে বুঝে নিল রানা, রাইফেলের পার্টসগুলো এত যে কায়দা করে লুকানো হয়েছে, এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে তার কোন প্রয়োজন ছিল কিনা, এবং লুকাবার কায়দাটা নিখুঁত হয়েছে কিনা। হোল্ড থেকে সুটকেসগুলো নিয়ে এসে রাখা হলো কাস্টমস বেঞ্চে। হ্যান্ডগ্রিপটা আগেই রানা রেখেছে ওখানে।

প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ঝুঁকি। রানার মুখ দেখে কেউ কিছু টের পাচ্ছে না. কিন্তু বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে ওর। ট্রাউজারের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ঘামে ভেজা হাত দুটো কাপড়ের উপর দিয়ে উরুর সাথে ঘসে মুছে নিচ্ছে রানা। ঢোক গিলে হাত দুটো বের করল। ইঙ্গিতে একটা পোর্টারকে ডেকে সুটকেস তিনটেকে এক সারিতে সাজিয়ে রাখতে বলল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল ও। আশ্চর্য ভারী আর অবশ লাগছে শরীরটা। টেবিলে বসা একজন তরুণ কাস্টমস অফিসার মুখ তুলে তাকাল। রানার চেহারাটা বোধহয় পছন্দ হলো না তার, কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল মুখটা।

'সিনর, এর সবগুলোই আপনার ব্যাগেজ?' রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল অফিসার।

'হ্যাঁ, তিনটে স্যুটকেস আর একটা হ্যান্ডগ্রিপ।'

'আইন সম্মত নয় এমন কিছু সাথে আছে?'

'না, নেই।'

'ভ্রমণের উদ্দেশ্য, সিনর? বিজনেস?'

'না, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। ইচ্ছা আছে লেকের পাড়ে বসে মাছেদের সাথে সময় কাটাব।'

তরুণ কাস্টমস অফিসারের গাম্ভীর্য অম্লান। হাত পাতল সে। 'পাসপোর্ট দেখি।'

পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে অফিসারের হাতে দিল রানা। দেবার সময় চোখাচোখি হলো। লক্ষ করল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের উপর তাকিয়ে মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে লোকটা। পাসপোর্টটা হাতের তালুতে পড়তেও চোখ নামাল না সে। আরও কয়েক সেকেন্ড অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর তাকাল পাসপোর্টের দিকে। খুঁটিয়ে, গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করল সেটা। কোন খুঁত আবিষ্কার করতে না পেরেই যেন মেজাজ তার আরও এক ডিগ্রী চড়ে গেল। অবশ্য চেহারাতেই শুধু তার ছাপ পড়ল, মুখে কিছু বলল না। পাসপোর্টটা নিঃশব্দে ফিরিয়ে দিল সে রানাকে।

'ওটা খুলুন,' বড় তিনটে সুটকেসের একটার দিকে আঙুল তুলে বলল সে।

কোনরকম ব্যস্ততা বা জড়তা প্রকাশ পেল না রানার আচরণে। ঠোঁটে একটা সিগারেট তুলেছিল, কিন্তু ধরানো হয়নি। প্রথমে সেটায় আগুন ধরাল। তারপর চাবির গোছা বের করে রিঙ থেকে বেছে নিল নির্দিষ্ট একটা চাবি, খুলে দিল সুটকেসটা। পোর্টার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, হাত বাড়িয়ে সে-ই সুটকেসের ডালাটা তুলে সরিয়ে দিল পিছন দিকে।

'নামাও সব,' কর্কশ গলায় হুকুম করল পোর্টারকে অফিসার।

খুশি হয়ে উঠল রানার মন। ভাগ্য সম্ভবত বেঈমানী করবে না, ভাবছে ও, ছোকরা অফিসার নিজের হাতে চেক করছে না স্যুটকেসগুলো। ওর খুশি হবার আরেকটা কারণ, ডেনিশ ধর্মযাজক এবং আমেরিকান ছাত্রের কাপড়-চোপড় ছাড়া সুটকেসটায় বিশেষ কিছু নেই। ডার্ক-গ্রে সুট, আন্ডারঅয়্যার, সাদা শার্ট, স্নেকার, কালো ওয়াকিং জুতো, উইন্ডচিটার, মোজা ইত্যাদি দেখতে দেখতে একঘেয়েমিতে পেয়ে বসল অফিসারকে। ডেনিশ ভাষার বইটাও উত্তেজিত করতে পারল না

তাকে। উঁকি মেরে খালি সুটকেসটা দেখল বটে একবার, কিন্তু সাইড লাইনিংয়ের উপর সযত্নে করা রানার দ্বিতীয় সেলাইটা তার চোখেই পড়ল না, অতএব নকল পরিচয়পত্রগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা দেখা দিল না। খোঁজার মত খুঁজলে ওগুলো বেরিয়ে পড়বে, জানে রানা, কিন্তু এও জানে যে এক নজরে দেখার সময় সন্দেহজনক কিছু চোখে না পড়লে কোন কাস্টমস অফিসারই খোঁজার মত করে খোঁজার কষ্টটুকু স্বীকার করে না।

স্বয়ংসম্পূর্ণ রাইফেলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যার যার গোপন খোপে মাত্র তিন ফিট দূরে টেবিলের এপারে রয়েছে, কিন্তু অফিসারের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। পোর্টারকে ইঙ্গিত করল সে। পোর্টার দ্রুত এবং সযত্নে আবার সব তুলে রাখতে শুরু করল সুটকেসে।

পোর্টারকে দিয়েই বাকি দুটো সুটকেস এবং হ্যান্ডগ্রিপটা চেক করল ইটালিয়ান অফিসার। ইতোমধ্যে রানার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে সে। মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে, বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সাথেই হাত নেড়ে জানিয়ে দিল, পরীক্ষা করা শেষ হয়েছে, আপদ এবার বিদায় হতে পারে।

ট্যাক্সিতে চড়ে মোটা বকশিশ দিল পোর্টারকে রানা। সগর্জনে ধাবমান হাজার হাজার যানবাহনের স্রোতে মিশে গেল ওর ট্যাক্সি। মিলান শহরটার প্রায় কিছুই দেখা হলো না, ট্যাক্সি পৌঁছে গেল সেন্ট্রাল স্টেশনে।

এখানে আরেকজন পোর্টারের সাহায্য নিল রানা। লোকটাকে সাথে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাজির হলো লেফট-লাগেজ অফিসে। ট্যাক্সিতে থাকতেই হ্যান্ডগ্রিপ থেকে ইস্পাতের কাঁচিটা বের করে পকেটে ভরে নিয়েছে ও। লেফট-লাগেজ অফিসে হ্যান্ডগ্রিপ এবং দুটো সুটকেস জমা রাখল, সাথে রাখল লম্বা ফ্রেঞ্চ মিলিটারি ওভারকোট ভরা সুটকেসটা। এটায় এখনও প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে।

আলজিরীয় পোর্টারকে আসসালামালেকুম জানিয়ে পুরুষদের টয়লেটে ঢুকল রানা। বাঁ দিকের ওয়াশবেসিনগুলোর পাশে প্রস্রাবের কমোডে এক লোক দাঁড়িয়ে পানি ছাড়ছে। সুটকেসটা রেখে একটা বেসিনের সামনে দাঁড়াল রানা। কল ছেড়ে দিয়ে ঘষে ঘষে হাত ধুচ্ছে। কিন্তু যেই প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে গেল লোকটা অমনি সুটকেসটা তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের একটা ল্যাট্রিনে ঢুকে পড়ে দ্রুত বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ল্যাভেটরি সীটের উপর পা তুলে দিয়ে প্লাস্টার খসাতে শুরু করল রানা। নিঃশব্দে দশ মিনিট চেষ্টার পর পা-টা তুলোর প্যাড আর প্লাস্টার মুক্ত হলো। সিল্কের মোজা আর সরু লেদার মোকাসিন জোড়া পায়ে গলিয়ে নিল ও। প্যাড আর প্লাস্টারের জঞ্জালগুলো ফেলে দিল প্যানে।

টয়লেটের উপর সুটকেসটা রেখে খুলল সেটা রানা। গোল ইস্পাতের টিউবগুলো ওভারকোটের ভাঁজের ভিতর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল। ভরাট হয়ে গেছে সুটকেস, ভিতরের স্ট্র্যাপ টান টান হয়ে উঠেছে, ঝাঁকি খেলেও টিউবগুলো পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধাতব আওয়াজ তুলবে না।

সুটকেসটা বন্ধ করে নিজের চারদিক ভাল করে দেখে নিল একবার রানা, কিছুই পড়ে নেই। নিঃশব্দে খুলল এবার দরজাটা। কবাট দুটো আধ ইঞ্চি ফাঁক

করে বাইরে তাকিয়ে দেখল চারজন লোক ওর দিকে পিছন ফিরে ওয়াশবেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আরও দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে।

নিঃশব্দে কবাট দুটো আরও উন্মুক্ত করল রানা, চৌকাঠ পেরোল, তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে।

ভাল পা নিয়ে এখন আর লেফট-লাগেজ অফিসে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই একজন পোর্টারের সাহায্য নিল রানা। তাকে ব্যাখ্যা করে বলল, হাতে সময় কম, টাকা ভাঙিয়ে, সুটকেসগুলো উদ্ধার করে দ্রুত ট্যাক্সি ধরতে হবে ওকে। কাগজের স্লিপটার সাথে এক হাজার লিরার একটা নোট পোর্টারের হাতে গুঁজে দিয়ে লেফট-লাগেজ অফিসের কেরানীটাকে চোখ-ইশারায় দেখিয়ে দিল। বলল, ইংলিশ পাউন্ড লিরায় রূপান্তরিত করার জন্যে ওদিকের কাউন্টারে যাচ্ছে ও।

সানন্দে ঘাড় নেড়ে লেফট-লাগেজ অফিসের দিকে চলে গেল পোর্টার। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ইংলিশ পঁচিশ পাউন্ডের বিনিময়ে ইটালিয়ান মুদ্রা নিল রানা, এই সময় বাকি তিনটে লাগেজ নিয়ে ফিরে এল পোর্টার।

দু'মিনিট পর। মেইন রোড piazza Duca d' Aosta-এর উপর দিয়ে বিপজ্জনক গতিতে হোটেল কন্টিনেন্টালের দিকে ছুটছে রানার ট্যাক্সি।

হোটেলের ফ্রন্ট হলে রজনীগন্ধার মত ধবধবে সাদা পোশাক পরা গোলাপের মত লাল টুকটুকে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ওকে দেখে নিঃশব্দে এক পশলা হাসি ছড়াল।

'দু'দিন আগে লন্ডন থেকে ফোনে অরগ্যানের নামে একটা কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে,' বলল রানা।

'আপনি?'

'অরগ্যান।'

এক মিনিটের মধ্যে নিজের কামরায় পৌঁছে গেল রানা। আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে মনের সুখে ভিজল ও। দাড়ি কামাল। দুটো সুটকেস ওয়ারড্রোবে ভরে সাবধানে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ওর কাপড়-চোপড়ে ভরাট হয়ে থাকা তৃতীয় সুটকেসটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানায়। আজ রাতে পরার জন্যে নেভী-ব্লু উল-অ্যান্ড-মোহায়ের সামার লাইটওয়েট স্যুটটা ওয়ারড্রোবের বন্ধ দরজার গায়ে ঝুলছে। ডাভ-গ্রেরঙের স্যুটটা স্পঞ্জ ও ইস্ত্রী করার জন্যে তুলে দেয়া হয়েছে হোটেলের ভ্যালিটের জিম্মায়।

আজ আর হাতে কোন কাজ নেই রানার। ককটেল নিয়ে বসবে ও, ডিনার খাবে, এবং বেশি রাত না করে ঘুমিয়ে পড়বে—কেননা পরদিন, তেসরা অক্টোবর, সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে ওর।

দুই

প্যারিস। বারো তারিখ। রাত ন'টা।

ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের উপপ্রধান রিপোর্ট করছে ইউনিয়ন কর্সের কাপু উ সেনের কাছে।

রিপোর্টের সারমর্ম: গার দু নর্দের কাছাকাছি একটা পোস্টাফিস থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটা হোটেলের নাম্বারে টেলিফোন মেসেজ পাঠানো হয়েছে। কাপু উ সেনের নির্দেশে প্যারিস থেকে ঢাকায় করা সমস্ত টেলিফোন কল টেপ করার ব্যবস্থা থাকায় এই মেসেজ ধরা পড়েছে। কিন্তু টেপের কাছে যে লোকটা হাজির ছিল তার উপস্থিত বুদ্ধির অভাবে সমস্ত আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঢাকায় যে মেসেজটা পাঠানো হয়েছে তা হলো: 'আমি পারু। শোনো, হাতে সময় কম। যা বলছি কাগজে টুকে নাও। শুরু করছি। নারার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে। রিপিট। নারার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে। একজনকে কথা বলানো হয়েছে। মরার আগে বলে গেছে সব। শেষ।' মেসেজটা রিসিভ করেছে নাহাসো।

'পারু মানে রূপা,' ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের উপপ্রধানকে জানাল উ সেন। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে বাস্তববাদী স্পেশাল এজেন্ট। নাহাসো মানে সোহানা,' চিন্তা করার অবকাশ না নিয়ে গড় গড় করে মুখস্থ বুলির মত বলে যাচ্ছে সে, 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আরেক গর্ব।' অকস্মাৎ ধারাল ছুরির মত নিক্ষিপ্ত হলো একটা প্রশ্ন, 'রূপা ব্যাপারটা জানল কিভাবে?'

'মশিয়ে, এর উত্তর কর্নেল বোল্যান্ড আমার চেয়ে ভাল দিতে পারবেন,' ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের উপপ্রধান ম্লান মুখে বলল। 'তবে আমার ধারণা, ম্যাটাপ্যানকে প্যারিসে নিয়ে আসার জন্যে যাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল সেই ভিক্টর কাউলাস্কির কাজ এটা। ম্যাটাপ্যানকে আমরা হাতে পাবার পর তাকে তার বাড়িতে ফিরে যেতে দেয়া হয়েছিল। সে-সময় রানার প্লট সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। ম্যাটাপ্যানকে আমরা ধরেছি, এই ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার তখন কোন দরকার ছিল না। পরে অবশ্য পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। বোঝা যাচ্ছে, সময় মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। যাই হোক, আমার ধারণা স্পেশাল এজেন্ট রূপাকে খবরটা দিয়েছে এই ভিক্টর কাউলাস্কিই।'

'তোমার লোক পোস্টাফিসে পাকড়াও করেছে রূপাকে?'

'দুঃখিত, মশিয়ে। ওখানে পৌঁছুতে এক মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল। টেপের কাছে যে লোকটা ছিল তার গাফলতির দরুন...'

নির্মম রায় ঘোষণার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল উ সেন তিনটে শব্দ: 'আমি রূপাকে চাই!'

'জ্বী, মশিয়ে,' প্রতিশ্রুতি দিল ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের উপপ্রধান, 'একটু সময় দিন, তাকে আপনার সামনে এনে হাজির করছি।'

মিলান। বারো তারিখ। রাত দশটা।

রাজকীয় ডিনার শেষ করে নিজের কামরায় ফিরল রানা। হুইস্কির বোতল, গ্লাস, বরফ এবং এক প্যাকেট সিগারেট একটা ট্রেতে করে নিয়ে এল রুম সার্ভিস। সে চলে যেতে কামরার দরজা বন্ধ করে দিল রানা। গ্লাসে এক আউন্সের মত

হুইস্কি ঢালল। প্যাকেট থেকে নিয়ে সিগারেট ধরাল একটা।

পাঁচ মিনিট পর শুয়ে পড়ল ও। আরেক জগতে নিয়ে গেল ওকে ঘুম। দুঃস্বপ্ন দেখছে রানা।

লন্ডন। বারো তারিখ। রাত দশটা।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড তার সহকারীদের রিপোর্ট পড়ছে।

প্রথম ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তার রিপোর্টে লিখেছে: এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল এন্ট্রি বুক চেক করে জানা গেছে সান্তিনো ভ্যালেন্টি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হপ্তায় লন্ডনে পৌঁচেছে। শহরের ছোট বড় প্রায় সব হোটেলের রেজিস্ট্রেশন বুক চেক করার কাজও শেষ। সান্তিনো ভ্যালেন্টি নামে কোন লোক লন্ডনের কোন হোটেলে ওঠেনি। এই নামের কোন লোক রোম থেকে টেলিফোন করেও কোন রূম রিজার্ভ করেনি। সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত আকাশ পথে সান্তিনো ভ্যালেন্টি নামে কোন লোক লন্ডন ত্যাগ করেনি।

দ্বিতীয় ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরের রিপোর্টটা পড়ে উৎসাহ বোধ করল ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড। সেটা এই রকম:

অনুরোধ করা হলে ভাড়াটে বাড়ি যোগাড় করে দেয় লন্ডনের এমন সমস্ত সংস্থায় লোক পাঠিয়ে পাঁচজন সান্তিনো ভ্যালেন্টির খোঁজ পাওয়া গেছে যারা আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে কোন না কোন এজেন্সীর মাধ্যমে লন্ডন শহরে বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। এদের মধ্যে একজন সরাসরি রোম থেকে টেলিফোনে একটি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছিল। সংস্থা তাকে একটি একতলা বাড়ি যোগাড় করে দিয়েছে। বাড়িটা প্যাডিংটন এলাকার প্যারেড স্ট্রীটে। ইতোমধ্যে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর নিজে বাড়িটা দেখে এসেছে, সেটা খালি, তালা ঝুলছে বাইরের দরজায়। সার্চ ওয়ারেন্ট না থাকায় তল্লাশী চালাবার ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

সার্চ ওয়ারেন্ট সংগ্রহের জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, যাকে আমরা খুঁজছি তার চেহারার বর্ণনার সাথে এই সান্তিনো ভ্যালেন্টির চেহারার মিল আছে। আরও জানা গেছে, লোকটা নাকি মাছ ধরার জন্যে আইসল্যান্ডে চলে গেছে।

কাজের মানুষ ম্যালকম লয়েড অনুসন্ধানের এই অগ্রগতিতে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না। বাড়িটায় তালা ঝুলছে, তারমানে চিড়িয়া ভেগেছে নাকি? কোথায়? আইসল্যান্ডে?

কাগজ কলম নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের ছক কাটতে শুরু করল সে। প্রথম কাজ: বাড়িটা সার্চ করা। নিশ্চয়ই ওখানে কোন সূত্র পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কাজ: নতুন পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করেছে যারা তাদের চেহারার বর্ণনার সাথে সান্তিনোর চেহারা মেলে কিনা চেক করা। ইংল্যান্ড ত্যাগ করে থাকলে নিশ্চয়ই সে জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে।

তার সহকারীদেরকে নতুন আদেশ দেয়ার জন্যে টেলিফোনের দিকে হাত

বাড়াল ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড।

প্যারিস। বারো তারিখ। রাত দশটা। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কনফারেন্স রুমে বৈঠক বসেছে। ফ্রেঞ্চ হোমিসাইড চীফ ক্লড র‍্যাঁবো তাঁর প্রথম প্রোগ্রেস রিপোর্ট প্রকাশ করছেন। সভাপতিত্ব করছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

এর আগের বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিল, বিভাগীয় প্রধান এবং উপপ্রধানরা, তারা সবাই উপস্থিত। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রথমে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করলেন ক্লড র‍্যাঁবো। এতে একঘণ্টার উপর সময় লেগে গেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো: লন্ডনে সান্তিনো ভ্যালেন্টির বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেটা খালি। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটরা বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্যে ধর্মঘট পালন করছে বলে সার্চ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি স্পেশাল ব্রাঞ্চ। আশা করা যায় আগামীকাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

'বাড়ি খালি?' অধৈর্যের সাথে বলল ফ্রেঞ্চ সুরেতের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কর্নেল প্যাপন। চর্বিভরা প্রকাণ্ড মুখটা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে তার। 'তার মানে ইংল্যান্ড ত্যাগ করেছে সে। মশিয়ে র‍্যাঁবো, আমি জানতে চাই, খুনীটাকে ফ্রান্সে ঢুকতে বাধা দেবার জন্যে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন আপনি?'

ঠাণ্ডা চোখে কর্নেল প্যাপনের দিকে তাকালেন ক্লড র‍্যাঁবো। শান্তশিষ্ট মানুষটি কোন কারণে কখনও উত্তেজিত হন না, এবং কাউকে উত্তেজিত হতে দেখলে তার প্রতি তিনি করুণা বোধ করেন। কর্নেল প্যাপনের প্রতি শুধু করুণা নয়, সেই সাথে বিরক্তিও বোধ করলেন তিনি। নিত্যসঙ্গী জ্বলন্ত চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। অদ্ভুত শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'মশিয়ে, আপনাকে আমি অনুরোধ করব, এরপর থেকে কেউ যেন আমাকে জবাবদিহি চাওয়ার সুরে কোন প্রশ্ন না করে। আমাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে বলেই একটা গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চাপানো হয়েছে। আমার সাধ্য অনুযায়ী দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করছি। সবার কাছ থেকে সহযোগিতা চাই আমি, ধমক নয়।' অদ্ভুত বাঁকা একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। তিনি আবার বললেন, 'দায়িত্বটা আমি সঠিকভাবে পালন করতে পারছি না, কেউ যদি এ প্রশ্ন তুলে আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে চান, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছি, তাও সম্ভব নয়। আশা করি ক্লড র‍্যাঁবো সম্পর্কে একটা কথা উপস্থিত সবারই জানা আছে: তিনি যে-কাজে হাত দেন সে-কাজের শেষ দেখে ছাড়েন।'

'মশিয়ে ক্লড র‍্যাঁবো,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অত্যন্ত সমীহের সাথে বললেন, 'আপনার সামনে সবাইকে আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন দয়া করে আপনাকে অনভিপ্রেত কোন প্রশ্ন না করেন।'

'ধন্যবাদ, মশিয়ে,' ক্লড র‍্যাঁবো বললেন। তারপর তাকালেন কর্নেল প্যাপনের দিকে। 'মশিয়ে প্যাপন, আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, ফ্রান্সের প্রতিটি বর্ডার পোস্টের প্রত্যেক কাস্টমস অফিসারের কাছে জরুরী নির্দেশ এরই মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ফ্রান্সে ঢুকছে এমন বিদেশীদের মধ্যে যারা পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি বা কাছাকাছি লম্বা, চোখের মণি কালো, তাদের সবার লাগেজ চেক করবে তারা। পাসপোর্ট, ভিসা, রি-এন্ট্রি পাস, আইডেনটিটি কার্ড জাল কিনা তাও সংশ্লিষ্ট

এলাকার ডি-এস-ডি অফিসারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

রাগে এবং অপমানে লাল হয়ে গেছে কর্নেল প্যাপনের প্রকাণ্ড মুখটা। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে আর কথা বাড়াল না সে।

এরপর ক্লড র‍্যাবো তাঁর প্রোগ্রেস রিপোর্টের বাকি অংশ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। প্রায় একঘণ্টা সময় নিয়ে একাই কথা বলে গেলেন তিনি। মাঝখানে তাঁকে শুধু একবার বাধা দেয়া হলো।

'আমি মনে করি,' কর্নেল প্যাপন বলল, 'সান্তিনো ভ্যালেন্টি পিছিয়ে যাবে। তার উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে এ-খবর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে সে।'

'কিভাবে মশিয়ে?' প্রায় চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন ক্লড র‍্যাবো। 'এখানে উপস্থিত আমরা এই ক'জন ছাড়া আর কেউ জানে না...'

উভয় সঙ্কটে পড়ে গেল কর্নেল প্যাপন। কাপু উ সেনের নিষেধ আছে সান্তিনো ভ্যালেন্টির আসল পরিচয় যেন ইউনিয়ন কর্সের অতি বিশ্বস্ত সদস্য ছাড়া আর কেউ না জানে, বিশেষ করে ক্লড র‍্যাবোকে তো কোনমতেই জানানো চলবে না। রানার পরিচয় গোপন রাখতে হলে ম্যাটাপ্যান এবং কাউলাস্কি প্রসঙ্গও চেপে রাখতে হয়। তা রাখতে হলে ক্লড র‍্যাবোকে বলা সম্ভব নয় কিভাবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের স্পেশাল এজেন্ট রূপার মাধ্যমে ঢাকায়, এবং ঢাকা থেকে সম্ভবত রানার কাছে সব খবর পৌঁছে গেছে।

'ও-এ-এস-কে আমি ছোট করে দেখি না,' ভেবেচিন্তে, সাবধানে কথা বলছে কর্নেল প্যাপন। 'খবর সংগ্রহের নিশ্চয়ই কোন না কোন মাধ্যম আছে তাদের...'

'আমি আপনার সাথে একমত নই,' দৃঢ় স্বরে বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'আমরা কেউ ডাবলক্রস না করলে ও-এ-এস বা তার নিযুক্ত খুনী সান্তিনো ভ্যালেন্টির এসব কিছুই জানার কথা নয়। আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে মনে করতে হবে আমাদের মধ্যেই কোথাও ফুটো আছে, যেখান দিয়ে খবর বেরিয়ে যাচ্ছে।'

সবাই ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। পরিবেশটা থমথমে হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'আমি মশিয়ে র‍্যাবোর সাথে একমত। তবে, আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে কেউ ডাবলক্রস করছে না, কোথাও কোন ফুটোও নেই, অর্থাৎ ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে গেছে এ-খবর ও-এ-এস বা সান্তিনো ভ্যালেন্টি এখনও জানে না। আমরা সাবধান থাকলে ভবিষ্যতেও জানবে না।'

'তাই যেন হয়,' ক্লড র‍্যাবো বললেন। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে তা একমাত্র সময়েই জানা যাবে।'

এর পনেরো মিনিট পর মীটিং ভেঙে গেল। ঘড়িতে তখন রাত একটা। তেরো তারিখের প্রথম ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

তিন

মিলান। তেরো তারিখ।

সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙল রানার। রুম সার্ভিস বেড সাইড টেবিলে চা রেখে গেছে, কাত হয়ে শুয়ে চা পানের সাথে চোখ বুলাল কাগজের হেডিংগুলোয়। দশ মিনিট পর উঠে পড়ল ও। ড্রেসিং টেবিলের ছয় ফিট লম্বা আয়নার সামনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট দৌড়ের রুটিন ব্যায়ামটা সেরে নিল। গায়ের ঘাম শুকাবার জন্যে দশ মিনিট সময় দিয়ে ঢুকল বাথরুমে। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল, পোশাক পরল, তারপর সুটকেসের লাইনিং খুলে বের করল পাঁচ হাজার পাউন্ডের তাড়াটা। সেটা ব্রেস্টপকেটে ভরে নিয়ে নিচে নামল ব্রেকফাস্ট সারার জন্যে।

ন'টায় হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার দু'দিকে চোখ রেখে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা। পথে যতগুলো ব্যাঙ্ক চোখে পড়ল প্রত্যেকটিতে ঢুকে ভাঙিয়ে নিচ্ছে ইংলিশ পাউন্ড। দু'ঘন্টা ব্যয় করে একহাজার পাউন্ড বদলে সমমানের ইটালিয়ান লিরা সংগ্রহ করল, বাকি চার হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে নিল ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাঙ্ক। কাজ শেষ করে বিশ্রামের জন্যে একটা কাফেতে বসে এক কাপ কফি পান করল ও। তারপর দ্বিতীয় কাজ সারার জন্যে কাফে থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ফুটপাথ ধরে।

এখানে সেখানে অসংখ্য জায়গায় ঢুঁ মেরে অবশেষে রানা শ্রমিকদের এলাকা পোর্টা গ্যারিবালডিতে পৌঁছে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। একসারিতে অনেকগুলো তালা মারা গ্যারেজ। এর একটা ভাড়া নিল রানা। দু'দিনের জন্যে ভাড়া গুণতে হলো পঞ্চাশ হাজার লিরা। অল্প দিনের জন্যে বলে প্রচলিত দরের চেয়ে অনেক বেশি ধরা হলো ভাড়া।

স্থানীয় একটা হার্ডঅয়্যারের দোকান থেকে এক প্রস্থ ওভারঅলস, একজোড়া মেটাল ক্লিপার, কয়েক গজ মোটা স্টীল অয়্যার, একটা শোল্ডারিং আয়রন এবং এক ফুট শোল্ডার রড কিনল রানা। একই দোকান থেকে কেনা ক্যানভাসের একটা ব্যাগে জিনিসগুলো ভরে নিয়ে ফিরে এল গ্যারেজে। ব্যাগটা রেখে বাইরে বেরিয়ে এসে তালা মারল গেটে। চাবিটা পকেটে করে শহরের পরিচ্ছন্ন এলাকায় ফিরে এল লাঞ্চ খাবার জন্যে।

লাঞ্চ শেষ করে রেস্তোরাঁ থেকেই গাইড বুক দেখে ফোন করল একটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানীকে। প্রাথমিক আলাপ শেষ করে সন্তুষ্ট হলো রানা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছল সেখানে, দেখেশুনে ভাড়া করল একটা উনিশশো বাহাত্তর মডেলের সেকেন্ড হ্যান্ড আলফা রোমিও স্পোর্টস টু সিটার। ম্যানেজারকে জানাল, পনেরো তারিখ থেকে পনেরো দিনের জন্যে ফ্রান্সে ভ্রমণ করতে যাচ্ছে সে।

পাসপোর্ট এবং ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স সাথে নিয়েই

বেরিয়েছে রানা, সুতরাং কাছাকাছি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানী থেকে গাড়িটা বীমা করিয়ে নিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগল না। এর জন্যে মোটা টাকা জমা দিতে হলো রানাকে, প্রায় পাঁচশো পাউন্ডের সমান। গাড়ির যদি কোন ক্ষতি হয়, ক্ষতিপূরণ বাবদ এই টাকা পাবে রেন্ট-এ-কার কোম্পানী।

লন্ডনে থাকতে অটোমোবাইল এসোসিয়েশনে সন্ধান নিয়ে আগেই জেনেছে রানা, ফ্রান্স এবং ইটালি কমন মার্কেটের সদস্য বলে ইটালিতে রেজিস্ট্রি করা কোন গাড়িকে ফ্রান্সে ঢুকতে বাধা দেয়া হয় না, যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ি ভাড়া নেয়া সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট সাথে থাকে।

এক ফাঁকে করসো ভেনেজিয়ার অটোমোবাইল ক্লাব ইটালিয়ানোয় যেতে হলো ওকে। ডেস্কে খোঁজ নিয়ে অত্যন্ত নামকরা একটা ইন্সুরেন্স ফার্মের ঠিকানা জেনে নিল ও। ব্যক্তিগত যানবাহন যোগে বিদেশে ভ্রমণে যেতে চাইলে নিয়ম আছে আলাদাভাবে আরও একটা বীমা করিয়ে নিতে হয়। এই ইন্সুরেন্স ফার্মটির সাথে ফ্রান্সের ইন্সুরেন্স ফার্মের বিশেষ সদ্ভাব আছে, ডেস্ক ক্লার্ক জানাল ওকে, সুতরাং এখান থেকে বীমা করালে ফ্রান্সের সর্বত্র তা গুরুত্ব বহন করবে।

ইন্সুরেন্স কোম্পানী থেকে তালিকা নিয়ে কন্টিনেন্টালে ফিরল রানা। হোটেলের পার্কিং এলাকায় গাড়ি রেখে নিজের কামরায় গেল। রাইফেল ভরা সুটকেসটা নিয়ে তখুনি নেমে এসে গাড়িতে চড়ল আবার। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ভাড়া করা গ্যারেজে।

ভিতর থেকে গেট বন্ধ করে দিয়ে কাজে হাত দিল রানা। শোল্ডারিং আয়রনের প্লাগটা মাথার উপরের আলোর সকেটে ঢুকিয়ে দিল ও। আট ব্যাটারির একটা টর্চ জ্বলছে মেঝেতে ওর পাশে, সেটার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গাড়ির নিচেটা। একটানা দু'ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একটা একটা করে রাইফেলের বিচ্ছিন্ন অংশ ভরা স্টীল টিউবগুলো ওয়েল্ডিং করল আলফার চেসিসের ইনার ফ্রাঞ্জের ভিতর। টিউবগুলো মোটা কাপড় দিয়ে আগেই মুড়ে নিয়েছে রানা। স্টীল অয়্যার দিয়ে সেগুলো ফ্রাঞ্জের সাথে জড়িয়ে বেঁধে নিল। তারের প্রান্তগুলো চেসিসের কিনারায় যেখানে স্পর্শ করেছে সেখানে শোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে ওয়েল্ডিং করে আটকে দিল ও।

কাজ শেষ করে গাড়ির নিচ থেকে কালিঝুলি আর তেল মাখা ভূতের চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। হাত দুটো ব্যথায় অবশ হয়ে গেছে। তবে কাজ শেষ করার আনন্দটুকু উপভোগ করছে রানা। খুঁত নেই কোথাও। গাড়ির তলায় ঢুকে না খুঁজলে টিউবগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ধুলো আর কাদায় ঢাকা পড়ে যেতেও খুব বেশি সময় নেবে না ওগুলো।

ওভারঅলস, শোল্ডারিং আয়রন, এবং অবশিষ্ট তার ক্যানভাসের ব্যাগে ভরে সেটা এক কোণার ছেঁড়া-ফাটা কাপড়-চোপড় আর কম্বলের স্তূপের ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। মেটাল ক্লিপার জোড়া গাড়ির গ্লাভ কমপার্টমেন্টে জায়গা করে নিল।

ইতোমধ্যে শহরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। বুটের ভিতর সুটকেসটা ভরে আলফার ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ি থামাল। বন্ধ করল গ্যারেজটা। পকেটে চাবি ফেলে ফিরে এল হোটেলে।

আধঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা। তারপর ককটেল আর ডিনারের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করল। পোশাক পরল। নিচে নেমে বার-এ যাবার পথে রিসেপশন ডেস্কে থেমে জানিয়ে দিল ডিনারের পর তাকে যেন বিল দেয়া হয়, এবং পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় এক কাপ চা নিয়ে রুম সার্ভিস যেন তার ঘুম ভাঙায়।

লন্ডন। তেরোই অক্টোবর।

কাজ পাগল ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েডকে বাধা দিয়ে হতাশ করা যে সম্ভব নয় তা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল। গভীর রাতেই খবর পেল যে, সান্তিনো ভ্যালেন্টির তালা মারা বাড়ি তল্লাশী করার জন্যে প্রয়োজনীয় সার্চ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করা অনির্দিষ্টকালের জন্যে সম্ভব নয়। ম্যাজিস্ট্রেটরা কবে নাগাদ তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে তার কোন ঠিক নেই। এটা একটা মস্ত বাধা। আর কেউ হলে সার্চ ওয়ারেন্টের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবত না। কিন্তু কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বিকল্প পথের অভাব কখনও ম্যালকম লয়েডের হয় না। সকাল দশটায় নিজেই সে বেরিয়ে পড়ল। তার জানা আছে, দেশে নেই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন একজন লোককে খুঁজে বের করতে হলে সবচেয়ে আগে সাহায্য নিতে হবে পেটি ফ্রান্সের পাসপোর্ট অফিসের।

নিজের পরিচয় এবং ব্যক্তিগত মধুর ব্যবহার উপহার দিয়ে পাসপোর্ট অফিসের লোকদের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা আদায় করে নিল সে। একটা নির্জন কামরা ছেড়ে দেয়া হলো তাকে। তিনজন কেরানী তাকে সাহায্য করল।

কাজটা শুধু কঠিন নয়, ভীতিকর।

আগেই জানা গেছে, সান্তিনো ভ্যালেন্টি নামে কোন লোক ইংল্যান্ড ত্যাগ করেনি। কিন্তু সন্দেহ করা হচ্ছে লোকটা দেশে নেই। দেশ ত্যাগ করার বেআইনী অনেক পথ আছে, কিন্তু মস্ত এবং বিপজ্জনক একটা দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে যে লোক, বেআইনী পথে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোবার ঝুঁকি সে নেবে না। আইনকে সন্তুষ্ট করে এগোনো তার জন্যে সব দিক থেকে নিরাপদ। অর্থাৎ বৈধ পথেই সান্তিনো ভ্যালেন্টি ইংল্যান্ড ত্যাগ করেছে বা করার চেষ্টা করবে। তা করতে হলে পাসপোর্ট দরকার। এবং নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করা ইংল্যান্ডে পানির মত সহজ কাজ। ম্যালকম লয়েডের বিশ্বাস, এই সহজ এবং নিরাপদ উপায়টাই গ্রহণ করেছে লোকটা।

কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল গত দু'মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষের মত নতুন পাসপোর্টের জন্যে আবেদনপত্র এসেছে পাসপোর্ট অফিসে, আবেদনকারীদের প্রায় সবাই যার যার পাসপোর্ট পেয়েও গেছে। প্রশ্ন হলো, এই পাঁচ লক্ষের মধ্যে সান্তিনো ভ্যালেন্টি আছে কিনা? যদি থাকে, সে কি নামে পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করেছিল? নিজের চেহারার কি বর্ণনা দিয়েছে? এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর চাই, কিন্তু পাওয়ার কোন উপায় নেই। এসব জানা থাকলে পাঁচ লক্ষ আবেদন-পত্রের ভিতর থেকে নির্দিষ্ট লোকটাকে খুঁজে বের করা সময় সাপেক্ষ

ব্যাপার হলেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু জানা না থাকলে কাজটা এক কথায় অসম্ভব।

সঙ্কট অনুধাবন করে বেশ একটু দমে গেল ম্যালকম লয়েড। অবশ্য পাঁচ মিনিট চিন্তাভাবনা করে সঙ্কট থেকে উদ্ধারের একটা পথও বের করে ফেলল সে। তার দু'জন সহকারীকে টেলিফোনে নির্দেশ দিল পাসপোর্ট অফিসে চলে আসার জন্যে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা। অত্যন্ত সাবধানে কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে একটা স্কেচ আঁকল সে। বলল, 'সান্তিনো ভ্যালেন্টির চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী এটা আঁকলাম। লোকটার চোখের মণি কালো। পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা। কাজটা কঠিন, অসংখ্য পাসপোর্টের আবেদনপত্র সাঁটা ফটোর সাথে, চেহারার বর্ণনার সাথে মেলাতে হবে এই স্কেচ। মিল পাওয়া যাচ্ছে এমন সব আবেদনপত্র আলাদা করে রাখতে হবে। আপাতত এভাবেই কাজ চালাতে হবে, তারপর দেখা যাক কি হয়।' একটু থেমে কি যেন ভাবল সে। তারপর বলল, 'তিনজন কেরানী সহ এখানে আমরা ছয়জন রয়েছি, অফিসে ফোন করে আরও ছয়জন সহকর্মীকে ডেকে নাও। আজকের মধ্যেই বাছাইয়ের কাজ শেষ করতে চাই আমি।'

প্রচণ্ড খাটনির কাজ, কিন্তু সহকারীরা এতটুকু বিচলিত না হয়ে সাথে সাথে উঠে পড়ে লাগল। তাই দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে মুচকি হাসল ম্যালকম লয়েড। বলল, 'প্রথমে গত পঞ্চাশ দিনের মধ্যে করা আবেদনপত্র চেক করো। তার মানে সত্তর থেকে আশি হাজার ফটোর সাথে মেলাতে হবে এই স্কেচ।'

বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত নাক গুঁজে কাজ করার পর তিন হাজার ফটোসহ আবেদনপত্র বাছাই করা সম্ভব হলো। ইতোমধ্যে ম্যালকম লয়েড নিজের অফিসে ফিরে গেছে। ঠিক পোনে পাঁচটার সময় উৎফুল্ল মনে আবার ফিরে এল সে। জানাল, একলাফে অনেকদূর এগিয়ে গেছে কাজ। বিকেল তিনটের সময় ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে ম্যাজিস্ট্রেটরা। সাড়ে তিনটেয় সার্চ ওয়ারেন্ট পাওয়া গেছে। এবং পরবর্তী আধঘণ্টার মধ্যে সান্তিনো ভ্যালেন্টির ভাড়া করা খালি বাড়িটা তল্লাশী করাও শেষ হয়েছে। সান্তিনো ভ্যালেন্টির প্রকৃত পরিচয় জানা যায়নি বটে, কিন্তু তার বেডরুমে সান্তিনো ভ্যালেন্টি নামে ইস্যু করা পাসপোর্টটা পাওয়া গেছে। পাসপোর্টের ফটোটা সহকারীদের দিল সে। বলল, 'তোমাদের কাজ এখন অনেক সহজ হয়ে গেল। স্কেচটাকে বাদ দিয়ে এখন তোমরা এই ফটোর সাথে মিল খোঁজো। কিন্তু সাবধান, এ লোক ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, একথাটা ভুলো না।'

এরপর ম্যালকম লয়েড তার সহকারীদেরকে সংক্ষেপে বোঝাল নকল বা জাল পাসপোর্ট সাধারণত কিভাবে সংগ্রহ করা হয়। ঘটনাক্রমে রানা ঠিক যে পদ্ধতিতে নকল পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছে ম্যালকম লয়েডও সেই পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করল তার সহকারীদেরকে।

'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,' উপসংহার টেনে বলল সে, 'বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ো না। চেক করতে হবে ডেথ সার্টিফিকেটগুলো। খুঁজতে খুঁজতে এমন একজনের আবেদনপত্র যদি পাও যে লোক বেঁচে নেই, তাহলেই মনে করবে আমরা যাকে খুঁজছি পেয়েছি তাকে।'

এরপর সহকারীদের সাহায্যার্থে নিজের অফিস থেকে ম্যালকম লয়েড রেজিস্ট্রি অভ বার্থ, ম্যারেজ অ্যান্ড ডেথ অফিসকে ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিল তারা যেন

তার সহকারীদেরকে জরুরী ভিত্তিতে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করে।

সেদিন রাত দশটায় ক্লড র‍্যাবো তাঁর দ্বিতীয় প্রোগ্রেস রিপোর্টে জানালেন, সান্তিনো ভ্যালেন্টিকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে ইংল্যান্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চ যথেষ্ট এগিয়ে গেছে।

'শালা পাগলটার লন্ডনের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেছে,' সুরেতের অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর বিশাল বপু কর্নেল প্যাপন সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে তার প্রেয়সী লুইসা পিয়েত্রোকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, 'ব্যাটা এবার যাবে কোথায়!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল পিয়েত্রোর বুকটা। আধঘণ্টা পর কর্নেলের যখন নাক ডাকছে, বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল সে। ঠিক এই সময় তেরো তারিখের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করল রাত বারোটা।

চোদ্দই অক্টোবর। মিলান। সকাল সাড়ে ছ'টা।

পঞ্চাশ মিনিট আগে রওনা হয়ে গেছে রানা। মিলান শহরকে পিছনে ফেলে রেখে এসেছে সে। আলফা রোমিওর হুড তোলা, সকালের উষ্ণ মিঠে রোদ লাগছে ওর মুখে। চওড়া সরল রাস্তা। একহাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে রানা। ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে রোমিও। ঠাণ্ডা বাতাসের প্রচণ্ড চাপে ওর কপালে সেঁটে আছে ক'গাছি চুল। চোখে গাঢ় রঙের চশমা।

আরেকবার দেখল রানা রোড ম্যাপটা। ফ্রেঞ্চ সীমান্ত ভেন্টিমিগলিয়া এখনও দুশো দশ কিলোমিটার দূরে—মানে প্রায় একশো ত্রিশ মাইল। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছবার ইচ্ছা ওর। সম্ভব—যদি কোন ট্রাক বহরের পিছনে আটকা পড়তে না হয়।

আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ফ্রন্টিয়ার পয়েন্টে পৌঁছে রানা দেখল দৈনন্দিন যানবাহনের ভিড় ইতোমধ্যেই জমতে শুরু করেছে।

ত্রিশ মিনিট লাইনে অপেক্ষা করার পর কাস্টমস চেকিংয়ের জন্যে লাইন থেকে বেরিয়ে ফাঁকা একটা পার্কিং এলাকায় যেতে বলা হলো ওকে। একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসার ওর পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। লোকটা অস্ফুটে একবার বলল, 'এক মিনিট, মশিয়ে।' পাসপোর্টটা ফিরিয়ে না দিয়ে দ্রুত কাস্টমস শেডে গিয়ে ঢুকল সে।

বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে পরিস্থিতি, জানে রানা। কিন্তু উদ্বেগের কোন ছায়া ফুটল না ওর চেহারায়। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দিব্যি সিগারেট ফুঁকছে। পুলিস অফিসার সিভিল ড্রেস পরা একজন লোককে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এল কাস্টমস শেড থেকে। চোখ এড়াল না রানার, ইতোমধ্যে ওর পাসপোর্টটা হাতবদল হয়ে গেছে।

'এটা আপনার পাসপোর্ট?' অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে জানতে চাইল কাস্টমস অফিসার।

'হ্যাঁ!'

উত্তর পেয়ে নতুন করে পাসপোর্টটা পরীক্ষা করতে শুরু করল কাস্টমস অফিসার। এক সময় মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, চশমাটা নামাবেন কি?'

মৃদু হাসল রানা। নিঃশব্দে গাঢ় রঙের চশমাটা চোখ থেকে নামাল।

কাস্টমস অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল রানার চোখ দুটো। প্রায় দশ সেকেন্ড পর আবার সে পাসপোর্টের দিকে তাকাল। কি যে বুঝল বা কি ভাবছে, অনুমান করতে পারল না রানা।

'ফ্রান্সে কি উদ্দেশে যাচ্ছেন আপনি?' অবশেষে পাসপোর্ট থেকে দৃষ্টি তুলে রানার মুখের দিকে তাকাল কাস্টমস অফিসার।

'বেড়াতে।'

'আই সি। গাড়িটা আপনার?'

'না। ভাড়া করা। ইটালিতে কাজ ছিল, হঠাৎ এক হপ্তার জন্যে করার কিছু নেই দেখে ফ্রান্স ভ্রমণের সুযোগটা নিতে যাচ্ছি।'

'আই সি। তা গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিশ্চয়ই আপনার সাথে আছে?'

নিঃশব্দে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ি ভাড়া করার চুক্তিপত্র, এবং দুটো ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট বের করে দিল রানা। সাদা পোশাক পরা কাস্টমস অফিসার এক এক করে চেক করল সবগুলো।

'সাথে লাগেজ আছে, মশিয়ে?'

'আছে। বুটে তিনটে সুটকেস। এবং একটা হ্যান্ডগ্রিপ।'

'আর কিছু নেই?'

'না।'

'বেশ। কাস্টমস হলে নিয়ে আসুন ওগুলো।'

কাস্টমস অফিসার চলে গেল, পাসপোর্টটা রানাকে ফিরিয়ে না দিয়েই। কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে, পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে রানা। এদিকের বর্ডারে চেকিংয়ের ব্যাপারটা নামে মাত্র, জানা আছে ওর, তার মানে আজকের এই কড়াকড়ি আরোপের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কি হতে পারে সেই কারণ? অনুমান করতে গিয়ে হার মানল রানা। কড়াকড়ি আরোপের একমাত্র কারণ ও নিজে, এ-কথাটা একবারও মনে হলো না ওর।

সুটকেসগুলো আর হ্যান্ডগ্রিপটা গাড়ি থেকে নামাতে সাহায্য করল ওকে পুলিস অফিসার। দু'জনে বয়ে নিয়ে গেল ওগুলো কাস্টমস শেডে। মিলান ত্যাগ করার আগে সুটকেস থেকে পুরানো গ্রেটকোট এবং মার্ক রোডিনের ট্রাউজার ও জুতো বের করে গুটিয়ে গোল পাকিয়ে গাড়ির বুটে রেখে দিয়েছে রানা। বাকি দুটো সুটকেস থেকে কিছু কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে ভরেছে তৃতীয় সুটকেসে। মার্ক রোডিনের কাগজপত্র এই সুটকেসেরই লাইনিংয়ের ভিতর সেলাই করা আছে। মেডেলগুলো সব এখন রানার পকেটে।

কাস্টমস অফিসার প্রতিটি কেস পরীক্ষা করল। এই ফাঁকে রীতি অনুযায়ী ফ্রান্সে ঢোকার অনুমতি চেয়ে একটা ফর্ম পূরণ করল রানা। কাস্টমস অফিসার সুটকেসে এমন কিছু পেল না যা দেখে উত্তেজিত হওয়ার কারণ ঘটে।

চোখের কোণ দিয়ে জানালা পথে দেখতে পাচ্ছে রানা, আলফা রোমিওর বুট আর ইঞ্জিন বনেট পরীক্ষা করছে দু'জন কাস্টমস অফিসার। গাড়ির তলাটা পরীক্ষা করার কোন লক্ষণ এখনও তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না রানা। তাদের একজন বুট থেকে গ্রেটকোট আর ট্রাউজার বের করে ভাঁজ খুলল। দুটোই ভয়ঙ্কর নোংরা, দুর্গন্ধময়। নাক কুঁচকে উঠল অফিসারের। আপন মনে হাসল রানা। ওভারকোট আর ট্রাউজার দুটো গাড়িতে কেন রাখা হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা আছে ওর। রাতের বেলা গাড়ির নাকটাকে শিশির-মুক্ত রাখার জন্যে ওভারকোটটা ব্যবহার করে ও। আর পুরানো কাপড়টা গাড়ি মুছতে দরকার হয়। কিন্তু শেডে ফিরে এসে দু'জন অফিসারের কেউই কোন প্রশ্ন করল না রানাকে।

ফর্মটা পূরণ করা শেষ হলো রানার, একই সময় শেষ হলো কাস্টমস অফিসারের লাগেজ চেক করা। রানার কাছ থেকে এন্ট্রি কার্ড চেয়ে নিয়ে পাসপোর্টের সাথে মিলিয়ে দেখে নিল সেটা অফিসার, তারপর রানাকে ফিরিয়ে দিল পাসপোর্টটা।

'ধন্যবাদ, মশিয়ে,' অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে বলল সে রানাকে। 'কামনা করি, আপনার ফ্রান্স ভ্রমণ সার্থক হোক।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' খুশি হয়ে বলল রানা।

দশ মিনিট পর। রানাকে নিয়ে তুমুল গতিতে ছুটছে আলফা রোমিও। মেন্টন-এর পুব এলাকায় পৌঁছে একটা কাফের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। পুরানো বন্দর আর ইয়ট বেসিনটা দেখা যায় কাফে থেকে। ধীরেসুস্থে আয়েশ করে ব্রেকফাস্ট সারল ও। তারপর করনিক-এর উপর দিয়ে মোনাকো, নীস এবং ক্যান্সে অভিমুখে রওনা হলো ঝড়ের বেগে।

লন্ডন। চোদ্দই অক্টোবর।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েডের নেতৃত্বে বারোজন লোক রাত জেগে পাসপোর্ট বাছাইয়ের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। আরও পঞ্চাশ দিন আগে থেকে করা পাসপোর্টের আবেদনপত্র বাছাই করার আওতায় নিয়ে আসার ফলে এখন বারোজনের সামনে সর্বমোট আট হাজার একচল্লিশটা ফটোসহ আবেদনপত্র রয়েছে। এগুলোর সাথে সান্তিনো ভ্যালেন্টির পাসপোর্টে পাওয়া ফটোর চেহারা মেলাবার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে প্রায় পঞ্চাশটা ফটোর সাথে সান্তিনো ভ্যালেন্টির চেহারার কিছু কিছু মিল পাওয়া গেছে, যদিও এ-ধরনের মিল তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। ওদের জানা আছে, সান্তিনো ভ্যালেন্টি ছদ্মবেশ নিয়েছে, এবং তার ছদ্মবেশ ধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের চেহারা যথাসম্ভব গোপন করা। কিন্তু যতই সে গোপন করার চেষ্টা করুক, তার পাসপোর্টে যে ছবিটা আছে তা সামনে থেকে তোলা, সুতরাং মুখের কাঠামো, মাথার আকৃতি, কাঁধের বিস্তার, চোখের মণি ইত্যাদি সফলতার সাথে কোনভাবেই পুরোপুরি গোপন রাখতে পারবে না সে। এই বিশ্বাস আছে বলেই এরা নিশ্চিত ভাবে জানে লোকটাকে ধরা পড়তেই হবে।

ইতোমধ্যে অন্যান্য কাজও শুরু করে দিয়েছে ম্যালকম লয়েড। বার্থ, ডেথ এবং

ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে দু'জন সহকারীকে বসিয়ে রেখেছে সে। পাসপোর্ট অফিস থেকে প্রতি একঘণ্টা পরপর কয়েকজন লোকের নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে তাদেরকে টেলিফোনযোগে। তারা সাথে সাথে তথ্যগুলো সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্যে রেজিস্ট্রি অফিসের ফাইল পত্র ঘেঁটে দেখছে।

ফ্রান্স। চোদ্দই অক্টোবর। বেলা এগারোটা।

বনবন ঘুরছে রোমিওর চারটে চাকা। ক্যানেসের মাঝখান দিয়ে গাড়ি হাঁকাচ্ছে রানা। সাধারণত কোনরকম ঝুঁকি না থাকলে শহরের সেরা হোটেলে ওঠে রানা, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। হোটেল ম্যাজেস্টিকের সামনে গাড়ি থামিয়ে দ্রুত চিরুনি চালিয়ে মাথার চুলগুলোকে বশ করে নিল ও। অনেক আগে সকাল হয়েছে, তাই হলরুমে তেমন ভিড় বা ব্যস্ততা নেই। ওর পরনের দামী স্যুট, হাঁটার ভঙ্গিতে আভিজাত্য, চেহারায় আত্মবিশ্বাস আর ব্যক্তিত্ব লক্ষ করে দু'চারজন যারা রয়েছে তারা মনে করল সে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী। একজন বেলবয়কে ডেকে জেনে নিল ও টেলিফোন বুদটা কোন্‌দিকে।

কাউন্টারে একটা মেয়ে বসে আছে। তার একপাশে সুইচবোর্ড, অপর পাশে টেলিফোন বুদ। পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা।

'প্লীজ গেট মি প্যারিস,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'Molitor 5900।'

তিন মিনিট পর মেয়েটা ইঙ্গিত করল ওকে বুদে ঢোকার জন্যে। সাউন্ডপ্রুফ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল রানা।

'হ্যালো, পারু?'

'হ্যালো, নারা,' কাঁপা, উত্তেজিত গলায় কথা বলছে রূপা। 'গত দু'দিন থেকে তোমার খোঁজে ইউরোপ চষে ফেলছে লহেসো, তেহারার নির্দেশে। থ্যাঙ্ক গড, ইউ হ্যাভ রাং। শোনো...।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। মুহূর্তে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল শরীর। ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। অপরপ্রান্তে কথা বলছে রূপা। শুনছে রানা। একবার শিউরে উঠল ও। ঝাড়া দশ মিনিটের আলাপে প্রায় সারাক্ষণ চুপ করে থাকল ও। চাপা গলায় ছোট্ট, দ্রুত প্রশ্ন করার সময় মাঝেমধ্যে ঠোঁট জোড়া নড়ল ওর।

কেউ লক্ষ করছে না ওকে। সুইচবোর্ডের মেয়েটা ডুবে আছে একটা রোমান্টিক উপন্যাসে। হঠাৎ তার সংবিৎ ফিরল। দেখল, টেলিফোন বুদ থেকে বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘদেহী বিদেশী ভদ্রলোক, গাঢ় রঙের চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সুইচবোর্ডের মিটার দেখে একটা বিল লিখল মেয়েটা, রানার কাছ থেকে পাওনা বুঝে নিল। কথা হলো না ওদের মধ্যে।

হল থেকে বেরিয়ে উঁচু, খোলা বারান্দায় উঠে এসে একটা টেবিল দখল করে বসল রানা। একপট কফির অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকাল সাগরের দিকে। রোদে পোড়া তামাটে শরীর নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, সাঁতার কাটছে মেয়ে আর পুরুষেরা। ওয়েটার কফি দিয়ে গেল। দীর্ঘ টান দিয়ে বুক ভরে সিগারেটের ধোঁয়া নিল রানা। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

বারান্দায় এইমাত্র আরেকটা প্রাণী এসে উঠল। সেদিকে খেয়াল নেই রানার। দেখে চমকে উঠতে হয় এমন এক রূপসী মেয়েকে নিজের অজ্ঞাতে ফাঁদে আটকে ফেলেছে রানা।

ভাবছে রানা। ম্যাটাপ্যান নেই! বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল আরেকবার। বুকের ভিতর একটা যাতনা অনুভব করছে, ঠেলে উঠে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। ম্যাটাপ্যান কেমন লোক ছিল এ কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। তার মত বিশ্বস্ত, দুঃসাহসী, নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত জীবনে খুব কমই পেয়েছে রানা। ন্যায়ের প্রশ্নে আপসহীন, বিপদের মুখে নির্ভীক। একজন খাঁটি মানুষ বলতে যা বোঝায় ম্যাটাপ্যান ছিল ঠিক তাই।

সেই ম্যাটাপ্যান নেই! উ সেন তাকে খুন করেছে। রাগ, আক্রোশ, জেদ বা অস্থিরতা—কিছুই অনুভব করল না রানা। এ-ধরনের আঘাত খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যেন ও। শুধু একটা ঘৃণা বোধ ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে।

ম্যাটাপ্যানের মুখ থেকে ওর সান্তিনো ভ্যালেন্টি পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে, এটা ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেল রানা। কিভাবে? এ অসম্ভব! পরক্ষণে মনে পড়ল ইউনিয়ন কর্সের লোক আছে ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন সার্ভিসে, এরা দুনিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে মানুষকে শারীরিক কষ্ট দিয়ে খুন করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। ম্যাটাপ্যানকে কি রকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

মেয়েটা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। ওর মুখের ভাব পরিবর্তনগুলো দৃষ্টি এড়াচ্ছে না তার।

কিন্তু, ভাবছে রানা, রূপা ওকে হাতের কাজ বাতিল করে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে বলছে কেন? নির্দেশটা নাকি স্বয়ং মেজর জেনারেল রাহাত খানের।

ওর জন্যে বি-সি-আই উদ্বিগ্ন, ভাবছে রানা, তার অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু ও এমন কিছু জানে যা বি-সি-আই জানে না, জানে না ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন সার্ভিস এবং ইউনিয়ন কর্স। তা হলো: সে অন্য একজনের নাম ধারণ করে রওনা হয়েছে, সেই নামের আইন সম্মত পাসপোর্টও রয়েছে ওর সাথে। এছাড়াও রয়েছে আলাদা আলাদা তিন প্রস্থ জাল কাগজপত্র, দুটো বিদেশী পাসপোর্ট, পাসপোর্টগুলোর সাথে চেহারার মিল তৈরি করার প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম।

ক্লড র‍্যাঁবো। এই ভদ্রলোককে ছোট করে দেখা যায় না। হাসিও পায়, দুঃখও হয়—ভাবছে রানা, যে মানুষের গুণের কথা শুনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও, ভাগ্যের কি চমকপ্রদ কৌতুক, সেই মানুষই আজ ওর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সে যাই হোক, ক্লড র‍্যাঁবো যে একটা আশ্চর্য প্রতিভা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর হাতেই বা সূত্র কোথায় যে ওকে খুঁজে বের করবেন তিনি? সূত্র বলতে তিনি সম্ভবত জানেন ওর চেহারার অস্পষ্ট বর্ণনা, লম্বা, বিদেশী। এ ধরনের বিদেশী লোক হাজার হাজার পাওয়া যাবে অক্টোবরের ফ্রান্সে। উ সেন চাইলেও ইউনিয়ন কর্স বা ফ্রেঞ্চ সরকারের পক্ষে এদের সবাইকে গ্রেফতার করা তো আর সম্ভব নয়।

ওর অনুকূলে আরেকটা ব্যাপার রয়েছে। সান্তিনো ভ্যালেন্টির পাসপোর্টধারী একজন লোককে খুঁজছে ইউনিয়ন কর্স এবং ফ্রেঞ্চ সরকার। বেশ তো খুঁজুক না।

সম্ভব হলে খুঁজে বেরও করুক, তাতে কোন ক্ষতি নেই ওর। সে তো আর এখন সান্তিনো ভ্যালেন্টি নয়। সে আলেকজান্ডার অরগ্যান। নিজের এই পরিচয় সে প্রমাণও করতে পারবে।

ওর এই নতুন পরিচয়ের কথা ও নিজে ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না। ফরজার পিসিক অবশ্য জানে—কিন্তু তাকে শুধু বেলজিয়ামের রানা এজেন্সীর আস্তানায় আটকে রাখারই নির্দেশ দেয়নি ও; সেই সাথে জরুরী নির্দেশ দিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা পর পর ওষুধ ইঞ্জেক্ট করে লোকটাকে যেন পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অজ্ঞান করে রাখা হয়। ওর এই নির্দেশ রানা এজেন্সীর শাখা প্রধান অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে, এ ব্যাপারে রানা নিঃসন্দেহ। সুতরাং, এখন ওর পরিচয় কি, কোথায় রয়েছে, ভবিষ্যতে নিজের কি পরিচয় দেবে, কোথায় যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে কারও কিছু জানা নেই।

এসব সত্ত্বেও, বিপদের মাত্রা একলাফে কয়েক হাজার গুণ বেড়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও বেঁচে আছে এবং উ সেনকে হত্যা করার প্ল্যান নিয়েছে এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে জেনেও পিছিয়ে না যাবার মানে লক্ষ লক্ষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ লোকের বিরুদ্ধে একা নিধিরামের যুদ্ধ ঘোষণা করার মত হাস্যকর ব্যাপার। এখন একমাত্র প্রশ্ন হলো: হত্যা করার জন্যে ওর প্ল্যানটা উ সেনের নিরাপত্তা প্রহরাকে পরাজিত করতে পারবে কিনা? নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে ভাবল রানা—পারবে।

প্রশ্নটা তবু খচ্ খচ্ করছে মনের ভিতর। এর একটা আরও পরিষ্কার উত্তর চাই। ফিরে যাবে ও, নাকি সামনে এগিয়ে যাবে? ফিরে যাওয়া মানে নিজেকে অপমান করা, সালমাকে অপমান করা, গিলটি মিয়াকে অপমান করা, ম্যাটাপ্যানকে অপমান করা। ফিরে যাওয়া মানে একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া, নিজেকে মেরুদণ্ডহীন প্রমাণিত করা। আর এগিয়ে যাওয়া মানে দ্রুত বিপদের কুটিল জালে অনুপ্রবেশ করা, যেখান থেকে ফিরে আসার পথ অচিরেই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

পট থেকে আরেক কাপ কফি ঢালছে রানা। চুমুক দিতে গিয়ে এই প্রথম দ্বিতীয় একজনের অস্তিত্ব অনুভব করল ও। ওর পনেরো হাত সামনে, রেলিংয়ের কাছাকাছি বসে আছে মেয়েটা। আরে, ভারি সুন্দরী তো! এর বেশি কিছু ভাবল না রানা। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও: মেজর জেনারেল রাহাত খানের ব্যক্তিগত নির্দেশটা লঙ্ঘন করবে। ফিরে ও যাবে না।

দু'মিনিটের মধ্যে বিল মিটিয়ে দিয়ে আলফা রোমিওয় চড়ে বসল রানা। ম্যাজেস্টিক ছেড়ে ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটে চলেছে কাপু উ সেনের হবু হত্যাকারী।

একটা মার্সিডিজ গাড়ি নিয়ে ওকে অনুসরণ করছে সেই মেয়েটা।

চার

ছোটখাট মানুষটা ঘন ঘন চুরুটে টান আর মেহদী রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাবার ফাঁকে এমন সব কলকাঠি নাড়ছেন যার ফলে গোটা ফ্রান্স জুড়ে সর্বত্র ব্যস্ততার ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের চতুর্সীমার সমস্ত বর্ডার চেকপোস্টগুলো থেকে অয়্যারলেস মেসেজ এখনও আসছে। সবগুলো মেসেজের সারমর্ম, সান্তিনো ভ্যালেন্টি নামে কোন লোক বা এই চেহারার অন্য নামধারী কোন বিদেশী আগস্ট মাস থেকে আজ পর্যন্ত বর্ডার টপকে ফ্রান্সে প্রবেশ করেনি। মেসেজের শেষে সবিনয়ে ক্লড র‍্যাবোকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এই নামের বা চেহারার কোন লোককে বর্ডারে দেখা গেলে তাকে অবশ্যই আটক করা হবে।

ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজ, সুরেত, পুলিস, অ্যাকশন সার্ভিস এবং ডিটেকটিভ ফোর্সকেও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন ক্লড র‍্যাবো। প্যারিস এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিটি হোটেল, মেস এবং বোর্ডিংয়ের রেজিস্ট্রি বুক চেক করে রিপোর্ট নিয়ে আসছে কর্মীরা, এই নামের বা চেহারার কোন লোক কোথাও ওঠেনি। টেলিফোনযোগে ফ্রান্সের অন্যান্য শহর এবং মফঃস্বল থেকেও এই ধরনের মেসেজ প্রতি দশ মিনিটে তিন চারটে করে আসছে।

ক্লড র‍্যাবোর নির্দেশে ফ্রান্সের গুণ্ডাপাণ্ডাদের উপর ফ্রেঞ্চ সুরেত বিশেষ নজর রেখেছে। এরা কেউ কোন বিদেশীকে আশ্রয় দিয়েছে কিনা বা দেয় কিনা সেটা জ্ঞাত হওয়াই এই নির্দেশের উদ্দেশ্য।

প্রতিটি রিপোর্ট গ্রহণ করার পরপরই রিপোর্ট-দাতাকে পরবর্তী নির্দেশ দিচ্ছেন ক্লড র‍্যাবো, আবার চেক করো, আরও খবর নাও, এই লোক এ বছরের প্রথম দিকেও ফ্রান্সে এসেছিল কিনা জানতে চেষ্টা করো।

ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েডের জরুরী বার্তা পেয়ে ক্লড র‍্যাবো এখন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ, সান্তিনো ভ্যালেন্টি ইংল্যান্ডে নেই। অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্যে বাইরে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি ছেড়েছে লোকটা—তা নাহলে দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে এমন সব জিনিস, যেমন টুথব্রাশ, তোয়ালে, দাড়ি কামাবার যন্ত্র, সোপ-কেস ইত্যাদি বাথরুম থেকে গায়েব হয়ে যেত না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে খুন করার উদ্দেশ্য রয়েছে যে লোকের সে-লোক বেশ কিছুদিনের জন্যে বাড়ি ত্যাগ করেছে, সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে ফ্রান্সে ঢুকেছে সে বা ঢোকার চেষ্টা করছে।

'কিন্তু পাসপোর্টটা বাড়িতে রেখে গেছে কি মনে করে?' জানতে চাইল সহকারী চার্লস ক্যারন।

'সহজ ব্যাপার। ওই পাসপোর্ট তার আর দরকার নেই, তাই।'

'নাকি ভুল করে?'

হেসে ফেললেন ক্লড র‍্যাবো। 'চার্লস, মাই বয়, সান্তিনো ভ্যালেন্টিকে তুমি

এখনও চেনোনি। আমি তার সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতটুকু বুঝেছি, রীতিমত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সে। অন্তত বুদ্ধির দৌড়ে সে কারও চেয়ে কম তো নয়ই। তার কাছ থেকে এ-ধরনের স্থূল ভুল আমি আশা করি না।'

দুই বৃহৎ শক্তি গরু খোঁজা করছে যাকে সেই সান্তিনো ভ্যালেন্টি ক্যানেস থেকে মার্সেই যাবার সংক্ষিপ্ত কিন্তু দুর্গম রাস্তাটা এড়িয়ে উপকূল ধরে আল্পস ম্যারিটাইমস এবং বারগান্ডির ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। তেমন কোন ব্যস্ততা নেই রানার। আঘাত হানার দিনটার দেরি আছে এখনও। যথাসময়ের একটু আগেই ফ্রান্সে হাজির হয়েছে সে। অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে, তা বলা চলে না। ইউনিয়ন কর্স এবং ফ্রেঞ্চ সরকার সান্তিনো ভ্যালেন্টিকে খুঁজছে। কিন্তু সান্তিনো ভ্যালেন্টির এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। সে এখন আলেকজান্ডার অরগ্যান।

বিকেলবেলা সিস্‌তেরোনে পৌঁছল রানা। RN 85 হাইওয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে একজায়গায়, একটা শাখা ধরে উত্তর দিকে এগোল ও। সন্ধ্যা নামছে, এমন সময় ছোট্ট শহর গ্যাপে পৌঁছল। শহরের ঠিক বাইরে রুচিশীল একটা হোটেল পেয়ে গেল ও। স্যাভয়ের ডিউকদের হানটিং লজ ছিল এককালে, এখন ললাটে হোটেল দু সার্ফ-এর নিওন সাইন। আরাম আয়েশ আর সুস্বাদু খাবারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সিটি ম্যাপ

ইতোমধ্যে ম্যার্সিডিজটাকে লক্ষ করেছে রানা। মেয়েটা ওর পিছু পিছু আসছে দেখে তেমন কিছু ভাবেনি ও। পিছু পিছু আসা মানে অনুসরণ করছে তা নাও হতে পারে। কিন্তু মেয়েটাকে ওর সাথেই হোটেল দু সার্ফের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা ভাড়া নিতে দেখে টনক নড়ল রানার। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় বলে এখন আর মনে হচ্ছে না ওর।

নিজের কামরার দরজা বন্ধ করে দিয়ে শাওয়ার সারল রানা। সিল্কের একটা শার্টের উপর পরল ডাভ-গ্রে রঙের স্যুটটা গলায় ঝোলাল হাতে বোনা টাই। রুম মেইডকে মোটা বকশিশ দিয়ে তার হাতে চেক স্যুটটা তুলে দিল স্পঞ্জ আর ইস্ত্রি করার জন্যে।

সান্ধ্য ভোজন পরিবেশিত হলো খোলা বারান্দায়। এখান থেকে আকাশ ভরা জ্বলজ্বলে তারা, পাহাড়ের মাথা, বনভূমি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গা জুড়ানো হু হু নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া। একটু পরই বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠল। কালো বাদুড় উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। কাছের জঙ্গল দোলা খাচ্ছে চতুষ্পদদের দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফিতে। মগ্নচিত্তে প্রকৃতির রূপসুধা পান করছে রানা। এইসব একদিন ফুরিয়ে যাবে ওর জীবন থেকে। ফুরিয়ে আসছে সময়। আহা, যদি মরতে না হত! চিন্তাটা জাগতেই আপন মনে হাসল রানা। কি আছে জীবনে? এক অর্থে জীবনটা বড়ই নিরস। বেঁচে থাকাটা একঘেয়ে যান্ত্রিক। কষ্ট এড়িয়ে থাকার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টার নাম জীবন। এমন একটা খেলা যেখানে পরাজয় অনিবার্য। তবু বেঁচে থাকাটা সৌভাগ্য বৈকি। অন্তত মানুষের সুখে সুখী হবার, দুঃখে দুঃখ বোধ করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর কখনও বা প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করার সুযোগ ঘটে। এই যেমন এখন। চাঁদ, ভেসে যাওয়া মেঘ, হু হু বাতাস, বনভূমির

আলোড়ন, আকাশের গায়ে অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুম ঘুম পাহাড়,ধ্যানমগ্ন নিস্তব্ধতা এবং পাশে বসা অপরিচিতা রহস্যময়ী সুন্দরী নারীর নির্নিমেষ চাহনি—এ-সবই বড় লোভনীয়, পেলে মনে হয় জীবন বড় রোমাঞ্চকর, আর কী মধুর! কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে মাথা।

'কিছু যদি মনে না করেন···'

পাশের টেবিল থেকে ভেসে এল মার্জিত, সুরেলা কণ্ঠস্বর। সাথে সাথে তাকাল রানা মেয়েটার চোখে।

ওকে তাকাতে দেখে চুপ করে গেছে মেয়েটা।

'কিছু বলছিলেন?' মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' একটু অপ্রতিভ হলো মেয়েটা। 'একটা প্রশ্ন করব ভাবছিলাম।'

'করুন।'

'আপনি বিদেশী?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। পরমুহূর্তে অত্যন্ত বেরসিকের মত পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কিন্তু বিদেশী হলেই যে তাকে অনুসরণ করতে হবে, এর কি মানে?'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল মেয়েটার মুখের চেহারা। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল সে। বারান্দায় আর মাত্র ছয় সাতজন নারী-পুরুষ রয়েছে, তবে কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। রানার দিকে আবার তাকাল সে। কিন্তু রানার কথায় আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে, ঢোক গিলেও কথা বলতে পারল না।

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রানা। মেয়েটার মনের কথা পরিষ্কার পড়তে চেষ্টা করছে ও। কি যেন এক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে মেয়েটা।

'অনুসরণ করছি, একথা ঠিক নয়,' মৃদু গলায় বলল মেয়েটা। 'এদিকেই আসছিলাম। কিন্তু আপনি যে রুট ধরে এসেছেন সেটা ধরে হয়তো আসতাম না।'

'কিন্তু এসেছেন।'

অপ্রতিভভাবে হাসল মেয়েটা। 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'এই কেন-র উত্তর হয় না,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'আপনিও কি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?' হঠাৎ একেবারে খাদে নেমে গেল মেয়েটার কণ্ঠস্বর। 'দেখি উত্তর দিতে পারেন কিনা। কেন তাকিয়ে থাকেন চাঁদের দিকে? হু হু বাতাস কেন ভাল লাগে? কেন কান পেতে নিস্তব্ধতা উপভোগ করেন? এ সবের উত্তর জানা আছে আপনার? উত্তর যদি দিতে পারেন, আমিও পারব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে।' বলে আর দাঁড়াল না মেয়েটা। দু'হাত দিয়ে দামী গাউনটা একটু উঁচু করে ধরে ত্রস্ত পদে চলে গেল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে মেয়েটা। সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। অদ্ভুতভাবে চমকে দিয়ে গেল মেয়েটা ওকে, ভাবছে ও। বলার ভঙ্গিতে প্রগাঢ় মাধুর্য ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু কি বোঝাতে চাইল সে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে হাসল রানা। চলার পথে এই এক বিড়ম্বনা। প্রায়ই এই সমস্যাটা দেখা দেয় ওর জীবনে। এরা বুদ্ধিহীনা, জানে না কাকে ভাল লাগছে, জানে না এই ভাল লাগার কোন অর্থ নেই। কিংবা হয়তো সবই জানে।

জেনেশুনেই হৃদয়টাকে আহত করার জন্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। অনেক রাত জাগবে আজ ও। এখানে বসে থাকবে। কেমন যেন ব্যথায় টনটন করছে হৃদয়টা। এর শুশ্রূষা একমাত্র প্রকৃতির কাছ থেকেই আশা করা যায়।

সমারসেট হাউজ অর্থাৎ, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ফোন এল রাত দশটায়। রিসিভার তুলল ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড।

ছয়জনের একটা ডিটেকটিভ সার্জেন্টের টীম সমারসেট হাউজে ডেথ সার্টিফিকেট চেক করার কাজ করছে। ফোন করছে এই টীমের নেতা। কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, কিন্তু তাতে উত্তেজনার সুর রয়েছে। 'আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান,' ঘোষণার সুরে বলল সে।

'ব্যাপারটা কি তার?' জানতে চাইল ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট।

'উনিশশো চল্লিশ সালের তেসরা এপ্রিলে জন্ম স্যামবোর্ন ফিশলেতে। এ বছরের চোদ্দই সেপ্টেম্বরে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পাসপোর্টের জন্যে ফর্ম পূরণ করে আবেদন করেছে। পরদিন ইস্যু করা হয়েছে পাসপোর্ট, আবেদনপত্রে উল্লেখ করা ঠিকানায় ডাকযোগে সেটা পাঠানো হয়েছে সতেরোই সেপ্টেম্বরে। ঠিকানাটা সম্ভবত আবেদনকারীর নিজের নয়।'

'তার মানে?' অধৈর্যের সাথে জানতে চাইল ম্যালকম লয়েড।

'আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান তার আড়াই বছর বয়সে, আটই নভেম্বর তারিখে একটা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

'হুঁ,' ম্যালকম লয়েড উত্তেজনা চেপে রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'তার মানে সম্ভবত এই আবেদনকারীই আমাদের লোক।' খানিক চিন্তা করল সে। তারপর জানতে চাইল, 'কত পাসপোর্ট চেক করা বাকি এখনও?'

'শ তিনেক।'

'ভুয়া দু'একটা আরও থাকতে পারে, সুতরাং ওগুলোও সব চেক করতে হবে,' নির্দেশ দিল ম্যালকম লয়েড। 'কিন্তু তুমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ো ওখান থেকে। অরগ্যানের পাসপোর্ট যে ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে সেটা চেক করে সাথে সাথে রিপোর্ট করো আমাকে। পাসপোর্টের আবেদনপত্রে যে ফটোটা আছে সেটাও নিয়ে আসবে। সান্তিনো ভ্যালেন্টির এই নতুন চেহারাটা দেখতে চাই আমি।'

রাত বারোটার সময় সিনিয়র ইন্সপেক্টর আবার ফোন করল ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্টকে। জানাল, ঠিকানা চেক করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে একটা তামাকের দোকান। এই দোকানটাকে অনেকেই তাদের চিঠিপত্রের অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করে। দোকানের মালিক উপরতলায় বাস করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে কিছু পয়সার বিনিময়ে স্থায়ী ঠিকানা নেই এমন পরিচিত অপরিচিত বহু লোককে নিজের ঠিকানাটা ব্যবহার করতে দেয় সে, কিন্তু অরগ্যান নামে কোন লোক তার ঠিকানা ব্যবহার করেছে কিনা তা তার মনে নেই। তার ধারণা, অরগ্যান হয়তো মাত্র দু'বার এসেছিল তার কাছে। একবার ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি নিতে, দ্বিতীয়বার পাসপোর্টটা সংগ্রহ করতে। তাকে

সান্তিনো ভ্যালেন্টির একটা ছবি দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা দেখে সে লোকটাকে চেনে কিনা বলতে পারেনি। এরপর তাকে অরগ্যানের ফটো দেখানো হয়। এই লোককে সে আগে দেখেছে বলে মনে করে বটে, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

'ব্যাটাকে পুলিসের হাতে তুলে দাও,' বলল ম্যালকম লয়েড। 'তারপর সোজা চলে এসো অফিসে।'

এক মিনিট চিন্তা করল ম্যালকম লয়েড। তারপর ফোনের রিসিভার তুলে অপারেটারকে বলল, 'প্যারিসের সাথে যোগাযোগ চাই...'

প্যারিস। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কনফারেন্স রুমে মীটিং চলছে। রোজকার মত আজও ক্লড র‍্যাঁবো তাঁর প্রোগ্রেস রিপোর্ট পেশ করছেন। সভাকে তিনি জানালেন সান্তিনো ভ্যালেন্টি নামে কোন বিদেশীকে ফ্রান্সের কোথাও পাওয়া যায়নি। এটুকু নিঃসন্দেহে জানা গেছে যে আইন সম্মত কোন পথ ধরে এদেশে প্রবেশ করেনি সে। ফিশিং বোট অথবা নির্জন কোন সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ করার সম্ভাবনা অবশ্য উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন এ ধরনের কোন ঝুঁকি নেবার মত বোকা সান্তিনো ভ্যালেন্টি নয়। বেআইনীভাবে ফ্রান্সে প্রবেশ করলে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। বিভিন্ন আইনরক্ষাকারী সংস্থা, হোটেল রেস্তোরাঁ, রেলওয়ে স্টেশন, নৌ-পুলিশ যে-কোন বিদেশীর পাসপোর্ট দেখতে চাইতে পারে, সেই পাসপোর্টে অফিশিয়াল স্ট্যাম্প না থাকলে লোকটাকে বিপদে পড়তে হবে। তাই এ ধরনের ভুল একমাত্র হাঁদারাম ছাড়া আর কারও কাছে আশা করা যায় না।

ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ কি ভাবছে তারও একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন ক্লড র‍্যাঁবো। ঠিক এই সময় লন্ডন থেকে ফোনে কথা বলতে চাওয়া হলো তাঁর সাথে। সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তিনি দ্রুত সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

বিশ মিনিট পর আবার ফিরে এলেন তিনি।

নিস্তব্ধ সভাকক্ষে ঝাড়া দশ মিনিট একা কথা বলে গেলেন ক্লড র‍্যাঁবো।

'এখন আমাদের করণীয় কি হবে?' ক্লড র‍্যাঁবো থামতেই জানতে চাইলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

'এখন আমরা অরগ্যানকে খুঁজে বের করার জন্যে গোটা দেশ চষে ফেলব। ব্রিটিশ পুলিশ বর্তমানে এয়ারলাইন্স টিকেট অফিস, ক্রস চ্যানেল ফেরি ইত্যাদির রেকর্ড ঘেঁটে দেখছে। কিছুক্ষণ পর পর তারা সর্বশেষ রিপোর্ট জানাবে বলে কথা দিয়েছে। অরগ্যানকে যদি ইংল্যান্ডে পাওয়া যায়, সাথে সাথে গ্রেফতার করা হবে তাকে। তাকে যদি ফ্রান্সে পাওয়া যায়...'

'তখন আমরা তাকে নিয়ে মাথা ঘামাব,' দৃঢ় স্বরে এই প্রথম কথা বলল হেড অভ দি অ্যাকশন সার্ভিসের চীফ কর্নেল বোল্যান্ড।

মুচকি হাসলেন ক্লড র‍্যাঁবো। বললেন, 'একটা ব্যাপার খুবই রহস্যময়। মহামান্য প্রেসিডেন্টের হবু খুনীর সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি, অথচ অনেক আগে থেকেই আমার বন্ধুদের কেউ কেউ অত্যন্ত স্পষ্ট ভঙ্গিতে আমাকে জানিয়ে রাখছেন তাকে পাওয়া মাত্র তার ব্যাপারে মাথা ঘামানো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে আমার জন্যে।

এর কারণ আমি বুঝতে অক্ষম।'

কর্নেল বোল্যান্ড এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'এর কারণ সহজবোধ্য। আপনি ডিটেকটিভ ফোর্সের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ডিটেকটিভ ফোর্সের কাজ লোকটাকে খুঁজে বের করা। এর বেশি কিছু নয়। এরপরের কাজ, যেমন লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা—এ দুটোই অ্যাকশন সার্ভিসের দায়িত্ব। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কাজ ভাগ-বাটোয়ারার অফিশিয়াল রীতি মাত্র। আমরা চাই না অ্যাকশন সার্ভিসের দায়িত্ব আর কোন সংস্থা পালন করতে উৎসাহ বোধ করুক। তা করলে সেটাকে আমরা আমাদের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করব।'

'আমি আপনার বক্তব্যের সাথে একমত,' ক্লড র‍্যাঁবো অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন। চুরুটে ফুঁক দিয়ে দাড়িতে কয়েকবার হাত বুলালেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'লোকটাকে খুঁজে বের করা ডিটেকটিভ ফোর্সের কাজ, একথা আপনিও স্বীকার করছেন। জিজ্ঞেস করি, খুঁজে বের করা বলতে ঠিক কি বোঝায়? যাকে খুঁজছি আর যাকে পেয়েছি এ দু'জন একই লোক কিনা তা নিশ্চিত হবার সময়টুকু নিশ্চয়ই আমাকে দেবেন আপনি, আশা করি? বলতে চাইছি, লোকটাকে পাবার পর তার সাথে কথা বলে আমি পরিষ্কার জানতে চাই সত্যি এই লোকই প্রেসিডেন্টকে খুন করতে চেয়েছিল কিনা। সে, সুযোগ আমার প্রাপ্য। যখন বুঝব এই লোককেই আমরা খুঁজছি তখন আপনার হাতে তাকে তুলে দিতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। আশা করি আমার প্রস্তাবে আমি অন্যায় বা অতিরিক্ত কিছু দাবি করছি না।'

কর্নেল বোল্যান্ডের চোখ খুলে গেল। ক্লড র‍্যাঁবো যা চাইছে তা দেয়ার অর্থ সব মিথ্যে ফাঁস হয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করা। এ অসম্ভব। কিন্তু লোকটার দাবি যথার্থ। অস্বীকার করলে আরও অনেকের মনে সন্দেহ জাগবে। বলল, 'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাব মেনে নিলাম।' কিন্তু মনে মনে সে অন্য কথা ভাবল। কাপুর সাথে আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা পাকা করে রাখতে হবে যাতে তাৎক্ষণিক নোটিসে উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশে ক্লড র‍্যাঁবোকে তাঁর এই বিশেষ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। দায়িত্ব কেড়ে নিলে সমস্ত অধিকার হারাবে সে, মাসুদ রানার সাথে কথা বলার কোন সুযোগ পাবে না।

প্রেয়সীকে বুকে তুলে নিয়ে আজকের মীটিংয়ের সমস্ত বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করল সুরেতের কর্নেল প্যাপন। ক্লড র‍্যাঁবোর উপর কর্নেলের এত কিসের রাগ তা অবশ্য পরিষ্কার বুঝল না লুইসা পিয়েত্রো। প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে অবশেষে বিশাল বপু কর্নেল ঘুমিয়ে পড়ল। পা টিপে টিপে পাশের কামরায় গেল লুইসা। দ্রুত, সংক্ষেপে কথা বলল ফোনে।

লন্ডন। স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ম্যালকম লয়েড ঝুঁকে পড়েছে ডেস্কের উপর। রিডিং ল্যাম্পের আলোয় গভীর মনোযোগের সাথে দুটো আলাদা ফটোসহ

পাসপোর্টের আবেদনপত্র পরীক্ষা করছে।

একটু পর সিধে হলো সে। বলল, 'রেডি?'

'স্যার,' নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সহকারী ইন্সপেক্টর।

'সান্তিনো ভ্যালেন্টি: উচ্চতা, পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি। চেক?'

'স্যার।'

'অরগ্যান: উচ্চতা ছয় ফিট।'

'জুতোর উঁচু হিল এর কারণ, স্যার। এমন জুতো পাওয়া যায় যা পরলে আপনি আড়াই ইঞ্চি অতিরিক্ত লম্বা হয়ে উঠবেন। অনেক বেঁটে লোক এ কাণ্ড করে থাকে। তাছাড়া, পাসপোর্ট কাউন্টারে কেউ কারও পায়ের দিকে তাকায় না।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল ম্যালকম লয়েড। 'ভ্যালেন্টি: চুলের রঙ ব্রাউন। ব্রাউন বলতে অনেক কিছু বোঝায়। হালকা না গাঢ় তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ফটোতে দেখে তো মনে হচ্ছে গাঢ় ব্রাউন। অরগ্যানের চুলের রঙও বলা হচ্ছে ব্রাউন। কিন্তু ফটোতে দেখে তো চুলগুলোকে হালকা সোনালী লাগছে আমার চোখে।'

'ঠিক, স্যার, কিন্তু ফটোতে সাধারণত চুলের রঙ গাঢ়ই দেখায়। নির্ভর করে আলোর কমবেশির ওপর। আমার মনে হয় অরগ্যান হবার জন্যে কলপ ব্যবহার করে চুলের রঙ হালকা করে নিয়েছে সে।'

'মেনে নিলাম। ভ্যালেন্টি: চোখের রঙ কালো। অরগ্যান: চোখের রঙ গ্রে।'

'কনট্যাক্ট লেন্স, স্যার।'

'কারেক্ট। ভ্যালেন্টি: বয়স ছত্রিশ। অরগ্যান: গত এপ্রিলে উনচল্লিশে পড়েছে।'

'বয়স তিন বছর না বাড়িয়ে উপায় ছিল না ওর,' ব্যাখ্যা করল ইন্সপেক্টর। 'কারণ আসল অরগ্যান, যে আড়াই বছর বয়সে মারা গেছে; তার জন্ম তারিখটা বদল করা সম্ভব নয়। কিন্তু ছত্রিশ বছরের কোন লোকের পাসপোর্টে যদি বয়স লেখা থাকে উনচল্লিশ তাতে কিছু এসে যায় না, কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করবে না।'

ফটো দুটোর দিকে আবার তাকাল ম্যালকম লয়েড। ভ্যালেন্টিকে একটু মোটাসোটা দেখাচ্ছে। মুখটা ভারী। কিন্তু অরগ্যানকে মেদহীন মনে হচ্ছে, মুখটাও তেমন ভারী নয়। এই পার্থক্য সম্ভবত ফটোগ্রাফির কৃতিত্ব।

'ক্লড র‍্যাবোকে সমস্ত তথ্য এবং ফটো পাঠাতে হয় তাহলে,' সহকারীকে বলল ম্যালকম লয়েড।

'হ্যাঁ। আমাদের কাজ এখানেই শেষ।'

'শেষ? আরে না! কাজ এখনও হাজারটা বাকি। কাল এয়ারলাইন্স টিকেট অফিস, ক্রস চ্যানেল ফেরি, কন্টিনেন্টাল ট্রেন টিকেট অফিস চেক করতে হবে। লোকটার বর্তমান পরিচয় কি তা তো আমাদেরকে জানতে হবেই, সেই সাথে জানতে হবে কোথায় আছে সে এখন।' কথা শেষ করে রিস্টওয়াচ দেখল সে। নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেছে চোদ্দ তারিখ। এক মিনিট আগেই বারোটা বেজে গেছে।

পাঁচ

ঘরের দরজা বন্ধ করে একাকী বসে আছে ব্যারনেস সিবা। চার বছরের বিবাহিত জীবনের সুখ আর দুঃখের হিসাব মেলাতে গিয়ে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে তার। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, তাই কোটিপতি প্রেমিক বৃদ্ধ হলেও সুখ-সচ্ছলতার আশায় তাকেই বিয়ে করেছে সে। তখন বোঝেনি টাকাটাই দুনিয়ার সব নয়।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকে প্রকাণ্ড দুর্গের মত প্রাসাদে একা বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে তাকে। বৃদ্ধ স্বামী স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে নিজের বাড়ি ছেড়ে কয়েকশো মাইল দূরের স্যানাটোরিয়ামে গেছে, জীবনের গোণা-গুণতি বাকি দিনগুলো সেখানেই থাকবে বলে স্থির করেছে সে। এদিকে চব্বিশ বছরের ভরা যৌবন নিয়ে বিশাল প্রাসাদে সে একা। এর নাম কি জীবন?

তবু স্বামীর প্রতি বেইমানী করার কথা কখনও ভাবেনি সিবা। প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় শরীর এবং মন, কিন্তু নির্মমভাবে নিজেকে শাসন করেছে সে, দমিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজ এ কি মতিভ্রম হলো তার!

স্বামীকে দেখতে গিয়েছিল সিবা। ফেরার পথে চোখে পড়ে গেল এক বিদেশী। কি সে দেখেছে তার মধ্যে, নিজেও জানে না ভাল করে। দেখামাত্র বাঁধা পড়ে গেছে। লোকটার চেহারা মনে পড়লেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে তার। এ অন্যায়, এ অনুচিত—নিজেকে সাবধান করার কম চেষ্টা করেনি সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে মন। লোকটাকে পাবার বাসনায় উন্মাদিনী হয়ে উঠতে যা বাকি এখন।

কথা বলার পর লোকটার প্রতি আকর্ষণ আরও যেন দুর্দমনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত ইংরেজ লোকটা। ভদ্রলোক বলে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ওদের। আর কেউ হলে তার মত সুন্দরীর সান্নিধ্যের জন্যে ভাদ্র মাসের কুকুরের স্বভাব প্রকাশ করে ফেলত, কিন্তু এ লোকের ব্যক্তিত্বই আলাদা। রূপ দেখেই ঢলে পড়েনি সে। সুযোগ পেয়েও লুফে নেয়নি।

আলোটা কি নিভিয়ে দেবে? খোলা বারান্দায় এখনও বসে আছে লোকটা, জানে সে। করিডর ধরে নিজের ঘরে ফিরতে হবে তাকে, এই ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। যায়নি, জানে সিবা। কান পেতে বসে আছে সে। পায়ের শব্দ পায়নি এখনও। অথচ রাত অনেক হলো। একা বসে বসে কি এত ভাবছে লোকটা?

এর আগে লক্ষ করেছে সিবা, গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করে লোকটা। প্রেমিকা ফাঁকি দিয়েছে, তাই মন খারাপ? নাকি বউ পালিয়েছে? কিছু একটা হবে। মনে ওর অনেক চিন্তা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে জানে, লোকটা হয়তো তারই মত দুঃখী।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সিবা। আলোটা নিভিয়ে দেয়াই ভাল। জ্বলতে

দেখলে লোকটা হয়তো ভাববে তার আশায় অপেক্ষা করছে। লোকটা তাকে এতটা ছোট আর সস্তা ভাবুক তা সে চায় না। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে অফ করে দিতে যাবে সুইচটা, এমন সময় পায়ের আওয়াজ এল কানে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, রোমাঞ্চিত হলো শরীর। যদি···যদি আসত ওর ঘরে!

ঢোক গিলল সিবা। অধীর উত্তেজনায় কাঁপছে সে। লোকটা কি তার ঘরের সামনে দিয়ে চলে যাবে? নাকি থামবে?

পায়ের আওয়াজ থামল। পরমুহূর্তে মৃদু নক হলো দরজায়। কি করছে, নিজেই যেন জানে না সিবা। হঠাৎ আবিষ্কার করল তার দুটো হাত কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করেই খুলে দিয়েছে দরজাটা।

করিডরে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছে রানা। বলল, 'হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি আমি।'

'দি-দিন।'

'ভাল লাগে।'

'তাহলে আমিও পারি আপনার কেন-র উত্তর দিতে,' উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সিবার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। হাসছে সে।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা।

'ভাল লাগে,' বলল সিবা। একটা হাত লম্বা করে দিল সে রানার দিকে।

এক পা এগিয়ে কামরায় ঢুকল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

রাতের মধ্যেই গোটা ফ্রান্স জুড়ে নতুন অনুসন্ধান পর্বের সূচনা হলো। সান্তিনো ভ্যালেন্টি নয়, এখন খোঁজা হচ্ছে আলেকজান্ডার অরগ্যানকে। এবার অল্প সময়ের মধ্যেই সুখবর পাওয়া গেল। একটা ফ্রন্টিয়ার পোস্ট থেকে জানানো হলো আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান নামে এক লোক বাইশে সেপ্টেম্বর ব্রাসেলস থেকে ছাড়া বারব্যান্ট এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে ফ্রান্সে ঢুকেছে।

এক ঘণ্টা পরের ঘটনা। একই ফ্রন্টিয়ার পোস্ট থেকে রিপোর্ট এল আরেকটা। ব্রাসেলস থেকে প্যারিসগামী এবং প্যারিস থেকে ব্রাসেলসগামী প্রতিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে নির্দিষ্ট একটা কাস্টমস ইউনিট তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে, তারা প্যারিস থেকে ব্রাসেলসগামী ইতোয়লি দু নর্দ এক্সপ্রেসের একত্রিশে সেপ্টেম্বর তারিখের যাত্রীদের তালিকায় অরগ্যানের নাম আবিষ্কার করেছে।

ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের শাখা অফিসের একজন কর্মচারী অরগ্যানের নামে পূরণ করা একটা হোটেলের কার্ড আবিষ্কার করল। কার্ডে অরগ্যানের পুরো নাম, পাসপোর্ট নাম্বার ইত্যাদি সব ঠিক আছে। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো প্লেস দে লা ম্যাডিলিনের কাছে ছোট এই হোটেলটায় বাইশে সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিল আলেকজান্ডার অরগ্যান।

খবর এসে পৌঁছানো মাত্র চার্লস ক্যারন এই মুহূর্তে হোটেলে হানা দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু ক্লড র‍্যাবো তাকে শান্ত করলেন। তাঁর ইচ্ছা, কাক ভোরে চুপি চুপি তিনি নিজে গিয়ে আলাপ করবেন হোটেল মালিকের সাথে।

তাই করলেন তিনি। মালিক লোকটা নিরীহ টাইপের একজন ভালমানুষ, ক্লড র‍্যাবো তার সাথে কথা বলে বুঝলেন অরগ্যান এখন এই হোটেলে নেই, কার্ডে উল্লেখ করা তারিখেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছে সে। কোথায় গেছে সে বা কোথায় যেতে পারে? হোটেল মালিক সবিনয়ে জানাল, এ ব্যাপারে তার কোন ধারণাই নেই।

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সাদা পোশাক পরা একজন ইন্সপেক্টরকে বোর্ডার হিসেবে হোটেলে থাকতে বলে নিজের অফিসে ফিরে এলেন ক্লড র‍্যাঁবো। এই হোটেলে অরগ্যান আবার ফিরে আসবে বলে তিনি মনে করেন না, তবে সাবধানের মার নেই ভেবে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেন মাত্র।

অফিসে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। 'সেপ্টেম্বরে অরগ্যানের এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল,' চার্লস ক্যারনকে বললেন ক্লড র‍্যাঁবো, 'খুন করার প্ল্যানটাকে যাচাই করে দেখা। বেড়াতে এসে কিভাবে কি করবে না করবে সব ঠিক করে ফিরে গেছে সে।'

এরপর হেলান দিয়ে রিভলভিং চেয়ারের কোলে ডুবে গেলেন ক্লড র‍্যাঁবো। ঠোঁটে তর্জনী ঠেকে আছে, চোখের দৃষ্টি সিলিংয়ের দিকে নিবদ্ধ। চিন্তা করছেন তিনি। হোটেলে কেন উঠল লোকটা? সামান্য হলেও হোটেলে ওঠায় ঝুঁকি থাকে, ঝুঁকি না নিলেও তো পারত। ও-এ-এস-এর অসংখ্য লোক আছে ফ্রান্সের সর্বত্র, তাদের বাড়িতে কেন আশ্রয় নেয়নি?

সম্ভাব্য একটাই উত্তর হতে পারে তার এই আচরণের। কাউকে সে বিশ্বাস করে না। কারও উপর তার পুরোপুরি আস্থা নেই। কাজটাকে সে সাংঘাতিক গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। এ কাজে ব্যর্থ হতে চায় না। তাই কারও সাহায্য নেবার ঝুঁকি সে নিচ্ছে না। তার মানে একা কাজ করে লোকটা। নিজের প্লট, নিজের প্ল্যান, নিজের অপারেশন। ভুয়া একটা পাসপোর্ট ব্যবহার করছে। সম্ভবত ব্যবহারে বজায় রাখছে বিনয় এবং ভদ্রতা, যাতে কারও মনে কোনরকম সন্দেহ না জাগে। হোটেলের মালিকও এই কথা বলেছে, 'খাঁটি একজন ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল তাকে আমার।' খাঁটি একজন ভদ্রলোক, ভাবছেন ক্লড র‍্যাঁবো, এবং বিষধর সাপের মত বিপজ্জনক। একজন পুলিসের জন্যে মস্ত কঠিন বাধা, এই খাঁটি ভদ্রলোকেরা। কেউ এদেরকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে না কখনও।

লন্ডন থেকে পাঠানো ভ্যালেন্টি আর অরগ্যানের ফটো দুটোর দিকে তাকালেন তিনি। ভ্যালেন্টি রূপান্তরিত হয়েছে অরগ্যানে, সেই সাথে বদলে গেছে উচ্চতা, চুলের রঙ, বয়স এবং সম্ভবত ভাব-ভঙ্গি। লোকটা কেমন, মনে মনে তার একটা ধারণা পেতে চেষ্টা করছেন তিনি। আত্মবিশ্বাসী, কোন সন্দেহ নেই। জানা নেই, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আচার ব্যবহারে লোকটা দারুণ স্মার্ট। এবং এ লোকের মধ্যে দুর্ভেদ্য একটা ব্যক্তিত্ব না থেকেই পারে না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে খুন করতে আসছে, তার মানে দুনিয়ার সেরা দুঃসাহসীদের একজন সে। এবং বুদ্ধিমান। তা নাহলে এই দায়িত্ব কেউ তার ঘাড়ে চাপাত না। যোগ্য লোক, সন্দেহের অবকাশ নেই। এতবড় দায়িত্ব বোকা লোকের পক্ষে নেয়া সম্ভবই নয়। গুছানো স্বভাবের লোক, এও পরিষ্কার বোঝা যায়। তার লন্ডনের বাড়িতে এতটুকু

ফালতু কিছু পাওয়া যায়নি। প্রখর দূরদৃষ্টি রয়েছে লোকটার মধ্যে। সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন, এবং সেজন্যে প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে। নিখুঁত ভাবে মাপজোক করে উতরে যাবার সম্ভাবনা ষোলো আনা দেখলেই কেবল ঝুঁকি নেয়। যত্নের সাথে, মনোযোগের সাথে কাজ করে, ফলে ভুল হয় না।

এবং ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক স্বভাবের লোক। সশস্ত্র, অবশ্যই। কিন্তু কি সেটা? বাঁ দিকের বগলের নিচে একটা অটোমেটিক? পাঁজরের সাথে বাঁধা একটা থ্রোয়িং নাইফ? একটা রাইফেল? কিন্তু কাস্টমস চেকিংয়ের সময় সেটা লুকাবে কোথায়? এ ধরনের একটা জিনিস নিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি ঘেঁষবে কিভাবে, যেখানে প্রেসিডেন্টের বিশ গজের মধ্যে এমন কি মহিলাদের হ্যান্ডব্যাগ পর্যন্ত সার্চ করা হয়? প্রেসিডেন্টের যে কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের তিনশো গজের মধ্যে লম্বা কোন প্যাকেট নিয়ে যাওয়া নিষেধ, সেরকম কিছু নিয়ে কাউকে দেখা গেলে কোন প্রশ্ন না করেই ঘাড় ধরে তোলা হয় পুলিসের গাড়িতে।

এই কড়াকড়ির মধ্যে কি ভাবে সে প্রেসিডেন্টের কাছে ঘেঁষবে? সম্ভব নয়। অথচ লোকটার বিশ্বাস, সম্ভব। সম্ভব মনে না করলে দায়িত্বটা কাঁধে নিত না সে। কি ভাবে সম্ভব, একমাত্র সেই জানে। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, এই লোক অসাধারণ প্রতিভাবান। কিভাবে কি করার কথা ভেবেছে, কেউ তা অনুমান করতে পারছে না। লোকটার সাথে দেখা হলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব আমি, ভাবছেন ক্লড র‍্যাবো। হোক সে একজন খুনী, গুণী লোক তো বটে! গুণীর সান্নিধ্য পাওয়া সৌভাগ্য বৈকি।

আশ্চর্য এই যে, ভাবছেন তিনি, এই রকম একজন লোক সম্পর্কে ফ্রান্সের উচ্চপদস্থ অফিসারদের ধারণা, সে নাকি আর সব সাধারণ গুণ্ডাপাণ্ডাদের মতই একজন।

'মাই গড!' প্রায় আঁতকে উঠলেন ক্লড র‍্যাবো। দেখা যাচ্ছে অরগ্যান সাহেব তাঁকে পর্যন্ত দিশেহারা করে ছেড়েছে! চুরুট ধরাবার কথাটা পর্যন্ত বেমালুম ভুলে বসে আছেন তিনি।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আপন মনে হাসছেন ক্লড র‍্যাবো, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে অলসভঙ্গিতে হাত বুলাচ্ছেন আর ভাবছেন, একটা ব্যাপারে অরগ্যান পিছিয়ে আছে তাঁর চেয়ে। খুনীর বর্তমান পরিচয় জানেন তিনি। এ ব্যাপারে খুনী অজ্ঞ। এই ব্যাপারটা ছাড়া আর সব ব্যাপারে তাঁর চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে অরগ্যান। কিন্তু আজকের মীটিংয়ে তাঁর এই বক্তব্যটার মর্ম কেউ বুঝতে চায়নি।

সে ধরা পড়ার আগে তুমি যা জানো তা যদি সে জেনে ফেলে এবং আবার চেহারা এবং পরিচয় বদল করে, বাবা ক্লড, সেক্ষেত্রে তোমার কপালে মস্ত দুর্ভোগ আছে—নিজের সাথে কথা বলছেন তিনি।

'সেক্ষেত্রে,' অস্ফুট বললেন তিনি, 'আর কোন আশা থাকবে না।'

চার্লস ক্যারন মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'ঠিক বলেছেন, মশিয়ে। কোন আশা নেই অরগ্যানের।'

চটে উঠলেন ক্লড র‍্যাবো। ধমক মেরে বসলেন সহকারীকে। এমন মেজাজ সাধারণত তিনি দেখান না।

অসংখ্য ভাঁজ খাওয়া ধবধবে সাদা চাদরটা থেকে সরে গেছে চাঁদের আলো। জানালা গলে এখনও ঢুকছে এক ফালি জ্যোছনা, কার্পেটের উপর অযত্নে পড়ে থাকা ব্রেসিয়ার আর ব্লাউজটাকে আলোকিত করে রেখেছে। বিছানায় ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে দুটো শরীর।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ব্যারনেস সিবা। চোখের দৃষ্টি সিলিংয়ের দিকে। তার বুকে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে রানা। ওর সোনালী চুলের ভিতর কিলবিল করছে সিবার আঙুলগুলো। মধ্যরাতের মধুর উন্মাদনার কথা ভাবছে সে, মৃদু ফাঁক হলো তার ঠোঁট জোড়া, নিজের অজান্তেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল মুখে।

এই রকম ভয়ঙ্কর আনন্দময় একটা রাতের প্রয়োজন ছিল তার। যা ঘটেছে, তার জন্যে কিছুতেই নিজেকে সে অপরাধী ভাবতে পারছে না। জীবনটা অবহেলার নয়, নিজেকে বঞ্চিত করার মধ্যে গর্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নেই, এই সব যুক্তি খাড়া করে ফেলেছে সে মনে মনে। সুখের আমেজ এখনও লেগে আছে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে। এখনও তার নেশাচ্ছন্ন ভাব কাটেনি। কিন্তু, যা ঘটার ঘটেছে, এখন দেখতে হবে কোনরকম বাড়াবাড়ি যেন না হয়ে যায়। বিছানার পাশে টেবিল ক্লকটার দিকে তাকাল সে। পোনে পাঁচটা বাজে। সোনালী চুল মুঠো করে ধরল সে, মৃদু টান দিল। 'এই, শুনছ!'

একবার 'উঁ' করে উঠল ঘুমের ঘোরে রানা। ওরা দু'জনেই ভাঁজ খাওয়া চাদরের উপর বিবস্ত্র। তবে সেন্ট্রাল হিটিং কামরাটাকে উষ্ণ করে রেখেছে। সিবার বুকে অনেকটা যেন ঘুমের ঘোরেই গাল ঘষল রানা। খোঁচা খোঁচা দাড়ির ঘষায় হঠাৎ আবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে সিবা নিজের ওপর থেকে। দুই হাতে চেপে ধরে পিষে ফেলতে চাইল রানার মাথাটা নিজের বুকের সাথে। রানার একটা হাত ওর পেটের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। শিউরে উঠে চট্ করে এক হাতে ধরে ফেলল সে রানার হাতটা। পাগল করে দেবে নাকি লোকটা ওকে! অনেক কষ্টে সে সামলে নিল নিজেকে।

'না, আর নয়। প্লীজ!'

'কেন নয়?'

'না।'

মুখ তুলে তাকাল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, ধন্যবাদ। আর দু'ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হবে আমাকে, এবং দিনের আলো ফোটার আগেই নিজের ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত তোমার। এবার ওঠো। জানাজানি হয়ে গেলে বিপদে পড়ব আমি।'

মর্ম অনুধাবন করতে পেরে লক্ষ্মী ছেলের মত মাথা ঝাঁকাল রানা, গড়ান খেয়ে বিছানার কিনারায় পৌঁছল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেঝেতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের কাপড়-চোপড় কোথায় খুঁজছে। খাটের নিচে হাতড়ে রানার কাপড়-চোপড় পেল সিবা, টেনে আনল সব চিবুকের কাছে। 'একটা আলতো চুমোর বিনিময়ে পেতে পারো এগুলো।'

জামা-কাপড় পরা শেষ হতে বিছানার কিনারায় বসল রানা। একটা হাত

সিবার ঘাড়ের পিছনে রেখে নিজের দিকে আকর্ষণ করল তাকে।
'কেন করলে কাজটা?'
'কেন জিজ্ঞেস করছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল সিবা।
'তোমাকে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ে বলে মনে হয়নি আমার, তাই।'
'তৃষ্ণার্ত ছিলাম গত তিনটে বছর।' সত্যি কথাটাই বলে ফেলল সিবা।
'মিটেছে তৃষ্ণা?'
'এ তৃষ্ণা কি মিটবার?' হেসে উঠল সিবা। 'সমাজের কিছু কিছু বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া উচিত। ইচ্ছে করলেই আগামী সাতটা দিন আমরা একসাথে কাটাতে পারি না। বিপদে ফেলার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাবে শুভাকাঙ্ক্ষীর দল।'
মাথা ঝাঁকাল রানা। আলতো করে চুমো খেল সিবার ঠোঁটে। তারপর উঠে দাঁড়াল।
'তোমার নামটা জানা হলো না।'
এক সেকেন্ড ভাবল রানা। 'অ্যালেক্স।'
'ইচ্ছে করলেই অপমান করতে পারতে,' বলল সিবা, 'তা করোনি বলে অসংখ্য ধন্যবাদ, অ্যালেক্স।'
মাথা নিচু করে আবার চুমু খেল রানা।
'যাই। গুড নাইট, সিবা। আবার দেখা হবে কি?'
'না,' ফিসফিস করে বলল সিবা। 'আসলে…জানি না। হলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। কিন্তু উচিত হবে না।'
'খুব আবছা হয়ে গেল না উত্তরটা?'
'বিদায়ের বেলা ভবিষ্যৎটাকে আবছাই থাকতে দাও না! যদি দেখা হয়, হবে। যদি না হয়, নাই হবে। সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগটা আমরা বরং ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিই না?'
মুচকি একটু হাসল রানা।
পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ও। বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

সকাল সাতটা। দূর থেকে দেখা গেল, বন বন করে প্যাডেল মেরে হোটেল দু সার্ফের দিকে ছুটে আসছে স্থানীয় একজন পুলিস কনস্টেবল। সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নামল সে। টেনেটুনে ইউনিফর্মটা ঠিকঠাক করে নিয়ে লবিতে ঢুকল। হোটেলের মালিক রিসেপশনে বসে বোর্ডারদের কামরায় ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি পাঠাবার কাজ তদারক করতে ব্যস্ত, কনস্টেবলকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল সে। 'মারিয়া!' হাঁক ছেড়ে একজন কর্মীকে ডাকল সে। 'মশিয়ের জন্যে এক কাপ কফি নিয়ে এসো।'
এই ক'দিন রোজ আসা যাওয়া করছে কনস্টেবল লোকটা। মারিয়ার উপর তার নজর পড়েছে, মালিকের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। একটা চেয়ার টেনে বসল কনস্টেবল।
'এই যে, নতুন কার্ডগুলো নিন,' কয়েকটা সাদা কার্ড বাড়িয়ে দিল মালিক কনস্টেবলের দিকে। গতকাল সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হোটেলে নতুন যে ক'জন

গেস্ট এসেছে তাদের নাম-ধাম-পরিচয় ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে এক একটি কার্ডে।
কার্ডগুলো হাতে নিয়ে গুনল কনস্টেবল। তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট উল্টাল সে। 'কি যে এর অর্থ, কিছুই বুঝি না। রোজ দু'চারটে কার্ড নিতে এতটা পথ সাইকেল নিয়ে আসা কম কষ্ট নাকি!'
সহানুভূতির সাথে একটু হাসল হোটেল মালিক। পরক্ষণে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।
সকাল সাড়ে আটটায় গ্যাপ শহরের থানা হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল কনস্টেবল। থানা অফিসার কার্ডগুলো তার কাছ থেকে গুনে নিয়ে রেখে দিল ডেস্কের দেরাজে। আজই কোন এক সময় লিয়নস্-এর রিজিওন্যাল হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে হবে এগুলো। সেখান থেকে সোজা চলে যাবে প্যারিসের সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিসে।
ঠিক সেই সময় হোটেল দু সার্ফের রিসেপশনে দাঁড়িয়ে বিল মেটাচ্ছে ব্যারনেস সিবা। এক মিনিট পর মার্সিডিজে চড়ে বসল সে। গাড়ির নাক পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো নিজের প্রকাণ্ড দুর্গের দিকে। একঘেয়ে, বন্দী জীবনে ফিরে যাচ্ছে ব্যারনেস সিবা।
উপরতলায় তখনও ঘুমাচ্ছে রানা।

নিজের অফিসে সহকারীদের নিয়ে গুছিয়ে বসেছে ডিটেকটিভ সুপার ম্যালকম লয়েড। ক'দিন আগের চেহারার সাথে তার বর্তমান চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনিদ্রা তার দুই চোখের নিচে কালো সিলমোহরের ছাপ মেরে দিয়েছে। ক্লিনশেভ মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি গজিয়েছে। এই ক'দিনে তার ওজনও বেশ খানিকটা কমে গেছে।
পাশের কামরায় অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কাজ করছে ছয়জন সার্জেন্ট এবং দু'জন ইন্সপেক্টর। দুটো কামরার মধ্যে যোগাযোগ রাখছে ইন্টারকম। ঠিক দশটায় ডাক এল ইন্টারকমে।
'হ্যালো।'
'বন্ধু অরগ্যান,' সিনিয়র ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অপর-প্রান্ত থেকে বলল। 'সোমবার সকালের নির্ধারিত বি-ই-এ ফ্লাইটে চড়ে লন্ডন ত্যাগ করেছে। টিকেট বুক করা হয়েছে শনিবারে। নাম সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আলেকজান্ডার অরগ্যান। টিকেট নিয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে, নগদ টাকা দিয়ে।'
'লন্ডন থেকে কোথায়? প্যারিসে?'
'না, সুপার। ব্রাসেলসে।'
মুহূর্তে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল ম্যালকম লয়েডের। বলল, 'ঠিক আছে, শোনো। বেলজিয়ামে গেছে বটে, কিন্তু হয়তো ফিরেও এসেছে। এয়ার-লাইন বুকিং চেক করতে থাকো, দেখো একই নামে আর কোন বুকিং আছে কিনা। বিশেষ করে চেক করো এখনও লন্ডন ত্যাগ করেনি এমন ফ্লাইটের টিকেট বুক করা হয়েছে কিনা। সাবধান, অ্যাডভান্স বুকিং চেক করতে ভুলো না। ব্রাসেলস থেকে যদি ফিরে এসে থাকে, খবরটা পাওয়া মাত্র জানাবে আমাকে। তবে ফিরে এসেছে

কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আমরা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি ওকে। তবে তদন্ত শুরু হবার কয়েক ঘন্টা আগে লন্ডন ছেড়ে গেছে ও, সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের কোন ত্রুটি নেই।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে টেলিফোন থেকে রিসিভার তুলল ম্যালকম লয়েড। অপারেটরকে বলল, 'প্যারিসের ক্লড র‍্যাঁবোকে দিন।'

দশটা বেজে পাঁচ মিনিট।

'ধন্যবাদ, ভাই লয়েড,' টেলিফোনে কথা বলছেন ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ সুপারের সাথে ক্লড র‍্যাঁবো। 'বেলজিয়ামের সাথে এখান থেকেই যোগাযোগ করছি আমরা। ...হ্যাঁ, অবশ্যই, অরগ্যানকে আবার পাওয়া গেলেই জানাব আপনাকে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে নতুন একটা চুরুট ধরালেন ক্লড র‍্যাঁবো। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন একবার। একান্ত সচিব চার্লস ক্যারনকে বললেন, 'ব্রাসেলসের সুরেতের সাথে যোগাযোগ করো। এখুনি।'

পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসেছে সূর্য, এই সময় ঘুম ভাঙল রানার। শাওয়ার সেরে পোশাক পরল ও। মেইড সার্ভেন্ট মারিয়ার কাছ থেকে ইস্ত্রী করা চেক স্যুটটা নিয়ে বকশিশ দিল তাকে। সাড়ে দশটার সময় আলফা নিয়ে ঢুকল শহরে। গাড়ি দাঁড় করাল পোস্টাফিসের সামনে। এখান থেকে ফোন করল প্যারিসে।

বিশ মিনিট পর ঠোঁট কামড়ে ব্যস্ততার সাথে বেরিয়ে এল রানা। কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। কাছাকাছি একটা হার্ডঅয়্যারের দোকান থেকে দুই টিন রঙ কিনল ও। এক টিন মিডনাইট ব্লু, আরেক টিন সাদা। অন্য একটা দোকান থেকে এক জোড়া আলাদা সাইজের ব্রাশ এবং একটা স্ক্রু ড্রাইভার কিনল ও। গাড়ির গ্লাভ কমপার্টমেন্টে জিনিসগুলো ভরে নিয়ে ফিরে এল হোটেল দু সার্ফে। রিসেপশনে থেমে মালিককে ওর বিল তৈরি করার অনুরোধ জানিয়ে উঠে গেল উপরে, লাগেজ নামিয়ে আনার জন্যে।

গাড়ির বুটে সুটকেস তিনটে এবং ব্যাক সীটে হ্যান্ডগ্রিপটা রেখে দ্রুত রিসেপশনে ফিরে এল রানা। তাড়াহুড়োর সাথে বিল মেটাল। হোটেলের মালিক একটা অস্থিরতা লক্ষ করল রানার মধ্যে। কিন্তু বিল মেটাবার পরও নড়ল না রানা। কেন যেন অপেক্ষা করছে ও। হাজার ফ্র্যাঙ্কের নোট ভাঙতি চাইল কয়েকটা। 'দেখি আছে কিনা,' বলে ভিতরের কামরায় চলে গেল মালিক। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল রানা। রেজিস্ট্রি বুকের পাতা উল্টে ব্যারনেস সিবা লা বোর্ন দে লা শিওন নামটার পাশে লেখা ঠিকানাটা দেখে নিল: হাউতে শেলনেয়ার, করেজ।

এক মিনিট পর গর্জে উঠল আলফা রোমিও। ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল হোটেলের গেট দিয়ে।

বিপদ আঁচ করতে পেরেছে রানা।

পালাচ্ছে।

*

দুপুরের দিকে আরও মেসেজ এল ক্লড র‍্যাবোর অফিসে। ব্রাসেলসের সুরেত ফোন করে জানিয়েছে, সোমবারে অরগ্যান মাত্র পাঁচ ঘণ্টার জন্যে শহরে ছিল। লন্ডন থেকে বি-ই-এ-র ফ্লাইটে ব্রাসেলসে নেমেছিল বটে, কিন্তু বিকেলের আলিটালিয়া ফ্লাইট ধরে চলে গেছে মিলানে। ডেস্কে নগদ টাকা দিয়ে টিকেট নিয়েছিল সে, তবে টিকেটটা রিজার্ভ করা হয়েছিল শনিবারে, লন্ডন থেকে ফোন করে।

মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ক্লড র‍্যাবো মিলানিজ পুলিসের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিলেন অপারেটরকে। রিসিভার নামিয়ে রেখে চুরুট ধরাতে যাবেন, ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোন।

এবার ফোন এসেছে ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজ থেকে। জরুরী একটা মেসেজ:

> ইটালি থেকে ফ্রান্সে ঢোকার জন্যে ভেন্টিমিগলিয়া চেক পোস্টে গতকাল সকালে যে-সব ট্যুরিস্ট আসে তাদের মধ্যে একজন আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান ছিল। সীমান্ত পেরোবার জন্যে প্রত্যেক ভ্রমণকারীকে একটা ফর্ম পূরণ করতে হয়, সেই পূরণ করা ফর্ম পরীক্ষা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

শান্তশিষ্ট ক্লড র‍্যাবো ফেটে পড়লেন ক্ষোভে। 'মাই গড!' ভুরু জোড়া কপালে তুলে একান্ত সচিবের দিকে তাকালেন তিনি। 'প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে!' হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ভুরু কুঁচকে হাতে ধরা রিসিভারটার দিকে তাকালেন, নামিয়ে রাখতে ভুলে গেছেন তিনি। সব রাগ গিয়ে পড়ল সেটার উপর। খটাশ করে আছাড় মারলেন সেটাকে ক্রাডলের উপর।

চার্লস ক্যারন চোখেমুখে বিস্ময় এবং প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে চীফের দিকে

চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন ক্লড র‍্যাবো। আগের চেয়ে শান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে 'অবশ্য, দোষ দেয়া যায় না ওদেরকে। কাল সকালেই শুধু পঁচিশ হাজারের ওপর বিদেশী লোক ঢুকেছে ফ্রান্সে, সবগুলো কার্ড চেক করা সহজ কাজ নয়। যাই হোক, দেরিতে হলেও এখন আমরা জানি প্রেসিডেন্টের হবু খুনী এখানে পৌঁছে গেছে। ফ্রান্সের ভিতরে। কোন সন্দেহ নেই। শোনো, সুপার লয়েডকে ফোন করে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাও আবার। বলো, অরগ্যান এখন ফ্রান্সে রয়েছে, এখান থেকেই তার বিরুদ্ধে যা কিছু করার করছি আমরা।'

ইউনিফর্ম পরা একজন পিয়ন ক্লড র‍্যাবোর ডেস্কে ধূমায়িত এক কাপ কফি রেখে গেল। সেদিকে হাত বাড়াতে যাবেন ক্লড র‍্যাবো, তাঁর ডান পাশের ফোনটা বেজে উঠল। লিয়নস এর থানা হেডকোয়ার্টার থেকে একজন অফিসার কথা বলছে। নিঃশব্দে শুনলেন ক্লড র‍্যাবো। ধীরে ধীরে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখের চেহারা। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে একান্ত সচিবের দিকে তাকালেন তিনি।

'পাওয়া গেছে ওকে। গতরাতে দু'দিনের জন্যে হোটেল দু সার্ফে উঠেছে।' মাউথপীস থেকে হাত সরিয়ে থানা অফিসারকে বললেন, 'শুনুন। কেন চাই অরগ্যানকে তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। ফরাসী জাতির জন্যে সে একটা মস্ত হুমকি। এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। জাতীয়

নিরাপত্তার খাতিরে তাকে যেভাবে হোক আটক করতে হবে।...হ্যাঁ, আপনাকে কি করতে হবে বলে দিচ্ছি...'

দশ মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে গেলেন ক্লড র‍্যাবো। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। সাথে সাথে চার্লস ক্যারনের ডেস্কে একটা ফোন বেজে উঠল।

আবার ফোন করেছে ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজ। নতুন একটা তথ্য এইমাত্র তাদের হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁচেছে: অরগ্যান ফ্রান্সে ঢুকেছে ভাড়া করা একটা সাদা আলফা রোমিও স্পোর্টস টু-সিটার নিয়ে, রেজিস্ট্রেশন নম্বর—MI-61741.

'সব থানা এবং রেডিও পুলিস পেট্রোলকে সতর্ক করে দিই?' উত্তেজিতভাবে জানতে চাইল চার্লস ক্যারন।

'না, এখনই নয়। সাধারণ একজন গাড়ি চোর ভাববে সবাই তাকে। শহরতলির একজন পুলিস দেখামাত্র এগিয়ে যাবে গাড়িটাকে থামাবার জন্যে। অরগ্যান থামবে না। বিপদ দেখলে তার সামনে এখন একটা পথই খোলা আছে। সোজা পুলিসের বুক বা মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবে সে।' দাড়িতে হাত বুলিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি। 'হোটেলে দু'দিনের জন্যে উঠেছে। কিন্তু শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে যাবার পর হোটেলে এখনও ফিরে আসেনি সে।'

'হোটেলের মালিকের সাথে...'

'না, তার সাথে যোগাযোগ করা হয়নি,' ক্লড র‍্যাবো বললেন, 'তার দরকারও নেই। দু'দিনের জন্যে উঠেছে যখন, ধরে নেয়া যেতে পারে আবার সে ফিরে আসবে হোটেলে। নির্দেশ দিয়েছি সাদা পোশাক পরা সশস্ত্র লোকেরা যেন হোটেলটাকে ঘিরে রাখে। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলে রক্তপাত চাই না। তুমি খবর নাও, এয়ারফোর্সের যে হেলিকপ্টারটা আমাদের জন্যে তৈরি থাকার কথা সেটা কোথায় আছে। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হতে চাই আমি।'

ঠিক এই সময় গ্যাপ শহরে চলছে রানার বিরুদ্ধে তুমুল আয়োজন। শহর থেকে বেরিয়ে যাবার প্রতিটি রাস্তার উপর ইস্পাতের তৈরি রোড ব্লকের সরঞ্জাম স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি রোড ব্লকের পিছনে বালির বস্তা সাজিয়ে উঁচু আড়াল তৈরি করা হচ্ছে। স্থানীয় মিলিটারি ক্যাম্প থেকে দুশো কমান্ডোর একটা দলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারা বালির বস্তার পিছনে সাব-মেশিনগান নিয়ে সতর্ক থাকবে। গ্রেনোবল এবং লিয়নসেও পুলিস এবং সেনাবাহিনীর লোক ভর্তি ভারী ট্রাকের দুদ্দাড় আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

তেল আর ময়লার দাগ লাগতে পারে, তাই ট্রাউজার ছাড়া গা থেকে আর সব খুলে ফেলেছে রানা। গাছের ছায়ায় কাজ করছে, কিন্তু চারদিকে দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ, ঘেমে নেয়ে উঠেছে ও। গাড়ি রঙ করার কাজটা ধরার পর দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয়নি।

গ্যাপ ছেড়ে Veyne এবং Aspres-Sur-Buech-এর ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হয়েছিল ও। প্রায় পুরো রাস্তাটা নিচের দিকে ঢালু হয়ে পাহাড় থেকে নেমে গেছে। খানিক পর পর একটা করে বাঁক। কিন্তু ফাঁকা রাস্তা, এদিকের ট্রাক ড্রাইভাররা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত। সারাক্ষণ একটা অস্বস্তিকর তাড়া

অনুভব করছে রানা, তাই সে-ও ঘণ্টায় ষাট মাইলের কমে গাড়ি চালায়নি কোথাও। Aspres পেরিয়ে আর এন নাইনটি থ্রী ধরে আঠারো মাইল ড্রোম নদীর কিনার ঘেঁষে এগিয়েছে ও। Lucen-Diois ছাড়িয়ে খানিকদূর এগিয়ে রাস্তা থেকে সরে এসেছে আলফা নিয়ে। অসংখ্য সাইড রোডের একটা বেছে নিয়ে জঙ্গল মোড়া পাহাড়ী এলাকায় ঢুকেছে। এদিকের পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট অনেক গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা যাওয়া আসা করে এমন জায়গা এড়িয়ে জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভিতরে চলে এসেছে ও।

মাঝ বিকেলে কাজ শেষ হলো, দু'পা পিছিয়ে এল গাড়ির কাছ থেকে রানা। গাড়ির রঙ এখন চকচকে নীল, প্রায় সব জায়গার রঙ ইতোমধ্যে শুকিয়ে গেছে। নাম্বার প্লেট দুটো আগেই খুলে ফেলা হয়েছে, উল্টোভাবে পড়ে রয়েছে ঘাসের উপর। দুটোরই পিছন দিকে সাদা রঙ দিয়ে কাল্পনিক ফ্রেঞ্চ নাম্বার লেখা রয়েছে। নাম্বারগুলোর শেষ সংখ্যা দুটো পঁচাত্তর। এটা প্যারিসের রেজিস্ট্রেশন কোড। ফ্রান্সের যে-কোন রাস্তার গাড়ির সাধারণ নাম্বার এটা।

মনটা তবু খুঁত খুঁত করছে রানার। রঙটা মোটামুটি মন্দ হয়নি, কিন্তু তবু তো আনাড়ি হাতের কাজ, সন্দেহপ্রবণ যে-কোন লোকের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। অস্বস্তিকর আরেকটা ব্যাপার হলো, সাদা ইটালিয়ান আলফার কাগজপত্রগুলো নীল ফ্রেঞ্চ আলফার কাগজ হিসেবে চালানো যাবে না। কোথাও রোড ব্লকের সামনে যদি পড়তে হয়, কাগজপত্র দেখিয়ে পার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

হাতের রঙ মুছছে রানা। ভাবছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামার অপেক্ষায় থাকবে, নাকি এই উজ্জ্বল রোদেই ঝুঁকি নিয়ে রওনা হয়ে যাবে আবার?

অনুমান করল, ওর ভুয়া পরিচয় এবং নাম জানাজানি হয়ে যাওয়ায় কোন্ সীমান্ত দিয়ে ফ্রান্সে ঢুকেছে ও, তা আবিষ্কার করতে ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজের খুব বেশি সময় লাগবে না। গাড়িটার নাম এবং রঙ কি তাও অজানা থাকবে না ওদের। হাজার হাজার পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে গাড়িটাকে। খুন করার নির্দিষ্ট তারিখের বেশ ক'দিন আগে ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে ও, সুতরাং অতিরিক্ত এই ক'টা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার ওর। ওর বিবেচনায় সেরকম একটি মাত্র আশ্রয় ওকে দিতে পারে দুশো পঞ্চাশ মাইল দূরে করেজের একটা দুর্গ। সেখানে যথাসম্ভব অল্প সময়ে পৌঁছবার একমাত্র উপায় গাড়ি। ঝুঁকি নেয়া হয়, ঠিক। কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও নেই। দেরি না করে রওনা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। পুলিস সোনালী চুলের আলফা রোমিওর ড্রাইভারের খোঁজ শুরু করার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যেতে চায় ও।

নতুন নাম্বার প্লেট দুটো স্ক্রু দিয়ে এঁটে নিল রানা গাড়িতে। অবশিষ্ট রঙ এবং ব্রাশ দুটো ফেলে দিল ছুঁড়ে। গাছের ডাল থেকে নামাল সিল্কের সোয়েটার আর জ্যাকেটটা, তারপর উঠে বসল আলফার ড্রাইভিং সীটে।

আর-এন-নাইনটি-থ্রী-তে উঠে এসে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। বিকেল তিনটে বেজে একচল্লিশ মিনিট।

শব্দ শুনে জানালার বাইরে গলা বাড়াল রানা, তাকাল আকাশের দিকে।

সবুজ রঙের মস্ত একটা ফড়িংয়ের মত পুবদিকে উড়ে যাচ্ছে একটা হেলিকপ্টার।

সাত মাইল পেরিয়ে একটা গ্রামে ঢুকল রানা। অপরপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। চৌরাস্তায় একটা সাইনবোর্ড দেখল রানা। গ্রামের নাম লেখা রয়েছে তাতে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা ওর। ডি আই ই—ডাই, মানে মৃত্যু। শব্দটার উচ্চারণ ইংরেজী ভাষার রীতি অনুযায়ী হবে না জানে ও, তবু কেমন যেন ভয় ঢুকে গেল মনে। কুসংস্কারকে জীবনে কখনও পাত্তা দেয়নি, কিন্তু আবার ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক যান্ত্রিক একটা শোরগোল কানে ঢুকতেই।

গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে রানা। মোড় নিয়ে মেইন রোডে পড়তেই ঝকঝকে শ্বেত পাথরের ওয়র-মেমোরিয়াল দেখতে পেল। রাস্তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা মোটরসাইকেলে বসে আছে কালো চামড়ার কোট পরে বিশালদেহী একজন পুলিস, মাথার উপর হাত তুলে রাস্তার ডান দিকে সরে গিয়ে থামতে নির্দেশ দিচ্ছে।

ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার মাথার ভিতর। গাড়ির তলায় তার দিয়ে বাঁধা রয়েছে রাইফেল ভর্তি স্টীল টিউবগুলো। গাড়িটাকে যদি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, অবশ্যই চেক করা হবে তন্ন তন্ন করে। না, তা হতে দিতে পারে না ও। সাথে পিস্তল বা ছুরি নেই। মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা বোধ করল রানা। কি করবে এখন ও? সোজা এগিয়ে ধাক্কা মারবে মোটরসাইকেলে, তারপর স্পীড বাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করবে? সেক্ষেত্রে কয়েক মাইল এগিয়েই গাড়িটাকে ত্যাগ করতে হবে। চেহারা বদল করে ছদ্মবেশ নিতে হবে ধর্মযাজক বেনসনের। কিন্তু সাথে আয়না নেই। ওয়াশ বেসিনের সাহায্য পাবে না। তারপর হাঁটতে হবে ওকে, চারটে লাগেজ সহ। নাকি দাঁড় করাবে গাড়ি?

মাত্র পঁচিশ গজ দূরত্ব এখন। যা করার তিন সেকেণ্ডের মধ্যে করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল ওকে পুলিসটা নিজেই। গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনছে রানা, এমন সময় তড়াক করে লাফ দিয়ে নামল সে মোটরসাইকেল থেকে, ঝট্ করে তাকাল রাস্তার উল্টো দিকে।

রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখছে রানা। অপেক্ষা করছে।

যান্ত্রিক শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হঠাৎ খুব কাছ থেকে তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ নেমে এল রানার। কি ঘটতে যাচ্ছে জানা নেই ওর। যাই ঘটুক, এখন আর গাড়ি থেকে বেরোবার বা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে বা পিছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। মত্ত ক্ষ্যাপা একদল ষাঁড়ের মত গ্রামে ঢুকল পুলিস কনভয়টা। চারটে সিট্রন, ছয়টা কালো ম্যারিয়াজ, পিছনে চারটে পুলিস ভ্যান। লাফ দিয়ে রাস্তার একপাশে সরে এল পুলিসটা, দ্রুত হাত তুলে স্যালুট করল। দাঁড়ানো আলফা ঘেঁষে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে গেল সব ক'টা পুলিস ভর্তি গাড়ি। প্রত্যেকের হাতে চকচকে নীলচে সাব-মেশিনগান দেখল রানা।

কপাল থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে গম্ভীরভাবে তাকাল পুলিসটা। হাত ইশারায় জানাল, এবার সে নিজের পথে যেতে পারে। লোকটা মোটরসাইকেলের স্টার্টারে পা দিয়ে ধাক্কা মারছে বারবার, সাঁই করে বেরিয়ে গেল রানা আলফা

নিয়ে। বাঁক নিয়ে ছুটে চলল গাড়ি পশ্চিম দিকে।

চারটে পঞ্চাশ মিনিটে হানা দিল ওরা হোটেল দু সার্ফে।

শহর থেকে এক মাইল দূরে ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার। ওখান থেকে একটা পুলিস কার তুলে নিল ক্লুড র‍্যাবোকে। ঘ্যাচ করে থামল গাড়িটা হোটেলের সামনে। লাফ দিয়ে নিচে নামল চার্লস ক্যারন এবং ছয়জন সার্জেন্ট। সাতজন সাতটা MAT 49 সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে এগোল ওরা, প্রত্যেকের তর্জনী ট্রিগার ছুঁয়ে আছে। ক্লুড র‍্যাঁবো ওদের পিছু পিছু এগোচ্ছেন। খুবই চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাঁকে। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত পিছনে চুরুটের ধোঁয়া রেখে যাচ্ছেন তিনি। শহরের সবাই জানে কোথাও কোন মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে, কিন্তু কিছুই এখনও জানা নেই হোটেল মালিকের। শুধু একটা বিদঘুটে ব্যাপার লক্ষ করে বিস্ময়বোধ করছে সে। গত পাঁচ ঘণ্টায় একজন নতুন বোর্ডারও ওঠেনি তার হোটেলে, এবং রোজ তাজা মাছ নিয়ে আসে যে লোকটা, তারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না আজ।

ডেস্ক ক্লার্ক ডেকে নিয়ে এল মালিককে। সাতটা সাব-মেশিনগান দেখে বাক্‌শক্তি লোপ পেল তার। ডেস্ক ক্লার্ককে প্রশ্ন করে ক্লুড র‍্যাঁবো অবগত হলেন—না, হোটেল মালিক বোবা নন। কিন্তু তাকে কথা বলাবার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে দেখে ক্লুড র‍্যাঁবো তার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসালেন, এবং দুই আউন্স ব্র্যান্ডি খেতে দিলেন।

এরপর চার্লস ক্যারন লোকটাকে জেরা করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বোল ফিরে পেল লোকটা। খুব দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করায় বেশির ভাগ শব্দই জড়িয়ে যাচ্ছে তার। ক্লুড র‍্যাঁবো নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন উত্তরগুলো।

পাঁচ মিনিট পর শুরু হলো হোটেল কর্মীদের জবানবন্দী গ্রহণের কাজ। বাইরে থেকে হোটেলে আরও দুটো পুলিস কার ঢুকল। কয়েক দলে ভাগ হয়ে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী হোটেলটাকে সার্চ করল। ইতোমধ্যে হোটেলটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে ইউনিফর্ম পরা পাঁচশো পুলিস।

হোটেল থেকে বেরিয়ে দূরবর্তী পাহাড়ের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছেন ক্লুড র‍্যাঁবো। তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল চার্লস ক্যারন।

'সত্যিই কি লোকটা চলে গেছে, চীফ?' জানতে চাইল ক্যারন।

'আমি নিঃসন্দেহ।'

'কিন্তু দু'দিনের জন্যে উঠেছিল সে। হোটেল মালিক হাত মেলায়নি তো লোকটার সাথে?'

'না। সে বা তার কর্মচারীরা মিথ্যে কথা বলছে না। আজ সকালের দিকে সিদ্ধান্ত বদলেছে অরগ্যান। চলে গেছে। সিদ্ধান্ত কেন বদলাল? এর উত্তর আমার জানা নেই। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। রহস্যের আঁচ পাচ্ছি। কিন্তু, তার চেয়ে বড় জিজ্ঞাসা, গেলটা কোথায়? সে কি জানে আমরা তার নতুন পরিচয় জানি?'

'তা কিভাবে জানবে! অসম্ভব। কিভাবে? তার চলে যাওয়ার নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে।'

'তাই যেন হয়, বাবা, তাই যেন হয়।'

'এখন তাহলে, চীফ, সূত্র বলতে আমাদের হাতে রয়েছে গাড়ির নাম্বারটা।'

'হ্যাঁ। ভুলটা আমিই করেছি। গাড়িটাকে দেখা মাত্র আটক করার নির্দেশ জারি করা উচিত ছিল। স্কোয়াড কারের অয়্যারলেস ব্যবহার করো। লিয়নসের পুলিস কন্ট্রোল রুমকে জানাও অল-স্টেশন অ্যালার্ট সিগন্যাল পাঠাতে হবে এখুনি। টপ ইমার্জেন্সী। সাদা আলফা রোমিও, ইটালিয়ান, নাম্বার MI—61741, খুব সাবধানে এগোতে হবে, ধারণা করা হচ্ছে গাড়ির চালক সশস্ত্র এবং তার প্রকৃতি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। এর সাথে বিশেষ জরুরী নির্দেশ যাবে, এই অ্যালার্ট সিগন্যাল কোনভাবেই প্রেসকে জানানো চলবে না। মেসেজে একথাও জানাতে হবে, আলফা রোমিওর চালক জানে না···সম্ভবত জানে না যে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে।'

প্রায় ছ'টা বাজে। সাগর ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে ভ্যালেন্স শহরে পৌঁছল আলফা রোমিও। এই শহরের ভিতর দিয়েই গেছে রুট ন্যাশনাল সেভেন। লিয়নস থেকে মার্সেই এবং প্যারিস থেকে কোট ডি' আজুরে যাবার এটাই প্রধান হাইওয়ে। রোন নদীর তীর ধরে তুফান মেলের উন্মাদ বেগে ছুটে চলেছে নীল গাড়ি। দক্ষিণ দিকে প্রসারিত রাস্তাটাকে টপকে ব্রিজ পেরোল রানা। পশ্চিম তীরের আর-এন থারটি-থ্রী ধরে সেন্ট পেরে-র দিকে যাচ্ছে ও।

সন্ধ্যার ঘন কালিমায় ঢাকা পড়ে গেল পিছনের বিশাল উপত্যকা। সেন্ট পেরে ছাড়িয়ে এসেছে রানা। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া ম্যাসিফ সেন্ট্রাল এবং অভার্ন প্রদেশের পাহাড়ী রাস্তা ধরে ছুটছে নীল আলফা। গাড়ির স্পীড বাড়িয়েই চলেছে রানা। এলাকাটা দুর্গম, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, জানে ও। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হবে ওকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে দেরি করে ফেললে।

লে পুই-এর পর রাস্তাটা আরও খাড়া উঠে গেছে। উঁচু পাহাড়ের মাথার উপর ছোট ছোট গ্রাম, নিচে আধুনিক শহর। কোথাও থামল না রানা, স্পীড কমাল না।

ক্যাসিনো শহর মন্ট ডোর-এ পৌঁছে পেট্রল নিল রানা। এর মধ্যে সিগারেট ধরাবার জন্যেও একটা মুহূর্ত নষ্ট করেনি ও।

লা বুরডেলে পৌঁছে আর-এন এইটি-নাইন ধরল রানা। উজেলের দিকে ছুটছে নীল আলফা। করেজ-এর আঞ্চলিক শহর ওটা। ব্যারনেস সিবার দুর্গ ওখানেই।

'আর কিছু নয়,' সুরেতের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কর্নেল প্যাপন তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বিশাল পেটটা ঠেকে আছে টেবিলের কিনারায়, রাগে বেসামাল দেখাচ্ছে তাকে, 'মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো, নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন আপনি। এখন যদি আমাদের প্রেসিডেন্টের কিছু হয়, তার জন্যে এককভাবে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবেন আপনি। কী আশ্চর্য! লোকটাকে একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে আপনি ছেড়ে দিলেন!'

তিন ডিপার্টমেন্টের চীফ গোয়েন্দা চূড়ামণি ক্লড র‍্যাবো গভীর মনোযোগের সাথে কাগজপত্র দেখছেন, যেন মত্ত হাতি কর্নেল প্যাপনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন

নন। আসলে প্যাপনকে গুরুত্ব দেন না তিনি, আচরণের দ্বারা এটাই বোঝাতে চাইছেন। লোকটার মধ্যে যুক্তি এবং বিবেচনা বোধ একেবারেই নেই, একথা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু সে যে সেরা একটা গবেটও বটে, তা তাঁর জানা ছিল না।

ক্লড র‍্যাবোকে মাথা নিচু করে থাকতে দেখে কর্নেল প্যাপন ভাবল লোকটা লজ্জায় মরে যাচ্ছে। কাউকে লজ্জায় ফেলতে পারলে খুবই মজা লাগে তার। ক্লড র‍্যাবোকে কোণঠাসা করতে পেরেছে ভেবে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকাল সে। তারপর মস্ত বপু নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে।

প্রায় সাথে সাথে মুখ তুলে তাকালেন ক্লড র‍্যাবো। লালচে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন একবার। মৃদু হাসি লেগে আছে তাঁর ঠোঁটের কোণে। বললেন, 'মাই ডিয়ার কর্নেল, কেউ যদি বলে আপনি লেখাপড়া জানেন না, তাকে আমি অবিশ্বাস করব। আপনার সামনে যে রিপোর্টটা রয়েছে সেটা দয়া করে পড়ুন একবার। তাহলেই জানতে পারবেন অরগ্যানকে আমি হাতের মুঠোয় পাইনি। আজ বারোটা পনেরো মিনিটে খবরটা পাই আমরা যে গ্যাপ শহরের হোটেল দু সার্ফে অরগ্যান নামে একজন লোক গত সন্ধ্যায় দু'দিনের জন্যে উঠেছে। বারোটা পনেরো মিনিটে, মাইন্ড ইট। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমরা জানলাম এগারোটা পাঁচ মিনিটে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে সে।'

থমথম করছে সবার চেহারা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ক্লড র‍্যাবোর দিকে। কর্নেল প্যাপনও কটমট করে তাকিয়ে আছে।

'আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি,' আবার বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছি আমি। ব্যাপারটাকে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের যেভাবে গ্রহণ করা উচিত তিনি ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারটা যাতে কোনরকম প্রচার না পায় সেদিকে নজর রাখার জন্যে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন তিনি। আমি তাঁকে কথাও দিয়েছি। এর ফলে অরগ্যানকে আটক করার ব্যাপারে অস্বাভাবিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে দেশের সব পুলিসকে অরগ্যান বা তার সাদা আলফা রোমিও গাড়িকে আটক করার ঢালাও নির্দেশ দেয়া সম্ভব ছিল না।'

'আসল কথা ভাগ্য আমাদের সাথে অসহযোগিতা করেছে,' মৃদু কণ্ঠে বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। 'যাই হোক, আমি এখন জানতে চাই অরগ্যানের হদিস পাওয়ার জন্যে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

'বিকেল পাঁচটা পনেরোয় হোটেল দু সার্ফ থেকে অলস্টেশন অ্যালার্ট সিগন্যাল পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছি আমি,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'ধরে নেয়া যায় সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই সমস্ত রোড-পেট্রল ইউনিটে পৌঁছে গেছে সিগন্যালটা। প্রধান শহরগুলোয় ডিউটিরত পুলিসদেরকে জানাবার কাজও শুরু হয়ে গেছে, রাত শেষ হবার আগেই এ-কাজ শেষ হবে। বিপদের ভয় আছে বলে আমার নির্দেশে জানিয়েছি সাদা রঙের ইটালিয়ান আলফা রোমিও গাড়িটা হাইজ্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে চালক, গাড়িটাকে দেখামাত্র রিজিওন্যাল হেড-কোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে হবে। একা কোন পুলিসকে গাড়ির কাছাকাছি যেতে নিষেধ করে দিয়েছি। এই সভা যদি আমার নির্দেশ বদল করতে চায়, অবশ্যই তা করতে পারে, কিন্তু তার ফলে

কোন অঘটন যদি ঘটে তাহলে তার দায়িত্ব এই সভাকেই বহন করতে হবে।'

কেউ মুখ খুলল না।

'আপনার নির্দেশই বহাল থাকুক,' বলল কর্নেল বোল্যান্ড। 'বরং আর একটা নির্দেশ যোগ হওয়া দরকার।'

'বলুন।'

'অরগ্যানকে জীবিত ধরতে হবে। আহত করা যেতে পারে, কিন্তু হত্যা করা যাবে না। অ্যাকশন সার্ভিস অরগ্যানকে তাদের হাতে পেতে চায়। এর সাথে জড়িত রয়েছে মহামান্য প্রেসিডেন্টের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রশ্ন।'

ক্লড র‍্যাঁবো গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে তাকিয়ে আছেন কর্নেল বোল্যান্ডের দিকে। তিনি যেন কর্নেলের মনের কথা পড়তে চেষ্টা করছেন।

সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো মাঝরাতের দিকে। বিশ মিনিট পর থেকে আরম্ভ হলো ষোলোই অক্টোবরের প্রথম প্রহর।

ছয়

কালো আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা! রাত একটা। স্যাঁত করে ছুটে এসে মাঝপথে নিভে গেল একটা উল্কা। অশুভ লক্ষণ—বিশ্বাস করে না, তবু কুসংস্কারটার কথা মনে পড়ে গেল রানার। উজেলে পৌঁছে গেছে আলফা রোমিও। প্লেস দে লা জার-এর রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। চৌরাস্তার কাছাকাছি রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার মুখে একটা কাফে খোলা রয়েছে দেখে গাড়ি থামাল ও। ট্রেনের জন্যে অপেক্ষারত নিশাচর কয়েকজন লোক জড়োসড়ো হয়ে বসে গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকল রানা। অধিকাংশ চেয়ার তুলে দেয়া হয়েছে টেবিলের উপর। সেগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল বার কাউন্টারের দিকে।

ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাসের ভিতর দিয়ে ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে এসেছে রানা। শীতে কাঁপুনি ধরে গেছে হাড়ে। উঁচু-নিচু, বাঁক-সর্বস্ব দুর্গম রাস্তাটা গাড়ির ভিতর সারাক্ষণ ঝাঁকি দিয়েছে ওকে, ইচ্ছামত থেঁতলেছে। উরু, কোমর, হাত আর গর্দানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে ও। আর খিদেও পেয়েছে বটে। মাখনের পোঁচ দেয়া এক রোল রুটি ছাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টায় পেটে পড়েনি কিছু আর।

বড় সাইজের দুটো মাখনের টুকরো, লম্বা একটা পাউরুটি আর চারটে সেদ্ধ ডিম চাইল রানা। হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু কাজটা শেষ না করা পর্যন্ত ও জিনিস ছোঁবে না স্থির করায় ইচ্ছাটাকে গলা টিপে মারল। বদলে মগ ভর্তি সাদা কফি চাইল ও।

'স্থানীয় টেলিফোন ডাইরেক্টরী আছে নাকি?'

কাজে ব্যস্ত বারম্যান রানার দিকে না তাকিয়ে বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাউন্টারের পিছন দিকটা দেখাল। 'হেলপ ইওরসেলফ।'

দুর্গই। নিঃসন্দেহ হলো রানা। ফোন গাইডে ব্যারনেস সিবার পরিচয় ছাপা

হয়েছে একজন ব্যারনের স্ত্রী হিসেবে। কয়েকটা ফোন রয়েছে দুর্গ-প্রাসাদে। এলাকার নামটা জানা ছিল রানার, এখন গ্রামটার নাম জানা হলো। ঈগলটন ছাড়িয়ে যেতে হবে ওকে। আর এন এইটি-নাইন ধরে উজেল থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে ঈগলটন। তারও পরে ব্যারনেস সিবার দুর্গ-প্রাসাদ।

একটা পা ঝুলিয়ে বসল রানা। গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

রাত দুটোয় রাস্তার ধারে একটা খাড়া পাথর দেখল রানা, তাতে লেখা রয়েছে: ঈগলটন—৬ কিলোমিটার। আরও খানিক এগিয়ে রাস্তার পাশের বনভূমিতে গাড়িটাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল ও। কিন্তু ঘন জঙ্গল, গাড়ি ঢোকার মত চওড়া ফাঁক কোথাও দেখছে না। অস্বস্তি এবং অস্থিরতা বাড়ছে ওর মধ্যে। ছয়শো মিটার এগিয়ে এল আরও। একটা ফাঁক দেখা গেল বটে, কিন্তু কাঠের লম্বা একটা পোল দিয়ে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে পথটা। পোলের সাথে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডও ঝুলছে। তাতে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা রয়েছে: এটা ব্যক্তি মালিকানাধীন এলাকা।

গাড়ি দাঁড় করাল রানা। পোলটা সরাল। তারপর জঙ্গলের ভিতর কিছুদূর এগিয়ে গাড়ি থামিয়ে ফিরে এসে আবার পথটা আটকে দিল পোল দিয়ে। গাড়িতে উঠে রওনা হলো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

জঙ্গলের আধ মাইল ভিতরে ঢুকল নীল আলফা রোমিও। দুই হেড লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভূতের মত নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের ছায়াগুলো। গাড়ি দাঁড় করিয়ে আলো নিভিয়ে দিল রানা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে তার কাটার যন্ত্র আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল রানা। আশপাশে কোন বাড়ি বা বনরক্ষীদের আস্তানা আছে কিনা জানা নেই ওর। যদি থাকে, নিশ্চয়ই কারও না কারও কানে গেছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। বনভূমি নিথর। কোথাও কোন শব্দ নেই। হঠাৎ অদ্ভুত সব চিন্তার উদয় হলো রানার মাথায়। গহীন রাত এখন। দেশ থেকে কত শত মাইল দূরে রয়েছে ও। অজানা জঙ্গলে। সে একা। একজন মানুষ খুন করা তার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের পিছনে কাজ করছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ। ঘন অন্ধকার ঘিরে রেখেছে তাকে। পিছনে ফ্রান্সের গোটা প্রশাসন যন্ত্র আর ইউনিয়ন কর্স ডালকুত্তার মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে ছুটে আসছে দ্রুতবেগে, লালাসিক্ত জিভ বেরিয়ে পড়েছে তাদের। দেখামাত্র ধারাল দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে ওকে। শিউরে উঠল রানা। এবং ঠিক তখুনি সংবিৎ ফিরে পেল ও। হচ্ছেটা কি! নিজেকে তীব্র তিরস্কার করল ও। কাজের সময় আবোল তাবোল চিন্তা কেন!

গাড়ির তলায় ঢুকল রানা। শিশির ভেজা ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে দেড় ঘণ্টা একনাগাড়ে কাজ করল ও। ষাট ঘণ্টা পর রাইফেলের বিচ্ছিন্ন অংশ ভর্তি স্টীল টিউবগুলো লুকানো জায়গা থেকে অবশেষে বেরোল এক এক করে।

সুটকেসে আবার প্যাক করল টিউবগুলো রানা। এই সুটকেসেই রয়েছে সেকেন্ডহ্যান্ড নোংরা কাপড়-চোপড় আর মিলিটারি গ্রেটকোটটা। ভিতর এবং বাইরে থেকে গাড়িটাকে সার্চ করল রানা। না, এমন কিছু ফেলে যাচ্ছে না ও যা ওর পরিচয় সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দেবে। বুনো রডোডেনড্রনের মস্ত ঝোপের

মাঝখানে গাড়িটাকে ঢোকাল ও। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি সেখানে চাকার গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তা ঢাকার জন্যে আশপাশ থেকে ঝরা পাতা কুড়িয়ে এনে ফেলল ও।

টাই খুলে দুটো সুটকেসের হাতল বাঁধল দুই প্রান্ত দিয়ে, তারপর টাইটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। একটা সুটকেস ওর বুকের উপর, অপরটা পিঠে ঝুলছে। বাকি দুটো দু'হাতে নিয়ে রওনা হলো ও রাস্তার দিকে।

পঁচিশ পঞ্চাশ গজ পর পরই থামতে হচ্ছে রানাকে। হাত এবং কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে ফিরে যাচ্ছে পিছন দিকে। ঘাসের উপর গাড়ির চাকার দাগ ঢেকে দিচ্ছে শুকনো ঝরা পাতা দিয়ে। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা লাগল কাজটা সারতে। শুকনো ঝরা পাতা পড়ে অধিকাংশ ঘাস ঢাকা পড়ে আছে, তাই চাকার দাগ সে-সব জায়গায় স্পষ্ট হয়ে পড়েনি, তা নাহলে দাগ ঢাকতে আরও অনেক বেশি সময় লাগত।

মাথা নিচু করে কাঠের পোলটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তায় উঠে আধ মাইল এগিয়ে থামল ও।

কাদা-মাটি লেগে চেক স্যুটটার চেহারা বিগড়ে গেছে। শিশির আর ঘামে ভিজে পোলো সোয়েটারটা সেঁটে আছে পিঠের সাথে। শরীরের সমস্ত পেশী টনটন করছে ব্যথায়। রাস্তার ধারে একটার উপর একটা সুটকেস রেখে তার উপর বসল রানা। পুব আকাশে ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে। দিনের আলো আরও পরিষ্কার না হলে বাস চলাচল শুরু হবে না।

সাড়ে পাঁচটার দিকে খড় বোঝাই একটা ট্রাক দেখা গেল রাস্তায়। স্পীড কমিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে গলা বাড়াল ড্রাইভার, জানতে চাইল, 'গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে বুঝি?'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'না। ক্যাম্প থেকে সাপ্তাহিক ছুটির পাস পেয়ে বোকার মত বেরিয়ে পড়েছি। লিফট নিয়ে গত রাতে উজেল পৌঁছে ঠিক করেছিলাম তুল-এ আঙ্কেলের কাছে একবার ঢুঁ মেরে যাই।' বোকার মত হাসল আবার রানা। 'পা চালিয়ে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। যাব আরও অনেক দূর...'

'এ আপনার স্রেফ পাগলামি, মশিয়ে। সন্ধ্যার পর এদিকে একা কেউ আসে না। পিছনে উঠে পড়ুন। ঈগলটন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারব। ওখান থেকে আর কোন গাড়ি ধরে...'

ছোট্ট শহরটায় সকাল সাতটায় পৌঁছল ট্রাক। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ আর একমুখ সরল হাসি উপহার দিয়ে স্টেশনে ঢুকল রানা, ঘুরপথে আবার বেরিয়ে এল প্রধান সড়কে। ইতোমধ্যে ট্রাক নিয়ে নিজের পথে চলে গেছে ড্রাইভার।

একটা কাফেতে ঢুকল রানা। বারম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'এ শহরে ট্যাক্সি পাবার উপায় কি বলুন তো?'

বারম্যান ওকে একটা ট্যাক্সি কোম্পানীর ফোন নাম্বার দিল। যোগাযোগ করল রানা। ওকে জানানো হলো আধঘণ্টা পর পৌঁছে যাবে একটা ট্যাক্সি। টয়লেটে ঢুকে ঠাণ্ডা পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিল ও, দাঁত ব্রাশ করল, নতুন স্যুট পরল।

ইঁদুর ধরার খাঁচার মত একটা রেনোয়া ট্যাক্সি কাফের সামনে এসে দাঁড়াল সাড়ে সাতটায়। 'হাউতে শেলনেয়ার গ্রামটা কোথায় জানা আছে তোমার?'

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রানা।
'হুঁ-উ।'
'কদ্দূর?'
'আঠারো কিলোমিটার,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে পাহাড়ের দিকটা দেখাল ড্রাইভার। 'ওদিকের পাহাড়ে।'
'নিয়ে চলো আমাকে,' বলল রানা। তিনটে সুটকেস ট্যাক্সির ছাদের র্যাকে তুলে দিল ও। একটা সুটকেস নিয়ে ঢুকল ভিতরে।
গ্রামের চৌরাস্তায় কাফে দে লা পোস্টের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। ছোট্ট শহরটায় পিছিয়ে পড়া এলাকার পরিচিত ছাপ ফুটে আছে। রাস্তাটা মেরামত হয়নি, দাঁত বের করে আছে ইঁটগুলো, এখানে সেখানে খানখন্দ ভর্তি। শহরের বাউন্ডারি ওয়ালটা ধসে পড়েছে কোন কালে। দুটো গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপর। চার চাকার কোন যানবাহন দেখছে না রানা।
সুটকেসগুলো নিয়ে কাফেতে ঢুকল রানা। বেশ ক'জন লোক বসে আছে। কারও দিকে না তাকিয়েও বুঝল রানা, তাকে ঢুকতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে সবাই।
কালো ব্লাউজ আর হলুদ গাউন পরা মোটাসোটা এক মেয়েলোক বসে আছে কাউন্টারে। 'মশিয়ে?' রাজ্যের প্রশ্ন চোখে নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।
সুটকেসগুলো নামিয়ে রাখল রানা। আশপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল গেঁয়ো টাইপের লোকগুলো বেঢপ সাইজের নোংরা পোশাক পরে লাল মদ পান করছে। মুচকি হেসে ডান হাতের দুটো আঙুল খাড়া করল রানা। 'দুটো বোতল দাও,' বলল ও। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'দুর্গটা এখান থেকে কদ্দূর?'
'দুই কিলোমিটার, মশিয়ে।'
'অথচ ড্রাইভার আমাকে বলল এদিকে নাকি কোন দুর্গ নেই। ব্যাটা আমাকে চৌরাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।'
'ঈগলটনের লোক বুঝি?' রানাকে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে দেখে মেয়েলোকটার চেহারায় তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। 'ও! হারামির হাড় ওরা। ধাপ্পাবাজ।' এইটুকু বলেই চুপ মেরে গেল সে।
'দুর্গ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর যাব আমি,' একটু গলা চড়িয়ে বলল রানা কাফের সবাই যাতে শুনতে পায়। 'ওখানে এক জায়গায় আমার জন্যে অপেক্ষা করার কথা একটা গাড়ির। কিন্তু এই দুই কিলোমিটার যাব কিভাবে? কোন গাড়ির ব্যবস্থা করা যায়?'
চাষাভুষো লোকগুলো একচুল নড়ল না বা সাড়া দিল না।
কড়কড়ে একশো ফ্র্যাঙ্কের তিনটে নোট বের করল রানা। জানতে চাইল ও, 'ওয়াইনের দাম কত, মাদাম?'
চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল মেয়েলোকটার। নোটগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল, 'ভাঙতি নেই আমার কাছে।'
পিছনে শব্দ পাচ্ছে রানা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে কেউ। পাঁচ সেকেন্ড পর পাশে একজনেব অস্তিত্ব অনুভব করল ও।

'একটা গাড়ি দরকার আমার,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা।

'একটা নোট আর একটা বোতলের বিনিময়ে?' পাশ থেকে জানতে চাইল লোকটা।

এতক্ষণে সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল রানা। এদিক ওদিক মাথা নাড়াল ও। বলল, 'না। একটা নোট আর দুটো বোতলের বিনিময়ে।'

ঝট্ করে নিজের পিছন দিকে তাকাল আধবুড়ো গেঁয়ো লোকটা। হাঁক ছেড়ে বলল, 'অ্যাই বেনোইদ, শুনছিস না? যা জলদি, ভ্যানটা নিয়ে আয়, পৌঁছে দে মশিয়েকে।'

চেয়ার সরাবার আওয়াজ পেল রানা। তারপর দ্রুত পায়ের শব্দ—বেরিয়ে গেল কেউ কাফে থেকে।

ভ্যানে বসে পাহাড়ে চড়ার সময় ভাবছে রানা। কাফের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, দুর্গ ছাড়িয়ে অনেক দূর যাবে ও, কিন্তু ভ্যানের ড্রাইভার বেনোইদ তো দেখবে কোথায় সে নামছে। এ ব্যাটা গিয়ে গল্প করবে সবার কাছে। আইনের বা ইউনিয়ন কর্সের লোক যদি গন্ধ শুঁকে ঈগলটন পর্যন্ত চলে আসে, জিজ্ঞেস করা মাত্র গল্পটা সে কেউ শুনিয়ে দেবে তাদেরকে। সে-রাস্তা বন্ধ করা যায় কিভাবে? ভাবছে রানা।

সেই সুপুরুষকে স্বপ্নে দেখে খোশ মেজাজে ঘুম ভাঙল ব্যারনেস সিবার। স্বপ্নের আমেজ তখনও কাটেনি, তাই সকালের পাখ পাখালির কলকাকলি, তাজা ঠাণ্ডা বাতাস, বেড-টি—সবই বড় ভাল লাগল তার। ঠোঁটে আশ্চর্য একটা মধুর হাসির রেখা ফুটে উঠল। জীবনটাকে বড় ভাল লাগছে। বেঁচে থাকার মধ্যে কি যে অসীম আনন্দ, তা যেন আজ বিশেষ ভাবে অনুভব করছে তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই হঠাৎ সেই বলিষ্ঠ সুপুরুষের কথা মনে পড়ে গেল। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতরটা। একটা হাহাকার জেগে উঠল মনের মধ্যে। নেই! এক রাতের জন্যে তার জীবনে এসেছিল সেই পরদেশী, তারপর আবার হারিয়ে গেছে! আর কি কখনও দেখা হবে তার সাথে? কোথায় সে? মাথা খুঁড়ছে একটা উত্তরহীন প্রশ্ন। রাগ হচ্ছে এখন নিজের ওপরে—কেন খামখেয়ালের বশে খেইটা হারিয়ে বসল সে? সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। দেখা হলো, প্রেম হলো, তারপর হারিয়ে গেল দু'জন দু'জনের কাছ থেকে। তার ঠিকানা জানা হয়নি, পরিচয় জানা হয়নি—ইচ্ছা করেই জানতে চায়নি সে। আসলে ভয় পেয়েছিল। জানত, নাম ঠিকানা জানা থাকলে নিজেকে সামলাতে পারবে না সে, একদিন সেখানে তার কাছে গিয়ে হাজির হবে। অথচ তা উচিত হবে না। সে বিবাহিতা, একজনের স্ত্রী। তাছাড়া, প্রথাসিদ্ধ নয় এমন কোন আচরণ করলে লোকটাকেও হয়তো বিড়ম্বনায় ফেলা হবে। এইসব কথা ভেবে তখন মনে হয়েছিল দরকার নেই পরিচয় জেনে। হঠাৎ এসেছে, হঠাৎ-ই আবার হারিয়ে যাক অজানা জগতে।

কিন্তু তখনকার বোকামির কথা ভেবে এখন তার মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করছে দেয়ালে। তখন বোঝেনি, ঘুমে এবং জাগরণে এমন ভয়ঙ্করভাবে উতলা করবে তার স্মৃতি।

সবকিছু তিক্ত লাগতে শুরু করে ব্যারনেস সিবার। এই বিশাল দুর্গে কয়েকজন চাকর চাকরানী ছাড়া সে একা। লোকালয় এখান থেকে অনেক দূরে। কেউ এখানে আসে না, কোথাও তার যাবার জায়গা নেই। এখানে সে বন্দিনীর জীবন কাটাচ্ছে। এই বন্ধন ছিঁড়ে বেরোবার সাধ্য তার নেই। এতদিন সে-ইচ্ছাও কোনদিন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। কিন্তু দুর্গে ফেরার পথে সেই যে লোকটাকে দেখল, একটা রাত কাটাল তার সাথে, তারপর থেকে কেমন যে ওলোটপালট হয়ে গেল সব। এখন মনে হচ্ছে, সবই সে মেনে নেবে, যদি সেই পরদেশীকে কাছে বসিয়ে দু'চোখ ভরে দেখার অধিকার পায় সে। বছরে দু'বছরে একবারও যদি সে আসে, তাহলেও সুখী হয় সে, সার্থক হয় তার এই বন্দিনী জীবন। নিজেকে ধিক্কার দেয় ব্যারনেস সিবা—তুই নিজেই তো সে-রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিস। দেখা না হওয়াই উচিত, কেন তুই সে-কথা বলতে গেলি তাকে!

নিচে থেকে গাড়ির শব্দ ভেসে এল। মেজাজটা আরও তিক্ত হয়ে ওঠে ব্যারনেস সিবার। নিশ্চয়ই ব্যারনের কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় সাহায্যের প্রার্থনা নিয়ে এসেছে। মন ভাল নেই তার, সুতরাং যেই এসে থাকুক, কপালে আজ তার খারাবি আছে। ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে নামল ব্যারনেস সিবা। ড্রেসিং রুমে ঢুকে মাথায় চিরুনি বুলিয়ে ফিরে এল বেডরুমে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কে এল দেখার জন্যে তাকাল নিচের দিকে। কে!

রানাকে ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল ব্যারনেস সিবা। 'প্রিয় জানোয়ার! সুন্দর, আদিম, প্রিয় জানোয়ার! পিছু নিয়ে চলে এসেছ তুমি!' বিড় বিড় করছে ব্যারনেস সিবা। অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে গেল তার শরীরে।

ভ্যানের পিছন থেকে কয়েকটা সুটকেস বের করছে ড্রাইভার। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। এটুকু দেখেই দ্রুত জানালার কাছ থেকে সরে এল ব্যারনেস সিবা। ছুটে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে পোশাক পাল্টাবার জন্যে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে গিয়ে দাঁড়াল। নিচের হলঘর থেকে সেই পরিচিত ভরাট পুরুষকণ্ঠ ভেসে আসছে। মেড-সারভেন্ট নেস্তাইন নবাগতকে প্রশ্ন করছে, 'মশিয়ে কাকে চান?'

এক মুহূর্ত পর ব্যারনেস সিবা দেখল মেয়েটা দুপ্ দাপ্ ধাপ বেয়ে উঠে আসছে উপরে। তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। চাপা কণ্ঠে বলল, 'একজন ভদ্রলোক। বিদেশী, ইংরেজ বলে মনে হলো—আপনাকে চায়।'

স্বরাষ্ট্র দফতরের কনফারেন্স রুমে সেদিন রাতের মীটিংটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ক্লড র‍্যাবো তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু কণ্ঠে জানালেন, 'রিপোর্ট করার মত কিছুই নেই আমার হাতে।' অর্থাৎ কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি।

রুটিন মাফিক সাদা ইটালিয়ান আলফা রোমিওর বর্ণনা গোটা ফ্রান্সের সর্বত্র পাঠানোর কাজ শেষ হয়েছে, এতে সময় লেগেছে চব্বিশ ঘণ্টা। রেখে-ঢেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাঠানো হয়েছে মেসেজ, যাতে কারও মনে কোনরকম অবাঞ্ছিত সন্দেহের উদ্রেক না হয়। একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে প্রতিটি

রিজিওন্যাল হেডকোয়ার্টারকে নির্দেশ দানের ব্যাপারে। প্রতিটি হেডকোয়ার্টার তাদের অধীনস্থ পুলিস স্টেশনকে নির্দেশ দিয়েছে যার যার এলাকার সমস্ত হোটেল রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করে সকাল আটটার মধ্যে জমা দিতে হবে। ইতোমধ্যেই ত্রিশ হাজার কার্ড পৌঁচেছে বিভিন্ন রিজিওন্যাল হেডকোয়ার্টারে। অরগ্যানের নাম খোঁজা হচ্ছে কার্ডগুলোয়। এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ক্লড র‍্যাবোর ধারণা, গতরাতে অরগ্যান কোন হোটেলে ওঠেনি। তবে নিশ্চিত করে বলা যায় না, অন্য কোন নামে উঠতে পারে।

'হোটেল দু সার্ফ হঠাৎ সে ত্যাগ করল কেন? এটা খুব রহস্যময় ব্যাপার।' চুরুট ধরালেন ক্লড র‍্যাবো, তারপর আবার বললেন, 'ব্যাপারটা যদি কাকতালীর হয়ে থাকে তাহলে এখনও আলফা রোমিওর গাড়িটাই ব্যবহার করার কথা তার। অরগ্যান নামেই হোটেলে উঠতেও কোন বাধা নেই তার। সেক্ষেত্রে অচিরেই তার সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু, হোটেল দু সার্ফ ত্যাগ করার পিছনে যদি অন্য কোন কারণ থাকে...'

'অন্য কোন কারণ?' বিশাল বপু কর্নেল প্যাপন বাধা দিল ক্লড র‍্যাবোকে। 'অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে, শুনি?'

'আমরা তার বর্তমান পরিচয় জানি এ খবর যদি সে পেয়ে থাকে...'

'কিভাবে পাবে?' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে আবার জানতে চাইল কর্নেল প্যাপন।

'কিভাবে পাবে তা যদি জানতাম,' শান্ত ভঙ্গিতে বললেন ক্লড র‍্যাবো, 'তাহলে তো সব সমস্যার ফয়সালা এতক্ষণে হয়েই যেত। আমি ফ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি সম্ভাবনা নিয়ে।'

মাঝখান থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, 'আপনি বলে যান, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো।'

'অরগ্যানকে কেউ যদি সতর্ক করে দিয়ে থাকে,' আবার শুরু করলেন ক্লড র‍্যাবো, 'তাহলে গাড়িটাকে নিশ্চয়ই সে ত্যাগ করেছে। এখন তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। এক, হয় সে হোটেলে লুকাবার চেষ্টা করবে, নয়তো সীমান্ত পেরিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইবে ফ্রান্স থেকে। দুই,...অথবা তার কাছে আরেক সেট ভুয়া পরিচয়পত্র ইত্যাদি আছে। এখন সে সেই পরিচয়পত্র কজে লাগাবে। অর্থাৎ আবার সে চেহারা পরিচয় ইত্যাদি বদল করবে বা ইতিমধ্যেই করেছে। সেক্ষেত্রে, এখনও সে মহামান্য প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্যে ভয়ঙ্কর একটা হুমকি।'

'তার কাছে আরও এক সেট পরিচয়পত্র আছে একথা আপনি ভাবছেন কেন?' জানতে চাইল অ্যাকশন সার্ভিসের চীফ কর্নেল বোল্যান্ড।

ক্লড র‍্যাবোর মুখে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল একরাশ হাসি। অ্যাশট্রেতে চুরুটের ছাই ঝেড়ে তিনি বললেন, 'লোকটাকে আপনারা খুব ছোট করে দেখছেন। কিন্তু, ভাবুন একবার, মহামান্য প্রেসিডেন্টকে খুন করতে চাইছে যে-লোক তার অভিজ্ঞতার ঝুলি কতটা ভারী হতে পারে। কড়া নিরাপত্তাধীন ব্যক্তিদেরকে খুন করার অনেক অভিজ্ঞতা এ লোকের না থেকেই পারে না। আমার তো বদ্ধমূল বিশ্বাস, এ ব্যাপারে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ একজন বিশেষজ্ঞ সে। অথচ পৃথিবীর কোন দেশের কোন পুলিসের খাতায় তার নাম নেই। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, তাই নয় কি? কিভাবে, আমি জানতে চাই, কিভাবে সে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনেকগুলো

হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েও পুলিসের নজরকে এড়িয়ে থাকতে পারল?'

সবাই চুপ।

'এটা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র উপায়ে,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'তা হলো, প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে সে মিথ্যে নাম এবং নকল চেহারা ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ ছদ্মবেশ গ্রহণেও পাক্কা ওস্তাদ লোক সে।' একটু বিরতি নিলেন ক্লড র‍্যাবো। এখন আর তাঁর মুখে হাসি নেই। বললেন, 'তার আসল পরিচয় আমরা এখনও কেউ জানি না। সে সান্তিনো ভ্যালেন্টি নয়। সে অরগ্যানও নয়। দু'বার চেহারা আর পরিচয় বদল করেছে এই লোক। হয়তো আবার সে তাই করেছে। করেনি—একথা ভাবলে বোকামি করব আমরা।'

'কিন্তু কেউ তাকে সতর্ক করে দিয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই,' কর্নেল প্যাপন বলল, 'আমার বিশ্বাস পাহাড়ে, জঙ্গলে অথবা কোন বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটিয়েছে সে। অরগ্যান নামেই আবার কোন হোটেলে উঠবে। ব্যস, তখনই মুঠোয় পেয়ে যাব আমরা। মশিয়ে তাকে যতবড় হুমকি বলে মনে করছেন আসলে সে তা নয়। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই।'

গম্ভীর দেখাল ক্লড র‍্যাবোকে। 'সত্যি কথা বলতে কি, এই বিশেষ লোকটাকে আমি সাংঘাতিক ভয় করছি,' থেমে থেমে কথা বলছেন তিনি। 'একে যতক্ষণ না জেলখানায় ভরতে পারছি, ততক্ষণ শান্তি পাব না আমি। লোকটার বুদ্ধি আর কৌশলের যে-টুকু নমুনা পেয়েছি, এক কথায় অতুলনীয়। তার সাহসের নমুনা যে-কোন বীরকেও লজ্জা দেবে। এখনও তার নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমি পাইনি, তবে অনুমান করতে পারি সেটাও বিশ্বের অনেক রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ, স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই আমার, এই লোকটাকে আমি ভয় করি।'

হো হো করে হেসে উঠল কর্নেল প্যাপন। বলল, 'সত্যিই যদি বুদ্ধি বলে কিছু থাকে তার মগজে, বেঁচে থাকতে থাকতে ফ্রান্স ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে সে।'

এরপরই সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো মীটিংয়ের।

'বাস্তব অবস্থাটা কি?' নিজের অফিসে ফিরে এসে একান্ত সচিব চার্লস ক্যারনের সাথে কথা বলছেন ক্লড র‍্যাবো। 'সে বেঁচে আছে। স্বাধীনভাবে। তার কাছে অস্ত্র আছে। এই মুহূর্তে সে কোথায়? আমরা জানি না। তার বর্তমান পরিচয় কি। অরগ্যান? না, অন্য কিছু? জানি না। শুধু জানি, মহামান্য প্রেসিডেন্টকে খুন করতে চায়। কবে? কখন? কোথায়? জানি না, জানি না, জানি না। এই কি সর্বশেষ পরিস্থিতি নয়, মাই ডিয়ার বয়?'

অনুগত শিষ্যের মত সবিনয়ে মাথা কাত করল চার্লস ক্যারন, 'ইয়েস, চীফ, সর্বশেষ পরিস্থিতি ঠিক তাই।'

'সেক্ষেত্রে,' ক্লড র‍্যাবো নতুন একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে লালচে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করলেন, 'বৎস চার্লস, নতুন করে তার খোঁজ শুরু করতে হবে আমাদেরকে। প্রথম কাজ তার গাড়িটাকে খুঁজে বের করা। তিনটে সুটকেস আছে তার সাথে, এগুলো নিয়ে পায়ে হেঁটে খুব বেশি দূর যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। হয় সে গাড়িতেই আছে, নয়তো গাড়িটা ফেলে দিয়ে অন্য কোন উপায়ে কোথাও যাচ্ছে। গাড়িটাকে খুঁজে পাওয়াই এখন সবচেয়ে জরুরী। ওটা

যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকে শুরু হবে আমাদের পরবর্তী কাজ।'

ফ্রান্স যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সে এখন করেজের মধ্যিখানে বিশাল দুর্গের ভিতর মখমলের বিছানায় শুয়ে পরম শান্তিতে বিশ্রামরত। শাওয়ার সেরে শরীরটাকে তাজা ঝরঝরে করে নিয়েছে রানা। ব্রেকফাস্টের ঢালাও রাজকীয় অর্ডার দিয়েছিল ব্যারনেস সিবা, দু'ঘণ্টার মধ্যে দু'জনের জন্যে মুরগীর সূপ, মাখনের পোঁচ দেয়া রুটি, হাফ-বয়েল ডিম, পনির, জেলি, ঘরে তৈরি কেক, কালো কফি, লাল মদ আর শত বছরের পুরানো ব্র্যান্ডি পরিবেশন করেছে দুর্গের পরিচারিকারা। ভরপেট খেয়ে আলস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে রানা। ব্যারনেস সিবা ওকে এক প্যাকেট দামী হাভানা চুরুট দিয়ে গেছে, সেটার একটা ধরিয়ে বিছানায় গড়াচ্ছে ও, অদূর ভবিষ্যতে কি করতে হবে সে-ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে। এক হপ্তার মধ্যেই আবার রওনা হতে হবে তাকে। কিন্তু এখান থেকে বেরোতে পারা বেশ কঠিন হয়ে দেখা দিতে পারে। ভেবে চিন্তে একটা উপায় ঠিক করে রাখতে হবে।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। নিজের সুসজ্জিত বেডরুমে প্রবেশ করল ব্যারনেস সিবা। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা···দুই কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢোলা একটা সিল্কের ফ্রক পরেছে সে, গলার কাছে জোড়া লেগে আছে, কিন্তু সামনেটা খোলা। তার হাঁটার সাথে সাথে শরীরে যৌবনের উথাল পাথাল ঢেউ জাগে, পলকের জন্যে সরে যায় পোশাকের সামনের ফাটলটা। ঢোলা পোশাকের নিচে আর কোন জামা নেই, তবে বাথরুম থেকে যে মোজাটা আর হাইহিল কোর্ট শু পরে বেরিয়ে ছিল সেটা এখনও খোলেনি। একটা হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা বালিশ থেকে তুলল রানা, ওর দিকে পিছন ফিরে ঘরের দরজায় খিল লাগাচ্ছে ব্যারনেস সিবা, লোভাতুর দৃষ্টিতে তাই দেখছে ও। ঘুরে দাঁড়াল সিবা। এগিয়ে আসছে। ঠোঁটে এসে জমা হচ্ছে অদ্ভুত একটা চাপা হাসি।

নিঃশব্দে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল সিবা। নিচের দিকে, রানার চোখে তাকিয়ে আছে। দুটো হাত ধীরে ধীরে উঠে গেল তার গলার কাছে। রিবনের বো-টা পোশাকটাকে আটকে রেখেছে ওখানে। বো খুলে দিতেই উন্নত ভরাট বুক উন্মুক্ত হলো। হাত বাড়িয়ে সিবার কোমরের কাছে পোশাকটা খামচে ধরে মৃদু টান দিল রানা, নিঃশব্দে সিবার কাঁধ থেকে মেঝেতে খসে পড়ল সেটা।

ঝুঁকে পড়ে রানার কাঁধে চাপ দিল সিবা, বিছানায় শুয়ে পড়ল আবার রানা। রানার দুই হাতের কব্জি ধরে বালিশের সাথে চেপে ধরল সিবা, উঠে এল বিছানায়। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

'প্রিয় জানোয়ার! সুন্দর, আদিম, জানোয়ার!' ফিসফিস করে বলল সে রানার কানে কানে। 'পাগল করে দিয়েছ তুমি আমাকে!'

এক দুই করে তিনটে দিন কেটে গেল, অরগ্যানের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাচ্ছেন না ক্লড র‍্যাবো। রাতের মীটিংগুলোয় ক্রমশ এই মতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে পায়ের মাঝখানে লেজ লুকিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অরগ্যান ফ্রান্স ত্যাগ করেছে সংগোপনে। উনিশ

তারিখ রাতের মীটিংয়ে ক্লড র‍্যাবোর বক্তব্য সমর্থন করার মত একজন লোককেও পাওয়া গেল না। এখনও তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, অরগ্যান ফ্রান্সের ভিতরই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। অপেক্ষা করছে সে। সময় হয়েছে বলে মনে করলেই আবার সে গর্ত ছেড়ে বেরোবে।

'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে?' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল বিশাল বপু কর্নেল প্যাপন। 'যদি বলেন বর্ডার টপকাবার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছে তাহলে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করব না। কিন্তু যদি বলেন...'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে কর্নেল প্যাপনকে থামতে নির্দেশ দিলেন ক্লড র‍্যাবো। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। ঘুম হয়নি কতদিন! উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় চেহারার লাবণ্য উবে গেছে। তিনি জানেন, তাঁর মতামত যদি মিথ্যে, মূল্যহীন প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ক্যারিয়ার খতম হয়ে যাবে। যাতে খতম হয় তার সম্ভাব্য সমস্ত আয়োজন এই মীটিংয়ে উপস্থিত উচ্চপদস্থ আমলারা সম্পন্ন করতে কসুর করবে না। কিন্তু এর চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হবু খুনীটাকে নিয়ে। মহামান্য প্রেসিডেন্ট নিরাপদ, তাঁর বিপদ কেটে গেছে—একথা তিনি মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর ধারণা অরগ্যান প্রেসিডেন্টের পিছু ছাড়েনি। জাল ছিন্ন করে যদি সে ভিতরে ঢুকে পড়ে, প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি পৌঁছে যায়? তিনি জানেন, তেমন কিছু যদি ঘটে, টেবিল ঘিরে বসে থাকা এই হামবাগগুলো সব দোষ একজনের ঘাড়ে চাপাবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। সেই একজন হবেন তিনি। দু'দিক থেকেই গোয়েন্দা হিসেবে তাঁর কর্ম জীবনের সর্বনাশ ঘটে যাবে—যদি তিনি লোকটাকে খুঁজে বের করে আটক করতে পারেন, তবেই শেষ রক্ষা সম্ভব।

তাঁর ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপবার পর থেকে আজ আটদিন পেরিয়ে যাচ্ছে, এই ক'দিনে উত্তরোত্তর লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর বেড়েই চলেছে। অদ্ভুত গুণী একটা লোক, ভাবছেন তিনি। কখন কি করতে হবে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আগে থেকেই সমস্ত ঠিকঠাক করে রেখেছে সে।

'কেন অপেক্ষা করছে জানি না,' কাঁপা হাতে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে উত্তর দিলেন ক্লড র‍্যাবো। 'কিন্তু আমার ধারণা—অপেক্ষা করছে সে। হয়তো আগে থেকে একটা দিন ঠিক করে রেখেছে। সেই নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় আছে। অরগ্যান সম্পর্কে সর্বশেষ খবর পেয়েছি আমরা, একথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা আমার অনুভূতি। এর ব্যাখ্যা দিতে পারব না।'

'অনুভূতি!' হো হো করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল কর্নেল প্যাপন। 'মাই গড, মশিয়ে, রোমান্টিক থ্রিলার পড়ে নিজের বারোটা বাজিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। এটা ডিটেকটিভ উপন্যাস নয়, মাই ডিয়ার মশিয়ে, এটা বাস্তব। ব্যাটা ভেগেছে, লেজ গুটিয়ে কেটে পড়েছে, আর আপনি কিনা তারই ভয়ে কুঁকড়ে আছেন।'

হাতের চুরুটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ ক্লড র‍্যাবো। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। ধীরে ধীরে মুখ তুললেন তিনি। সকলের মুখের উপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা সবাই যদি মনে করেন আমার বিশ্বাসটা অমূলক,

এর কোন ভিত্তি নেই, তাহলে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক আমাকে।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে। সবাই তাঁর বক্তব্য শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। খানিক ইতস্তত করার পর মন্ত্রী মহোদয় বললেন, 'মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো, সত্যিই কি আপনি মনে করেন বিপদ এখনও কাটেনি?'

'বিপদ দেখাই দেয়নি এখনও,' মৃদু, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ক্লড র‍্যাবো। হাতে ধরা চুরুটের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'সুতরাং বিপদ কেটে গেছে কিনা এ প্রশ্ন ওঠেই না। আমার বিশ্বাস, স্পষ্টভাবে, প্রমাণসহ কিছু না জানা পর্যন্ত অরগ্যানকে খুঁজে বের করার চেষ্টা পুরোদমে চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

'সেক্ষেত্রে,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা করলেন, 'আমি চাই মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো তাঁর বর্তমান দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। দয়া করে এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে বিদ্রূপ করবেন না।'

বেলা এগারোটায় একজন বনরক্ষী একটা নধর খরগোশকে তাড়া করতে গিয়ে নীল ইটালিয়ান আলফা রোমিওটাকে দেখে ফেলল। খবরটা গ্রামের পুলিস কনস্টেবল পেল দুপুর দু'টোর দিকে। নিজের বাড়ি থেকে উজেল-এর থানা অফিসারকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাল সে।

'গাড়িটা কি সাদা?' থানা অফিসার জানতে চাইল।

'না। নীল।'

থানা অফিসারের সামনে একটা নোট বুক খোলা রয়েছে, সেটার দিকে চোখ রেখে কথা বলছে সে টেলিফোনে। 'গাড়িটা কি ইটালিয়ান?'

'না। ফ্রেঞ্চ রেজিস্টার্ড।'

'ঠিক আছে,' বলল অফিসার, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধারকারী একটা ট্রাক পাঠানো হচ্ছে। তুমি স্পটে হাজির থাকবে। এখান থেকে কোন লোক পাঠানো সম্ভব নয়। সাদা একটা আলফা রোমিওর খোঁজে সবাই বেরিয়ে গেছে সারাদিনের জন্যে।'

'ঠিক আছে, মশিয়ে,' কনস্টেবল জানাল। 'স্পটে থাকব আমি।'

বেলা চারটের সময় নীল আলফাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হলো উজেল-এর সরকারী যানবাহন রক্ষণাগারে। বেলা পাঁচটার সময় আইডেনটিফিকেশনের জন্যে একজন মেকানিক গাড়িটাকে চেক করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসল রঙটা আনাড়ী হাতে করা। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে একটা উইংয়ে ঘষা দিল সে, অমনি নীলের নিচে ঝকঝকে সাদা রঙ দেখা গেল। হতভম্ব মেকানিক এবার পরীক্ষা করল নাম্বার প্লেটটা। দেখল উল্টোদিকেও একটা নাম্বার রয়েছে। কয়েক মিনিট পর প্লেটটাকে উল্টোমুখো হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল উঠানে, সাদা অক্ষরে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—MI-61741. ত্রস্ত পায়ে এগোচ্ছে মেকানিক অফিসের দিকে।

ছ'টার পরপরই খবরটা পেলেন ক্লড র‍্যাবো। সংবাদটা তাঁকে দিল অভার্ন-এর রাজধানী ক্লারমন্ট ফেরান্ট-এর রিজিওন্যাল হেডকোয়ার্টারের কমিশেয়ার ভ্যালমি। ভ্যালমির কথা শুনেই ঝাঁকি খেয়ে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল ক্লড র‍্যাবোর।

'রাইট, শোনো, ব্যাপারটা সাংঘাতিক জরুরী। কিন্তু গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলা

এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।...হ্যাঁ, মাই ডিয়ার চ্যাপ, আমি জানি তুমি আধখানা নও, পুরো একজন কমিশেয়ার, এবং কারণ না জানিয়ে কোন কাজ তোমাকে করতে বলা নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি। এর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা ও ভাল মন্দ জড়িত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করলেই জানতে পারবে আমার নির্দেশ বিনা বাক্যে পালন করার জন্যে তোমার ওপরওয়ালাদেরকেও অনুরোধ করা হয়েছে।'

কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর কমিশেয়ার ভ্যালমি জানতে চাইল, 'ঠিক আছে, মশিয়ে। এখন বলুন কি করতে হবে আমাকে।'

'একটা দল নিয়ে এক্ষুণি উজেলে চলে যাও। সব ক'জন বুদ্ধিমান এবং কাজের লোক হওয়া চাই, সংখ্যায় যত বেশি সম্ভব। গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে এনকোয়েরী শুরু করো। ওই বিন্দুটা থেকে চতুর্দিকে সম্ভাব্য সব জায়গায় সন্ধান নাও।'প্রত্যেক ফার্ম হাউজ, প্রত্যেক কৃষক, যারা ওই রাস্তা ধরে নিয়মিত গাড়িতে যাওয়া আসা করে, গ্রামের সব ক'টা দোকান, কাফে, সবগুলো হোটেল, সরাইখানা এবং কাঠুরেদের তাঁবুতে লোক পাঠাও।

'দীর্ঘদেহী একজন লোককে খুঁজছ তোমরা। মাথায় সোনালী চুল। সম্ভবত ইংরেজ, অন্তত পাসপোর্টে তাই লেখা আছে। যে-কোন ইংরেজের মতই পরিষ্কার ইংরেজী বলে, তবে ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও দখল আছে তার। সাথে তিনটে সুটকেস এবং একটা হ্যান্ডগ্রিপ আছে। বিস্তর টাকা রয়েছে তার কাছে। দামী পোশাক পরে। চেহারায় অনিদ্রার ছাপ থাকতে পারে।

'তোমার লোকেরা প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করবে কোথায় সে ছিল, কোন্‌দিকে, কোথায় গেছে, কি কি জিনিস কেনাকাটা করেছে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, প্রেসকে এ সম্পর্কে কিছুই জানানো চলবে না। লোকটা কোথায় আছে তা জানা মাত্র জায়গাটা ঘেরাও করে ফেলবে। কিন্তু, সাবধান, তার কাছে যাবার চেষ্টা যেন কেউ না করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি আমি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে একান্ত সচিবের দিকে তাকালেন ক্লড র‍্যাবো। বললেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ফোন করো। জানাও তিনি যেন মীটিংয়ের সময় আটটায় এগিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর এয়ারফোর্সে ফোন করে সেই হেলিকপ্টারটাকে তৈরি রাখতে বলো। রাতে আমি উজেলে যাব। হেলিকপ্টার কোথায় নামবে তাও জেনে নিয়ো। ওখান থেকে একটা গাড়ি তুলে নেবে আমাকে। এদিকটা দেখার জন্যে তোমাকে রেখে যাচ্ছি।'

গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রামে দলবলে পৌঁছুল কমিশেয়ার ভ্যালমি, অস্থায়ীভাবে তার হেডকোয়ার্টার হয়ে উঠল জায়গাটা। সূর্য অস্ত যাই যাই করছে। রেডিওর ভ্যানে বসে দুই ডজন স্কোয়াড কারকে নির্দেশ দিচ্ছে ভ্যালমি। পাঁচ বর্গ মাইল এলাকায় সারারাত ধরে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাবে ঠিক করেছে সে।

মধ্যরাত। কমিশেয়ার ভ্যালমির একদল লোক বুদ্ধি খরচ করে একজন কৃষকের

বাড়িতে গেল। গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে তারা খবর পেয়েছে এই কৃষকের নিজস্ব ট্রাক আছে। এবং প্রায়ই সে জঙ্গলের পাশের রাস্তাটা দিয়ে ঈগলটনের দিকে যায়।

ল্যাম্পের লালচে আলোয় কৃষক ঘরের দরজায় দাঁড়ানো গ্যাস্টনকে অস্বাভাবিক গম্ভীর আর সতর্ক দেখাচ্ছে।

'শুক্রবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে ঈগলটনে গিয়েছিলে নাকি?'

'হয়তো।'

'গিয়েছিলে, না যাওনি?'

'মনে নেই।'

'রাস্তায় একজন লোককে দেখেছিলে?'

'এদিক ওদিক তাকাই না আমি।'

'সেকথা জিজ্ঞেস করছি না আমরা। কাউকে দেখেছিলে কি?'

'না।'

'সোনালী চুল লোকটার মাথায়, লম্বা, সুদর্শন। তিনটে সুটকেস আর একটা হ্যান্ডগ্রিপ আছে সাথে।'

'না।'

বিশ মিনিট ধরে এই রকম চলল। পুলিসরা বুঝল, কৃষক লোকটা ভীষণ একগুঁয়ে আর কম কথার মানুষ।

পুলিসরা চলে যেতে বিছানায় ফিরে স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়ল লোকটা।

'লিফট দিয়েছিলে যাকে, তাকে খুঁজছে ওরা, তাই না? কেন বলো তো?'

'জানি না!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল লোকটা। 'মরুকগে শালারা! ওই শয়তানদের হাতে একজন লোককে তুলে দিতে সাহায্য করব তেমন বান্দা আমি নই!' গরম কম্বলটা বুক পর্যন্ত টেনে নিল সে। বলল, 'যেখানেই থাকো তুমি, দোস্ত, প্রার্থনা করি ভাল থাকো, নিরাপদে থাকো।'

কাগজ থেকে মুখ তুললেন ক্লড র‍্যাবো।

'সভাকে জানাচ্ছি,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'সার্চ তদারক করার জন্যে একটু পরই রওনা হয়ে যাব আমি উজেলে।'

প্রায় এক মিনিট কেউ কথা বলল না।

'মনে হচ্ছে নতুন মোড় নিয়েছে ঘটনা,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন। 'এর তাৎপর্য দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো?'

'তাৎপর্য দুটো, মশিয়ে। গাড়ির চেহারা বদল করার জন্যে রঙ কিনতে হয়েছে তাকে। আমার সন্দেহ, বৃহস্পতিবার রাত এবং শুক্রবার সকালের মধ্যে যদি গ্যাপ থেকে উজেলে এসে থাকে, এর আগেই গাড়ির রঙ বদলে ফেলেছিল সে। তদন্তে প্রমাণ হবে, গ্যাপে থাকতেই রঙ কিনেছিল সে। তাই যদি হয়, নিশ্চয়ই কেউ তাকে সাবধান করে দিয়েছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। হয় কেউ তাকে ফোন করেছিল, নয়তো সে কাউকে ফোন করেছিল—অপর ফোনটা কোথাকার, প্যারিসের নাকি লন্ডনের, জানা নেই আমাদের। ছদ্মনাম অরগ্যান আর ছদ্ম নেই এই

খবর পেয়েছিল সে। বুঝতে পারে, বিকেলের মধ্যেই তাকে এবং তার গাড়িকে খুঁজে বের করে ফেলব আমরা। গাড়িটা পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর।'

একচুল নড়ছে না কেউ। ক্লড র‍্যাবোর কণ্ঠস্বর কোমল হলে কি হবে, তাঁর কথার মধ্যে যে অভিযোগ রয়েছে তা অনুধাবন করে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। যেন এখুনি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে, আশঙ্কা করছে ওরা।

কিন্তু কেউ কথা বলছে না। ক্লড র‍্যাবোর মনে হলো, অসহ্য নিস্তব্ধতার প্রচণ্ড চাপে কনফারেন্স রুমের কংক্রিটের ছাদটা ফেটে গিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে মাথার উপর।

'আপনি সিরিয়াস, মশিয়ে?' কেউ যেন কয়েক লক্ষ মাইল দূর থেকে জানতে চাইল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন এই কামরায় আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি তাদের মধ্যে কোন ফাঁক রয়েছে, এবং সেই ফাঁক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গোপনীয় তথ্য?'

'তা আমি বলতে পারি না, মশিয়ে,' ক্লড র‍্যাবো তাঁর দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন। 'সুইচবোর্ড অপারেটর, টেলেক্স অপারেটর, মাঝের এবং নিচের এগজিকিউটিভরা রয়েছে এই সভার বাইরে, তাদের মাধ্যমে আদেশ নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে—কে জানে তাদের কেউ একজন ও-এ-এস-এর লোক কিনা।'

সবাই স্তব্ধ। আধ মিনিট পর কথা বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, 'মশিয়ে র‍্যাবো, দয়া করে দ্বিতীয় তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু বলুন আমাদেরকে।'

'অরগ্যান হিসেবে তার পরিচয় জানাজানি হয়ে গেছে, অথচ তবু সে ফ্রান্স ত্যাগ করার চেষ্টা করেনি। বদলে সে রওনা হয়েছে ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ডের দিকে। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থেকে সে একচুল নড়েনি। সহজ ভাষায় ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, গোটা ফ্রান্সের প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সে এককভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন তিনি। বললেন, 'মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো, আপনাকে আমরা দেরি করিয়ে দেব না। ধরুন তাকে। ধরুন আজ রাতেই। যদি প্রয়োজন মনে করেন দেখামাত্র গুলি করুন তাকে। কিল হিম। প্রেসিডেন্টের নামে এই হচ্ছে আমার অর্ডার।'

কথা শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

এক ঘণ্টা পর ক্লড র‍্যাবোকে নিয়ে আকাশে উঠল এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার। কালো আকাশের নিচ দিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে সেটা।

'শালা বদমাশ! ক্ষমতা হাতে পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে! ফ্রান্সের টপমোস্ট অফিশিয়াল আমরা, আমাদেরকে বলে কিনা ডাবল এজেন্ট! ঠিক আছে, প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করব আমি...'

উন্মুক্ত বুকে কর্নেল প্যাপনের মাথাটা তুলে নিল লুইসা পিয়েত্রো। 'এত উত্তেজিত হয়ো না তো,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'বোকার মত কিছু একটা করে হাস্যাস্পদ হয়ো না। সব শুনি আগে, তারপর বলে দেব কি করতে হবে।'

সাত

একুশে আগস্ট। স্বচ্ছ কাঁচের মত রোদ ঝলমলে সকাল। লা হাউতে শৈলনেয়ার-এর দুর্গ। পাঁচতলার একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঢেউখেলানো পাহাড় সারির দিকে তাকিয়ে আছে রানা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সবকিছু অনড়, অচঞ্চল। চারদিক প্রশান্ত, সৌম্য। আঠারো কিলোমিটার দূরে ঈগলটন শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে পুলিস, সে-ব্যাপারে কিছুই জানা নেই ওর।

জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। ব্যারনের স্টাডি রুম এটা। রোজ এখান থেকেই ফোন করে ও প্যারিসে। ছয়তলায় ঘুমিয়ে আছে ব্যারনেস সিবা, দেখে এসেছে ও।

অপরপ্রান্তে ফোন তুলল রূপা।

'নারা,' উত্তেজিত গলায় বলছে রূপা, 'ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে আবার। ওরা তোমার গাড়ি খুঁজে পেয়েছে...'

দুই মিনিট চুপচাপ শুনে গেল রানা। দ্রুত প্রশ্ন করল কয়েকটা। রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরল জানালার দিকে। সিগারেট আর লাইটারের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে। রূপার কথায় সব ওলোটপালট হয়ে গেছে। প্ল্যান বদল করা ছাড়া উপায় নেই। আরও দুটো দিন এই দুর্গে থাকতে চেয়েছিল ও। এখন তা আর সম্ভব নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে।

কি একটা ব্যাপারে খুঁত খুঁত করছে মনটা। ফোন করার সময় কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু ধরতে পারছে না ব্যাপারটা।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে ও, এমন সময় আপনা থেকেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল ওর কাছে। ফোনের রিসিভার তোলার পরপরই মৃদু একটা ক্লিক শব্দ ঢুকেছিল কানে। মন খুঁত খুঁত করার সেটাই কারণ। গত তিন দিন ধরে এখান থেকে ফোন করছে ও, এর আগে এ-ধরনের কিছু ঘটেনি। বেডরুমে এক্সটেনশন ফোন একটা আছে বটে, কিন্তু সিবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে এসেছে ও...।

নিঃশব্দ, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলায় উঠল রানা। খোলা রয়েছে বেডরুমের দরজা। পর্দা সরিয়ে ঢুকল ও।

ক্রাডলে রেখে দেয়া হয়েছে ফোনের রিসিভার। ওয়ারড্রোবটা হা হা করছে। সুটকেস তিনটে মেঝেতে, সবগুলো খোলা। ওর চাবির রিঙটাও পড়ে রয়েছে কার্পেটের উপর। জিনিসপত্রের গাদার মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে সিবা। অনিন্দ্যসুন্দর মুখে বিস্ময় আর ভীতি ফুটে উঠেছে তার। চোখ দুটো বিস্ফারিত। তার সামনে স্টীল টিউবগুলো পড়ে রয়েছে। একটা টিউব থেকে বের করে ফেলেছে সে টেলিস্কোপ সাইটটা, তার সামনে দেখা যাচ্ছে টিউব-মুক্ত সাইলেন্সার। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে নিজের হাতের দিকে। তার হাতে রাইফেলের

ব্যারেল আর ব্রীচ।

কয়েক সেকেন্ড কেউই কথা বলল না। ধাক্কাটা প্রথম সামলে উঠল রানাই।

'আড়ি পেতে শুনছিলে তুমি।'

'আমি···কৌতূহল চেপে রাখতে পারিনি···রোজ সকালে কাকে তুমি ফোন করো···'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমাচ্ছ···'

'তোমার জীবনে কোন বড় ঘটনা আছে,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সিবা, 'এ আমি অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম। কি যেন চিন্তা করো সব সময়। কেউ তোমাকে আঘাত দিয়েছে, তাই দুঃখ পুষে রেখেছ মনের ভিতর—এই রকম ভেবেছিলাম। দুঃখের কারণটা জানার জন্যে···' সিবা কার্পেটে ছড়িয়ে থাকা স্টীল টিউবগুলো দেখাল আঙুল দিয়ে, 'কিন্তু এগুলো কি? একটা রাইফেল। তাই না? তুমি কে, অ্যালেক্স?'

রানা চুপ। সিবাকে কিছু বলার কোন মানে হয় না। বুঝবে না সে। হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত উৎকট সঙ্কট, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে সে যদি চলে যায়, সিবার মনে একজন খুনী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে সে। এবং একজন খুনীকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সে যদি পুলিসকে সাহায্য করে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার অনেক কিছু রয়েছে। এ-ধরনের কিছু ঘটতে দিতে পারে না ও।

'কাউকে খুন করতে চাও? তুমি একজন খুনী?' আতঙ্কে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সিবার চেহারা। 'না!' এগিয়ে এসে খপ্ করে রানার হাতের কজি চেপে ধরল সে। 'অসম্ভব! আমার মন বলছে, কোন অন্যায় কাজ তোমার দ্বারা হবার নয়। কিন্তু তাহলে···'

নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা।

'বলবে না? বলার মত নয় তা? বুঝেছি!' রানার মুখের কাছে আরও এগিয়ে এল সিবার মুখ '···কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে। শুধু বলো, অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছ না তুমি? তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট আমার জন্যে, সেটাই সত্য বলে বিশ্বাস করব। বলো, অন্যায় কিছু···'

'আত্মরক্ষা করা কি অন্যায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'না।'

'তাহলে আমি অন্যায় কিছু করছি না,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমাদের সরকার আমাকে ভুল বুঝছে। তাদের এ ভুল ভাঙাবার সাধ্য এই মুহূর্তে কারও নেই। সব কথা খুলে না বললে তুমি পরিস্থিতিটা বুঝবে না। অথচ সব কথা বলার সময় নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, গোটা ফ্রান্স জুড়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে আমাকে।'

চমকে উঠল সিবা। 'তার মানে যে-কোন মুহূর্তে এখানেও এসে পড়তে পারে পুলিস?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যদি সময় পাই, যদি এই কয়েক ঘণ্টা আমার সম্পর্কে পুলিসকে কেউ কিছু না জানায়, ধরতে পারবে না ওরা আমাকে।'

কি যেন ভাবছে সিবা। 'আমি কথা দিচ্ছি···' হঠাৎ রানার হাত ছেড়ে দিল

সিবা। 'দাঁড়াও, এক্ষুণি আসছি আমি…' কথা শেষ করে ছুটল সিবা। বাধা দেবার কোন অবকাশই পেল না রানা, ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ব্যারনেস। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে তার পদশব্দ, শুনতে পাচ্ছে ও।

কোথায় গেল সিবা? ফোন করতে যায়নি তো? পুলিসকে? দূর, এতবড় বেঈমানী করবে বলে মনে হয় না…

দশ মিনিট পর ফিরে এল সিবা। 'জিনিসপত্র গোছগাছ করে নাও।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। একটা হাত রাখল সিবার কাঁধে। 'কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন, সিবা? ভয় পেয়েছ?'

হাসছে সিবা। 'তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব না—এ ব্যাপারে তোমার কাছে সম্পূর্ণ সন্দেহ-মুক্ত থাকতে চাই আমি। তাই ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করেছি। এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ব।' রানার বুকে ধাক্কা মারল সিবা। 'জিনিসপত্র স-সব বের করে নি-নিজের কামরায় চলে যাও, এ ঘ-ঘরের দরজা ভি-ভিতর থেকে ব-বন্ধ করে দেব। জানালা দিয়ে ওরা দে-দেখবে আমি ঘুমাচ্ছি…'

'কত সি. সি. নিয়েছ? ডোজ বেশি হয়ে যায়নি তো?'

'না-না। তু-তুমি যাও! ঘু-ঘুমে…'

দ্রুত সব সুটকেসে ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সিবা। মেয়েটার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছে রানা।

নিজের কামরায় ফিরে এসে দরজা বন্ধ করল রানা। খালি টিউবগুলোয় রাইফেলের যন্ত্রাংশ ভরল দ্রুত। মার্ক রোডিনের নোংরা পোশাক আর মিলিটারি গ্রেটকোটের সাথে সুটকেসে সাজিয়ে রাখল টিউবগুলো। হাত দিয়ে সুটকেসটার লাইনিং স্পর্শ করে দেখল, কাগজপত্রগুলো জায়গামতই আছে। বন্ধ করে তালা মেরে দিল সুটকেসটায়। দ্বিতীয় সুটকেসে ডেনিশ ধর্মযাজকের কাপড়চোপড় রয়েছে। সিবা এটা খুললেও ঘাঁটাঘাঁটি করেনি।

বাথরূমে ঢুকে পাঁচ মিনিট কাটাল রানা মুখ হাত ধুয়ে দাড়ি কামাতে। তারপর কাঁচি বের করে লম্বা সোনালী চুলগুলোকে পিছন দিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সতর্কতার সাথে ইঞ্চি দুয়েক ছোট করে ফেলল। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল কাজটা সারতে। এরপর যথেষ্ট পরিমাণ কলপ ব্যবহার করে চুলের রঙ নারকেলের ছোবড়ার মত লালচে করে তুলল। ধর্মযাজক বেনসনের ফটোটা বাথরূম শেলফে রেখে তার চুলের সাথে নিজের চুলটা মিলিয়ে সন্তুষ্ট হলো ও। সবশেষে নীলচে কন্ট্যাক্ট লেন্স জোড়া পরল চোখে।

ওয়াশ বেসিন থেকে প্রতিটি চুল আর কলপের ক্ষীণতম দাগ অতি যত্নের সাথে সরাল রানা। দাড়ি কামাবার সমস্ত সরঞ্জাম তুলে নিয়ে ফিরে এল বেডরূমে।

কোপেনহেগেন থেকে কেনা ভেস্ট, প্যান্ট, মোজা এবং শার্ট পরল রানা। কালো বিবটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে তার উপর চড়াল ধর্মযাজকের ডগ কলার। সবশেষে পরল কালো স্যুট এবং ওয়াকিং শু জোড়া। গোল্ডরিমের চশমাটা উপরের পকেটে ঢুকিয়ে নিল ও। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ভরল হ্যান্ডগ্রিপে, ফ্রেঞ্চ ধর্মমন্দির সম্পর্কে ডেনিশ ভাষায় লেখা বইটাও রাখল এতে। স্যুটের ভিতরের পকেটে জায়গা পেল ধর্মযাজকের পাসপোর্টটা, এর সাথেই থাকল এক তাড়া কড়কড়ে নোট।

ইংলিশ পোশাকের অবশিষ্টগুলো তৃতীয় সুটকেসে ফিরে গেল। তারপর বন্ধ করে তালা মেরে দেয়া হলো এটাতেও।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। আটটা বাজতে চলেছে। সকালের কফি নিয়ে এক্ষুণি উঠে আসবে নেস্তাইন। সিঁড়িতে রয়েছে হয়তো সে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। সাইকেল চালিয়ে দুর্গের গেটের দিকে আসছে কে যেন। কাছাকাছি আসতে লোকটাকে চিনতে পারল রানা। নেস্তাইনের স্বামী লনসন, বাজার নিয়ে ফিরছে। পিছনে, দরজায় নক হলো এই সময়। 'মশিয়ে, আপনার কফি।'

দ্রুত চিন্তা করল রানা। তারপর ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'রেখে যাও। আর শোনো, এইমাত্র ঘুমিয়েছেন মাদাম, তাঁকে বিরক্ত কোরো না।'

ভুরু জোড়া কপালে তুলে সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল নেস্তাইন। পাশাপাশি দুটো বেডরূমের দরজায় দুটো কফির ট্রে রেখে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নামছে সে। ব্যারনেস ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে শুয়েছে, মুখরোচক খবরটা স্বামীকে শোনাতে হয় তাহলে, ভাবছে সে।

কিচেনে স্বামী স্ত্রী ফিসফাস করছে, এই সময় সুটকেসগুলো কাঁধে আর হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে নেমে এল রানা। ওরা কেউ টেরই পেল না। কিন্তু ব্যারনেস সিবার ছোট্ট রেনোয়া গাড়িটা স্টার্ট নিতেই চমকে উঠল দু'জন। জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখল গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।

'মশিয়ে, পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছেন বুঝি?'

স্বামীকে সমর্থন করল নেস্তাইন, 'তাই হবে।'

ব্রেকফাস্টের একটু পর হেলিকপ্টারে করে প্যারিসে ফিরে এলেন ক্লড র‍্যাঁবো। পরে অফিসে পৌঁছে একান্ত সচিব চার্লস ক্যারনকে তিনি জানালেন, গ্রামবাসীদের মনোভাব অসহযোগিতামূলক হলেও কমিশেয়ার ভ্যালমি প্রশংসনীয় সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন কাজে। ঈগলটনের একটা কাফেতে সকালের নাস্তা সেরেছিল অরগ্যান, এবং ওখান থেকেই সন্ধান নিয়েছিল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের, শেষ রাতের দিকে এই মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। কমিশেয়ার ভ্যালমি যোগ্য, উদ্যমী এবং বিশ্বস্ত লোক বুঝতে পেরে তিনি তাকে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু আভাস দিয়ে এসেছেন। ভ্যালমি এখন ঈগলটনের চারপাশের বিশ কিলোমিটার এলাকা ঘেরাও করার কাজে ব্যস্ত। দুপুরের মধ্যে শেষ হবে কাজটা। এর মধ্যে অরগ্যান যদি থাকে, বেরিয়ে যাবার আর কোন উপায় নেই তার।

হাউতে শেলনেয়ার থেকে পাহাড়ী রাস্তা ধরে মত্ত ষাঁড়ের মত ছুটে চলেছে রেনোয়া দক্ষিণের তুল-এর দিকে। মনে মনে হিসাব কষে বুঝে নিয়েছে রানা, আলফা যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে চতুর্দিকে ক্রমশ বিস্তৃত পুলিসী অনুসন্ধান আজ সকালের মধ্যেই ঈগলটন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কাফের বারম্যানের কাছ থেকে কথা আদায় করবে পুলিস, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করবে—কোন সন্দেহ নেই বিকেলের মধ্যে ওরা পৌঁছে যাবে দুর্গে।

ভয়ের কিছু নেই, ভাবছে রানা। পুলিস একজন সোনালী চুলের ইংরেজকে খুঁজছে। কিন্তু এখন সে ইংরেজ নয়। তার চুলও এখন সোনালী নয়। অরগ্যানকে কোথাও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে এখন ডেনিশ ধর্মযাজক বেনসন।

কিন্তু, তবু, ধাওয়া করতে করতে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। একটু ভুল হলে শোধরাবার সময় পাওয়া যাবে না, তার আগেই ধরে ফেলবে খপ করে।

পাহাড়ী পথ থেকে আর-এন এইটিনে উঠে এল গাড়ি। ঈগলটনের দক্ষিণ পশ্চিমের এই রাস্তা সোজা চলে গেছে তুল-এর দিকে। তুল এখনও বিশ কিলোমিটার দূরে। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

ধনুকের মত বেঁকে গেছে রাস্তাটা। বাঁকটা নিয়ে রেনোয়া অদৃশ্য হয়ে যেতেই একটা সাইড রোড থেকে ঝড় তুলে মেইন রোডে উঠে এল একটা পুলিস কনভয়। সামনে একটা স্কোয়াড কার, পিছনে দুটো চারদিক ঢাকা ভ্যান। ধনুকের মত বাঁকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল কনভয়টা। ঝপাঝপ লাফ দিয়ে নামল এক ডজন পুলিস। ভ্যান থেকে ধরাধরি করে স্টীলের রোড ব্লক সরঞ্জাম নামাচ্ছে তারা।

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ল মহিলার। বাড়িতে পুলিসের ঘন ঘন আসা যাওয়া এবং স্বামীর ফিরতে অস্বাভাবিক দেরি দেখে ঘাবড়ে গেছে সে। তার উপর উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারের কড়া ধমক-ধামক খেয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে তার।

কমিশেয়ার ভ্যালমি অবশেষে নরম হলো। বলল, 'তোমার স্বামী কোন অন্যায় করেনি। তাকে আমরা অন্য ব্যাপারে খুঁজছি। বলতে পারো, শুক্রবারে কোন আরোহীকে ট্যাক্সিতে তুলেছিল কিনা?'

ড্রাইভারের স্ত্রী খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'স্টেশন থেকে খালি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসেছিল ও। ওই সময় খবর আসে কাফে থেকে কেউ ট্যাক্সি খুঁজছে। মেরামতের কাজের জন্যে হুইলটা খুলে রেখেছিল ও, তাড়াহুড়োর সাথে সেটা লাগিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে কাফেতে চলে যায়। ভাড়ার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল ও, কিন্তু আরোহীকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে তা সে জানায়নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভ্যালমি। দু'জন কনস্টেবলকে নির্দেশ দিল ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়িতে অপেক্ষা করার জন্যে। একজন সার্জেন্টকে পাঠাল স্টেশনে। চৌরাস্তা এবং কাফেতেও দু'জন করে কনস্টেবল পাঠাল সে।

তুল থেকে ছয় মাইল এদিকের একটা চওড়া নালায় সমস্ত ইংলিশ পোশাক এবং আলেকজান্ডার অরগ্যানের পাসপোর্টটা ফেলে দিল রানা। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে ডুবে গেল সুটকেসটা।

তুলকে চক্কর দিয়ে স্টেশনটাকে খুঁজে বের করল ও, তিন রাস্তা দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুটো সুটকেস আর হ্যান্ডগ্রিপ নিয়ে আধ মাইল হেঁটে পৌঁছল রেলওয়ে বুকিং অফিসে।

'প্যারিসের একটা সিঙ্গেল টিকেট দরকার আমার। সেকেন্ড ক্লাস, প্লীজ।' কাঁচের দেয়ালের উপর দিয়ে কেরানীর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'কত দিতে হবে?'

'নতুন সাতানব্বই ফ্র্যাঙ্ক, মশিয়ে।'

'পরবর্তী ট্রেন ক'টার সময় বলুন তো?'

'এগারোটা পঞ্চাশে, মশিয়ে। প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় একটা রেস্তোরাঁ আছে। প্ল্যাটফর্ম ওয়ানে থাকতে হবে প্যারিসের যাত্রীদেরকে।'

লাগেজ তুলে নিয়ে গেটের দিকে এগোল রানা। গেটকীপার ওর কাছে টিকেট চাইল। টিকেটে একটা সীল মারল লোকটা। গেট পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়েছে, ধক করে উঠল ওর বুক। পথ রোধ করে দাঁড়াল নীল ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। সুরেত-এর চার শাখার এক শাখা Corps Republicain de Securite-এর ইউনিফর্ম এটা, দেখেই চিনল রানা। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। ঝিম ঝিম করছে মাথার ভিতর।

কাঁধ থেকে সাব-মেশিনগানটা নামাচ্ছে সি.আর.এস-এর লোকটা। বয়স অল্প। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বেপরোয়া ভাব ফুটে আছে। স্মিত হাসল রানা। চোখ ইশারায় একপাশে সরে যেতে বলল লোকটাকে। ভুরু কুঁচকে উঠল লোকটার। নড়ল না সে। রানা ব্যাপারটা লক্ষ না করার ভান করে নিজেই সরে গেল লোক চলাচলের জায়গা ছেড়ে একপাশে, তারপর হাতের লাগেজগুলো নামাল। পকেটে হাত ভরছে ও, এমন সময় সরে এসে ওর সামনে দাঁড়াল লোকটা দু'পা ফাঁক করে।

পকেট থেকে ডেনিশ পাসপোর্টটা বের করল রানা। ওর হাত থেকে ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিল লোকটা। পাতাগুলো ওল্টাচ্ছে সে। মুখে ভাবের কোন প্রকাশ নেই। আসলে একটা হরফও বুঝতে পারছে না সে। ইংরেজিই জানে না, ডেনিশ তো অনেক পরের ব্যাপার।

দ্রুত পাসপোর্টটা বন্ধ করে রানার হাতে গুঁজে দিল লোকটা। হড়বড় করে একগাদা দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে হাত ইশারায় কেটে পড়তে বলল রানাকে। আরেকজন লোক এগিয়ে আসছে দেখে বুট জুতোর আওয়াজ তুলে সেদিকে ছুটল ব্যস্ততার সাথে।

এত সহজে ছাড়া পাবে, ভাবেনি রানা। সুটকেসগুলো তুলে নিয়ে দ্রুত এগোল ও। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না।

স্বামীকে বাধ্য করল নেস্তাইন ব্যারনেসের শোবার ঘরের উঁচু জানালায় উঠতে।

একটা টেবিলের উপর চেয়ার দাঁড় করানো হলো, সেই চেয়ারে দাঁড়িয়ে লনসন জানালার পর্দা সরিয়ে নিচে তাকাল। দেখল ব্যারনেস চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

অত্যন্ত সাবধানে চেয়ার থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে করিডরের মেঝেতে নামল লনসন। ফিস ফিস করে স্ত্রীকে বলল, 'শরীরের ওপর দিয়ে সারারাত খুব ধকল গেছে কিনা, ব্যারনেস তাই অনেক বেলা অবধি ঘুমাচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।'

প্যারিসের ট্রেন পৌঁছতে বেশ খানিকটা দেরি করল। বেলা বারোটায় তুল স্টেশনে

এসে থামল সেটা। আরোহী হিসাবে যারা চড়ল এতে তাদের মধ্যে একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকও রয়েছে। দেখেশুনে এমন একটা কম্পার্টমেন্টে উঠল সে যেটায় মাত্র দু'জন মধ্যবয়স্কা মহিলা রয়েছে। একধারের একটা আসনে বসল সে। গোল্ডরিমের চশমাটা চোখে পরে ডেনিশ ভাষায় লেখা মস্ত একটা বই পড়ছে আপন মনে। ইতোমধ্যে খোঁজ নিয়ে জানা হয়ে গেছে তার, ট্রেনটা প্যারিসে পৌঁছবে আটটা দশে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ববেট তার অচল গাড়ির পাশে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে অসহায় ভাবে। বারবার ঘড়ি দেখছে সে আর নিজের ফাটা কপালকে গালমন্দ করছে। দেড়টা বাজে, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। ঈগলটন আর লামাজের মাঝখানে এই রাস্তার দশ মাইলের মধ্যে কোন শহর বা গ্রাম নেই। আর থাকলেই বা কি, গাড়ি ছেড়ে সাহায্যের জন্যে যাওয়াও সম্ভব নয়। যদি যায়, ফিরে এসে গাড়িটাকে দেখতে পাবে না সে। চোর-ছ্যাঁচড়রা একবার দেখলে হয়, ঠেলে নিয়ে গিয়ে চোরাকারবারীর কাছে পানির দামে বেচে দেবে। না, গাড়ি ছেড়ে কোথাও সে যাবে না। সন্ধ্যার মধ্যে এক-আধটা ট্রাক নিশ্চয়ই এ রাস্তায় আসবে। যতক্ষণ না আসে, অপেক্ষা করবে সে। শুক্রবারে সেই ইংরেজ আরোহীর দেয়া সেই বোতলে লাল মদের কিছুটা অবশিষ্ট আছে এখনও। গাড়িতে উঠে গলায় সেটুকু ঢালল ববেট, তারপর সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না তার।

'এর মানে কি! ফিরে আসেনি এখনও···লোকটা গেল কোথায়?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল কমিশেয়ার ভ্যালমি। টেলিফোনে ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়িতে অপেক্ষারত একজন পুলিস কনস্টেবলের সাথে কথা বলছে সে। খটাশ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কলিং বেল বাজাল সে। তাঁবুতে ঢুকল একজন কনস্টেবল।

'একুশ নম্বর স্কোয়াড কারকে হাইওয়ে ধরে ঈগলটন ছাড়িয়ে বিশ মাইল ঘুরে আসতে বলো। ট্যাক্সি নিয়ে ড্রাইভার ফেরেনি এখনও। বলবে, কোন খোঁজ পাওয়া মাত্র রেডিও মেসেজ পাঠাতে হবে।'

দ্রুত বেরিয়ে গেল কনস্টেবল।

সকাল থেকে লাঞ্চ আওয়ার পর্যন্ত একের পর এক অসংখ্য রেডিও রিপোর্ট এসে পৌঁচেছে। প্রতিটি রিপোর্টের সারমর্ম এক: অমুক জায়গায় ব্লক করা হয়েছে রোড। ঈগলটনের বিশ কিলোমিটার চৌহদ্দির মধ্যে এমন একজনকেও দেখা যায়নি এখন পর্যন্ত যার সাথে দীর্ঘদেহী ইংরেজ অরগ্যানের চেহারাগত মিল আছে। লোকটা লুকাল কোথায়, ভাবছে কমিশেয়ার ভ্যালমি। বাতাসে মিলিয়ে তো আর যেতে পারে না, নিশ্চয়ই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে সে। কিন্তু কতক্ষণ? বেরোতে তাকে হবেই। তার মানে প্রহরা আরও জোরদার করে অপেক্ষায় থাকতে হবে, বেরনো মাত্র যাতে ধরা যায়।

সাড়ে ছয়টায় প্যারিস থেকে ক্লড র‍্যাঁবো ফোন করলেন ভ্যালমিকে।

'মশিয়ে, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি,' ভ্যালমি বলল, 'এখনও কোন সুখবর পাইনি

আমি। তবে এইটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবার প্রতিটি রাস্তায় কড়া প্রহরার যে ব্যবস্থা করেছি তাতে এতটুকু খুঁত নেই। এই বৃত্তের মধ্যে যদি সে থাকে, ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

'ট্যাক্সি ড্রাইভার লোকটা···?'

'বাতাসে মিলিয়ে গেছে লোকটা। আপনার অরগ্যান কোথায় লুকিয়ে আছে, এ তথ্য পাওয়া যেত ড্রাইভারের কাছ থেকে। ওর স্ত্রী শুধু এইটুকু জানে যে শুক্রবারে একজন ইংরেজকে কোথাও পৌঁছে দিয়েছিল সে। কোথায়, তা সে তার স্ত্রীকে বলেনি।···হ্যাঁ, তার খোঁজে গাড়ি পাঠানো হয়েছে···এক মিনিট ধরুন, মশিয়ে, আরেকটা রিপোর্ট আসছে।'

ভ্যালমি অপরপ্রান্তে চুপ হয়ে গেছে। ক্লড র‍্যাঁবো অস্পষ্টভাবে অন্য এক লোকের চঞ্চল কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন। একটু পরই আবার কথা বলল ভ্যালমি। 'মশিয়ে, গোদের ওপর বিষফোঁড়া!'

'মানে?'

'খুন, মশিয়ে,' বলল ভ্যালমি। 'মার্ডার!'

'কোথায়?' দ্রুত আগ্রহ প্রকাশ করলেন ক্লড র‍্যাঁবো।

'হাউতে শেলনেয়ারের একটা দুর্গে। একজন ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন। এক মিনিট ধরুন,···মাই গড, খুন হয়েছেন ব্যারনেস সিবা!'

একান্ত সচিব চার্লস ক্যারন দেখছে চীফ ক্লড র‍্যাঁবোর মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

'ভ্যালমি, মন দিয়ে শোনো। এ তার কাজ। নিশ্চয়ই তার কাজ। সে কি দুর্গ থেকে কেটে পড়েছে?'

ঈগলটনের অস্থায়ী পুলিস হেডকোয়ার্টারে আরেক দফা আলোচনা হলো। তারপর ভ্যালমি ক্লড র‍্যাঁবোকে জানাল, 'হ্যাঁ, মশিয়ে। ব্যারনেসের গাড়ি নিয়ে আজ সকালেই চলে গেছে সে। ছোট একটা রেনোয়া। দুর্গের চাকরানী আর তার স্বামী লাশ আবিষ্কার করেছে খানিক আগে। অনেক ডাকাডাকি করেও ব্যারনেসের ঘুম ভাঙাতে না পেরে জানালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে ওরা। স্থানীয় ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছে মৃত্যুর কারণ ঘুমের ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত ডোজ। ব্যারনেসের বাহুতে সূচের দাগ পাওয়া গেছে। সম্ভবত ঘুমাচ্ছিলেন ব্যারনেস, এই সময় অরগ্যান তাঁকে ওভারডোজ ইঞ্জেকশন দিয়েছে।'

'গাড়ির বর্ণনা আর নাম্বার পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। গোপনীয়তার আর কোন প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার জন্যে যা কিছু করার সব করো। ইটস এ স্ট্রেইট মার্ডার হান্ট নাউ। সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিটি থানা, স্কোয়াড কার, পুলিস স্টেশন, রেডিও কারকে সতর্ক করে দিচ্ছি এখান থেকে আমি। তবে, অকুস্থলে গিয়ে ওখান থেকে সূত্র ধরে লোকটার পিছু নেয়া যায় কিনা, চেষ্টা করে দেখো তুমি। যে-পথে পালিয়েছে বা তার পালাবার সম্ভাব্য পথগুলোয় দ্রুতগামী পুলিস ভ্যান পাঠাও। সশস্ত্র লোক ছাড়া কেউ যেন তাকে ধাওয়া না করে। রক্তের স্বাদ পাওয়া হিংস্র জানোয়ার সে, স্বাধীন

থাকার স্বার্থে একের পর এক খুন করে যাবে এখন। সাবধান!'

'মশিয়ে···'

'বলো।'

'আমার লোকদের কি নির্দেশ দেব, দেখামাত্র গুলি করতে হবে তাকে?'

ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড কথা বললেন না ক্লড র‍্যাবো। ভাবছেন। অ্যাকশন সার্ভিস তাঁকে জানিয়েছে, অরগ্যানকে তারা জীবিত ধরতে চায়, কারণ হিসেবে একটা যুক্তিও দেখিয়েছে তারা। কিন্তু অরগ্যান এখন সাধারণ মানুষের জন্যেও মস্ত বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে-কোন সামান্য কারণে সে খুন করবে এখন।

'হ্যাঁ,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ফ্রান্সের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুলিস অফিসার। 'অবশ্যই। দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি। পায়ে। তবে অবস্থা বেগতিক দেখলে বুকে এবং মাথাতেও গুলি করা চলবে। জীবিত ধরতে না পারলে আমি তার লাশ দেখতে চাই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ক্লড র‍্যাবো তাঁর একান্ত সচিবের দিকে তাকালেন। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'বয়েস বাড়ার সাথে সাথে বুদ্ধি কমে যাচ্ছে আমার, বুঝলে? হোটেল দু সার্ফের বোর্ডার তালিকায় ব্যারনেস সিবার নাম ছিল, অরগ্যানের নামের ঠিক নিচেই। তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করা উচিত ছিল আমার।'

তুল। সাড়ে সাতটা। টহলরত একজন পুলিস পেল গাড়িটাকে। সাতটা পঁয়তাল্লিশে পুলিস স্টেশনে খবর দিল সে। পুলিস স্টেশন যোগাযোগ করল ভ্যালমির সাথে। অভার্ন-এর কমিশেয়ার ভ্যালমি ক্লড র‍্যাবোকে ফোন করল আটটা পাঁচে।

'রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে,' ক্লড র‍্যাবোকে জানাল সে।

'তোমার কাছে এই মুহূর্তে রেলওয়ে টাইম-টেবল আছে?'

'থাকার কথা। দেখি।···হ্যাঁ আছে।'

'তুল থেকে সকালের প্যারিসগামী ট্রেন ক'টায় ছাড়ে? এবং গার ডি' অস্টারলিজে কখন পৌঁছায়? কুইক, ফর গডস সেক, কুইক!'

কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর ভ্যালমি জানাল, 'সারাদিনে মাত্র দুটো ট্রেন ছাড়ে তুল থেকে। এগারোটা পঞ্চাশে ছাড়ে সকালের ট্রেন, প্যারিসে পৌঁছায়···আটটা দশে···।'

রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন ক্লড র‍্যাবো। তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে চার্লস ক্যারনকে নির্দেশ দিলেন চিৎকার করে। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছেন বাইরে।

দীর্ঘ একটানা সিটি বাজিয়ে আটটা দশের এক্সপ্রেস ট্রেন প্যারিসের গার ডি' অস্টারলিজ স্টেশনে রাজকীয় ভঙ্গিতে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছল। এখনও পুরোপুরি থামেনি ট্রেনটা, চকচকে গা থেকে সার সার দরজাগুলো ঝটপট খুলে যাচ্ছে, আরোহীরা দ্রুত নামছে প্ল্যাটফর্মে। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজছে

অনেকে, বাকিরা মেইন হলে ঢুকছে দল বেঁধে, এটা সেটা কেনাকাটা করছে। এদের মধ্যে অনেকে মেইন হলের অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে চলে যাচ্ছে। এই শেষোক্ত দলটার প্রথম সারিতে রয়েছে একজন ডেনিশ ধর্মযাজক। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সবার আগে পৌঁছল সে। একটা মার্সিডিজে দুটো সুটকেস আর হ্যান্ডগ্রিপটা নিয়ে উঠল। মিটার ডাউন করে দিয়ে ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার। একটা বিরাট টার্ন নিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে ঘুরিয়ে নিল গাড়ির নাক। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল যানবাহন ঠাসা রাস্তায়।

রাস্তায় বেরিয়েই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল ড্রাইভার। একসাথে দুটো জিনিস লক্ষ করল সে। এক, সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ এগিয়ে আসছে। দুই, রাস্তার দু'ধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য যানবাহন। রাস্তা পেরিয়ে সে-ও তার ট্যাক্সিকে একটা লাইনের শেষে দাঁড় করাল।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে একটা কনভয়। সামনে একটা খোলা জীপ। জীপে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। একজন প্রৌঢ়, সুন্দর ফ্রেঞ্চকাট লালচে দাড়ি তাঁর মুখে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন একটা চুরুট। কিন্তু নিভে গেছে সেটা। ক্লড র‍্যাবোর কাঁচাপাকা চুল পিছন দিকে উড়ছে প্রচণ্ড বাতাসে। তাঁর পাশে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছে চার্লস ক্যারন। বিকট শব্দ উঠল জীপের চাকার সাথে রাস্তার ঘর্ষণে। বাঁক নিয়ে স্টেশনের চত্বরে ঢুকছে কনভয়টা। জীপের পিছনে দুটো পুলিস ভ্যান। সাব-মেশিন কারবাইনধারী অনেক পুলিস দেখা যাচ্ছে।

'ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে,' বলল ড্রাইভার। 'কেউ বোধহয় ঠোলাদের লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় যাবেন, মৌলানা সাহেব?'

কোয়াই দেস গ্রান্ডস অগাস্টিন এলাকার ছোট্ট একটা হোটেলের ঠিকানা বলল ড্রাইভারকে রানা।

রাত ন'টা। ঝড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এলেন ক্লড র‍্যাবো। টেবিলে বসতে না বসতে তুল থেকে ফোন এল কমিশেয়ার ভ্যালমির।

'গাড়ি থেকে হাতের ছাপ নেয়া হয়েছে?' জানতে চাইলেন ক্লড র‍্যাবো। খাতা পেন্সিল নিয়ে নোট করছেন তিনি।

'জ্বী, মশিয়ে। দুর্গের দুটো বেডরুম থেকেও সংগ্রহ করা হয়েছে। কয়েকশো সেট, সব মিলছে।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দাও এখানে,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'তোমার লোকজনদের ক্ষান্ত হতে বলো। সে এখন আমাদের এলাকায়। এখান থেকেই তার বিরুদ্ধে যা করার করছি আমরা।'

'কোন সন্দেহ নেই তো, মশিয়ে, ডেনিশ ধর্মযাজকই আমাদের সেই লোক?'

'কোন সন্দেহ নেই। একটা সুটকেস কম রয়েছে এর কাছে, কিন্তু হাউতে শেলনেয়ার এবং তুলের মাঝখানে নদী-নালায় খোঁজ করলেই সেটা পেয়ে যাবে তুমি। বাকি তিনটের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে ডেনিশ পাদ্রীর লাগেজগুলো। সে-ই, সন্দেহের অবকাশ নেই।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

'বুদ্ধিমান, আগেই বলেছি,' একান্ত সচিবের দিকে তাকিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'বেছে বেছে এমন একটা ছদ্মবেশ নিয়েছে, কার বাপের সাধ্যি সন্দেহ করে কেউ। পাদ্রী, ডেনিশ ধর্মযাজক।'

'কিন্তু, চীফ, আমাদের ব্যর্থতার সংখ্যাও কম নয়...'

'রাইট, মাই বয়। সি-আর-এস-এর লোকটা বলছে পাসপোর্ট চেক করেছে সে, কিন্তু নামটা মনে নেই তার। ঈগলটনে কি ঘটল? নির্জন রাস্তায় নষ্ট গাড়িতে বসে ঘুমিয়ে সময় কাটাল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। সময় মত এর দেখা পেলে কেল্লা ফতে হয়ে যেত কখন! দুর্গে কি ঘটল? মনিব দশ বারো ঘণ্টা অতিরিক্ত ঘুমাচ্ছে, অথচ টনক নড়ছে না চাকরবাকরদের। একটা কথা জেনে রাখো, মাই বয়, এটাই আমার শেষ কেস। বয়স বেশি হয়ে গেছে আমার। এ বয়সে একটা কাজই সাজে আমাকে। রসুনের আচার তৈরি করে পোয়াতী মেয়েদেরকে উপহার দেয়া। তাই করব, বুঝলে? এখন, যাও, গাড়ি রেডি করো। গরম চুলোয় সেদ্ধ হতে যাবার সময় হয়ে গেছে।'

টান টান ধনুকের ছিলার মত শিরদাঁড়া খাড়া করে চল্লিশ মিনিট বসে রইল সবাই কনফারেন্স রুমে। স্বভাবসুলভ মৃদু গলায় এক এক করে সমস্ত ঘটনা বলে গেলেন ক্লড র‍্যাবো, ঈগলটনের জঙ্গলে সূত্র প্রাপ্তি, ট্যাক্সি ড্রাইভার—যে জানত অরগ্যান কোথায় উঠেছে, তার অনুপস্থিতি, দুর্গে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড, তুল থেকে প্যারিস এক্সপ্রেসে দীর্ঘদেহী পক্ককেশ ডেনিশ ধর্মযাজকের আরোহণ—সবই রিপোর্ট করলেন তিনি।

'মোদ্দা ব্যাপার দাঁড়াল,' ক্লড র‍্যাবো থামতে সুরেত-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কর্নেল প্যাপন ঝাঁঝের সাথে বলল, 'খুনী এখন নতুন নাম, নতুন চেহারা নিয়ে এই প্যারিসেই অবস্থান করছে। আমাদের কারও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো, আপনি আবার ব্যর্থ হয়েছেন, এবং সব গুবলেট করে ফেলেছেন।'

'সমালোচনা পরে হবে,' বাধা দিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'প্যারিসে আজ রাতে বিদেশী পাদ্রীর সংখ্যা কত হতে পারে?'

'সম্ভবত, কয়েকশো, মশিয়ে,' মৃদু গলায় বললেন ক্লড র‍্যাবো।

'সবাইকে চেক করা সম্ভব?'

'সকালে সম্ভব,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'সকাল ন'টার মধ্যে সমস্ত হোটেলের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডি-এস-টি-এর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যাবার কথা।'

কর্নেল প্যাপন তার বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়াবার তাগিদে মস্ত শরীর নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর জলদ গম্ভীর স্বরে বলল, 'প্যারিসের সমস্ত হোটেলে মাঝরাতে, রাত দুটোয় এবং রাত চারটের সময় সশস্ত্র পুলিসকে দিয়ে হামলা পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হোক আমাকে। সে একজন ধর্মযাজক, পেশা প্রসঙ্গে একথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে হয়েছে তাকে, হোটেলের খাতায় এ তথ্য পাওয়া-ও যাবে। সুতরাং তাকে খুঁজে পাওয়া এখন পানির মত সহজ, যদি দায়িত্বটা আমাকে দেয়া হয়।'

কনফারেন্স রূমে উপস্থিত সবার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মৃদু হেসে অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন ক্লড র‍্যাবো। 'সহজ লোক নয় সে, দয়া করে এ-কথাটা কেউ ভুলবেন না। তার প্রতিটি কাজে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পেয়েছি আমি। আলোচ্য প্রসঙ্গেও এ-ধরনের হাস্যকর ভুল সে করবে বলে ভাবতে অনুমতি দিই না আমি নিজেকে। তার ডগ কলারটা সে একটা স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে নেয় যদি, কিংবা যদি গলা থেকে খুলেই ফেলে, এবং মিস্টার অমুক হিসেবে নাম লেখায় হোটেলের খাতায়—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? তার পক্ষে সেটা করাই কি স্বাভাবিক নয়?'

রক্তচক্ষু মেলে কর্নেল প্যাপন তাকিয়ে আছে ক্লড র‍্যাবোর দিকে। আরও অনেককেই অসন্তুষ্ট এবং নিরাশ দেখাচ্ছে।

'এই যখন পরিস্থিতি,' বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, 'মাত্র একটা পথ খোলা আছে আমার সামনে। মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে আবার সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রার্থনা করব আমি। তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন জনসাধারণ্যে দেখা দেবার সমস্ত প্রোগ্রাম এই মুহূর্ত থেকে বাতিল করে দেন, যতক্ষণ না এই দুর্ধর্ষ, বিপজ্জনক লোকটা ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো; আপনি নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী লোকটাকে ধরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। আমি চাই আগামীকাল সকালে প্যারিসে অবস্থানরত প্রত্যেক ধর্মযাজককে ব্যক্তিগতভাবে চেক করা হোক। এ ব্যাপারে সুরেতের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কর্নেল প্যাপনকেও দায়িত্ব দিতে চাই আমি।'

'ধন্যবাদ, মশিয়ে,' চর্বি ভর্তি প্রকাণ্ড মুখে হাসি ফুটল কর্নেল প্যাপনের।

এরপরই সভা ভেঙে গেল।

'লোকটার ক্যালিবার সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?' অফিসে ফিরে এসে নরম সুরে একান্ত সচিবকে প্রশ্নটা করলেন ক্লড র‍্যাবো। উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে নিজেই আবার বললেন তিনি, 'ফেরেশতা বা শয়তান পর্যায়ের লোক সে, বুঝলে, খুবই উঁচু ক্যালিবারের লোক। ভাগ্য যত না, তারচেয়ে বুদ্ধি বেশি সাহায্য করছে তাকে। আর আমাদের কপাল মন্দ, তার সাথে যোগ হয়েছে ভুল ভ্রান্তি। ভুলগুলো সব আমার। কিন্তু এসবের সাথে আরেকটা বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করছি আমি। দু'বার তাকে আমরা কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ধরতে পারিনি। একবার সে শেষ মুহূর্তে ফস্কে গেল গাড়িতে নতুন রঙ চড়িয়ে। দ্বিতীয়বার কি হলো? আলফা রোমিওর সন্ধান পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রেমিকাকে খুন করে দুর্গ ত্যাগ করল সে। দু'বারই এ-ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে রাতের মীটিংয়ে যখনই আমি ঘোষণা করেছি যে তাকে আমরা কোণঠাসা করে ফেলেছি, বারো ঘণ্টার মধ্যে ঝোলায় ভরতে পারব। অথচ পারিনি। কারণ কি, বলো দেখি? কেউ কি সাবধান করে দিচ্ছে তাকে?'

চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চার্লস ক্যারনের।

'মাই ডিয়ার ফেলো,' গম্ভীর ক্লড র‍্যাবো বললেন, 'সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে, সেটা এখন ব্যবহার করতে যাচ্ছি আমি। কিভাবে? শার্লক হোমস

টাইপের কিছু কৌশল খাটাব, এই আর কি।'

'আড়ি পাতার যন্ত্র ব্যবহার করবেন…?'

'অহেতুক প্রশংসা করছি না,' মৃদু হেসে বললেন ক্লড র‍্যাবো, 'ভবিষ্যতে তুমি উন্নতি করবে। ঠিকই ধরেছ। হ্যাঁ, আড়ি পাতব।'

নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে এগিয়ে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। অদূরে তরল রুপোর স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে শ্যেন নদীর পানি। আর একটু দূরে ল্যাটিন কোয়ার্টারের উজ্জ্বল আলোকমালা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে নদীতে। নারী কণ্ঠের সুর-ঝঙ্কার ভাসছে আলোকিত পানির উপর। তিনশো গজ দূরে আরেক লোক তার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল মিনার বিশিষ্ট নটর ডেম-এর বাঁ দিকে ভারিক্কি চেহারার পুলিস জুডিশেয়ার-এর দালানটার দিকে। লোকটার পরনে কালো ট্রাউজার, পায়ে ওয়াকিং শু, গায়ে পোলো সিল্ক সোয়েটার, সেটাকে ঢেকে রেখেছে সাদা শার্ট এবং কালো বিব। তার ঠোঁটে ঝুলছে একটা কিংসাইজ ইংলিশ ফিলটার সিগারেট। মুখটা তাজা, কিন্তু মাথার চুলগুলো বিবর্ণ।

নদীর দু'দিক থেকে দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই প্যারিসের সব গির্জায় ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করল রাত বারোটার ঘণ্টাধ্বনি।

শুরু হলো বাইশে অক্টোবরের প্রথম প্রহর।

আট

রাত দুটো পর্যন্ত গোটা পঞ্চাশেক ফোন করলেন ক্লড র‍্যাবো। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি। কয়েকটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিলেন কোন ডেনিশ পাদ্রী তাদের অফিসে কোন কারণে গেছে কিনা। বুজে বুজে আসছে চোখ, অথচ অফিস ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়—যে-কোন মুহূর্তে জরুরী মেসেজ এসে পড়তে পারে। চার্লস ক্যারনকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন তিনি। এবং সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

আধঘণ্টাও কাটেনি, তাঁর ঘুম ভাঙাল চার্লস ক্যারন।

'দুঃখিত, চীফ,' বলল সে, 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, এই মুহূর্তে আপনার তা জানা দরকার। লোকটার কাছে এখন একটা ডেনিশ পাসপোর্ট রয়েছে, ঠিক কিনা?'

টকটকে লাল চোখ মেললেন ক্লড র‍্যাবো। অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'বলে যাও।'

'সম্ভাব্য মাত্র দুটো উপায়ে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারে সে। হয় চুরি করেছে, নয়তো জাল করেছে। পাসপোর্টের ফটোর সাথে মিল আনার জন্যে চুলের

রঙ বদল করতে হয়েছে তাকে, এ থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে পাসপোর্টটা জাল নয়, চুরি করা।'

'যুক্তিসঙ্গত। গো অন।'

'যতদূর অনুমান করতে পারি আমরা, প্রথমবার রোম থেকে লন্ডনে পৌঁছেছিল সে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং ধরা যাক, পাসপোর্টটা সে লন্ডনেই চুরি করেছে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসলেন ক্লড র‍্যাবো। বললেন, 'প্রস্তুতি নেবার জন্যে প্যারিসেও এসেছিল সে।'

'জ্বী। তার মানে হয় প্যারিস নয় লন্ডন থেকে পাসপোর্টটা চুরি করেছে সে। এখন, প্রশ্ন করা যেতে পারে, পাসপোর্ট চুরি গেলে একজন বিদেশী ধর্মযাজকের কি করা উচিত? নিশ্চয়ই সে সাহায্যের জন্যে তার কনস্যুলেটের কাছে যাবে, ঠিক কিনা?'

'ধন্যবাদ, মাই ডিয়ার বয়। এক্ষুণি তাহলে ফোনে যোগাযোগ করো ম্যালকম লয়েডের সাথে। তারপর ফোন করো প্যারিসের ডেনিশ কন্সাল জেনারেলকে।'

দুই ভদ্রলোককে বিছানা ত্যাগ করে যার যার অফিসে ছুটতে রাজি করাবার জন্যে পুরো এক ঘণ্টা ব্যয় করলেন ক্লড র‍্যাবো। রাত চারটের সময় ন্যাশনাল সুরেত-এর হেডকোয়ার্টার থেকে তাঁকে জানানো হলো, মধ্যরাত পর্যন্ত নয়শো আশিজন পাদ্রীর হোটেল রেজিস্ট্রেশন কার্ড পেয়েছে তারা, সেগুলো বাছাইয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত।

সকাল ছয়টা। এখনও চেয়ারে জেগে বসে আছেন ক্লড র‍্যাবো। তাঁর অত্যন্ত অনুগত একজন সহকারী ফোন করল এই সময়। জানাল, 'চীফ, আপনার অনুমানই সত্যি। টেপে ধরা পড়েছে একটা মেসেজ পাচারের ঘটনা। এক্ষুণি আমাদের ল্যাবরেটরিতে চলে আসুন দয়া করে।'

গাড়ি নিয়ে ছুটলেন ক্লড র‍্যাবো। সাথে চার্লস ক্যারনকেও নিলেন। তাঁর নির্দেশে সাথে কারবাইনটাও নিতে হলো ক্যারনকে।

নিজস্ব ডিপার্টমেন্টের বেসমেন্ট কম্যুনিকেশন ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে একটা টেপ-রেকর্ডিং শুনলেন ক্লড র‍্যাবো। জোরেশোরে ক্লিক করে একটা শব্দের সাথে শুরু হলো, তারপর স্পষ্ট শোনা গেল টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবার আওয়াজ। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তিনি। আওয়াজের সংখ্যা গুনে তিনি বুঝলেন সাত সংখ্যার নাম্বারে টেলিফোন করা হয়েছে। এরপর ফোনের বেল বাজার শব্দ হচ্ছে। একটু পর রিসিভার তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রিসিভার কেউ তুলল বটে, কিন্তু কোন কথা বলল না সে। কথা বলতে শুরু করল প্রথম পক্ষ, যে টেলিফোন করছে।

অত্যন্ত স্পষ্ট কিন্তু নিচু গলায় মেয়েটা বলে চলেছে, 'লুইসা পিয়েত্রো বলছি। নারার নতুন ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে। ফ্রেঞ্চ প্রশাসন এখন একজন ডেনিশ ধর্মযাজককে খুঁজছে। প্যারিসের প্রত্যেক ধর্মযাজককে চেক করা হবে...'

শ্লথ গতিতে ঘূর্ণায়মান টেপের স্পূলের দিকে চিন্তিতভাবে কয়েক সেকেন্ড

তাকিয়ে থাকলেন ক্লড র‍্যাবো। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো।
'কত নম্বরে ফোন করল জানতে পেরেছ?'
'জী, মশিয়ে। Molitor 5900.'
'ঠিকানা?'
অনুগত সহকারী ক্লড র‍্যাবোর হাতে ছোট্ট একটা চিরকুট তুলে দিল। সেটায় চোখ বুলালেন তিনি। দুটো ঠিকানা লেখা রয়েছে কাগজে। একটা ঠিকানা তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। কর্নেল প্যাপনের বাড়ির ঠিকানা। দ্বিতীয় ঠিকানাটা বিদেশী দূতাবাস এলাকার, ঠিকানার সাথে কোন নাম নেই।
'চলো,' মৃদু কণ্ঠে বললেন ক্লড র‍্যাবো।
গাড়িতে ওঠার সময় চার্লস ক্যারন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। 'প্রথমে কোথায় যাব আমরা, চীফ?'
মৃদু হাসলেন ক্লড র‍্যাবো। রহস্য ভাঙলেন না, তা আরও গভীর করে তুললেন তিনি। বললেন, 'এক জায়গাতেই যাব। সান্তিনো ভ্যালেন্টি ওরফে আলেকজান্ডার জেমস কোয়েনটিন অরগ্যান ওরফে পাদ্রী বেনসনের সাথে কথা বলতে।'
দূতাবাস পাড়ার ছোট্ট একতলা বাড়িটায় একা রয়েছেন ক্লড র‍্যাবো। বন্দিনীকে কড়া সশস্ত্র প্রহরায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। দুটো মাত্র কামরা নিয়ে বাড়িটা। একটা সুটকেসে কিছু কাগজপত্র পেয়েছেন তিনি, আর কোথাও কিছু নেই। সেই কাগজপত্রগুলো নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করছেন, এমন সময় প্রত্যাশিত টেলিফোনটা এল। চট করে চোখের সামনে হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখে নিলেন তিনি। সাতটা দশ। মৃদু হাসির রেখা ফুটল তাঁর ঠোঁটে, পরক্ষণে গম্ভীর হলেন। একটু কেশে পরিষ্কার করে নিলেন গলাটা। ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন টাইয়ের নট, চশমাটা একটু ঠেলে জায়গা মত বসিয়ে নিলেন। আশ্চর্য রোমাঞ্চ অনুভব করছেন তিনি। সেই সাথে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুললেন তিনি।
'হ্যালো?'
কণ্ঠস্বর কানে যেতেই মুহূর্তে অনেক কিছু বুঝে নিলেন ঝানু গোয়েন্দা ক্লড র‍্যাবো। ভরাট কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা টের পাওয়া যাচ্ছে। উচ্চারণ ভঙ্গিতে প্রমাণ হয় এ লোক মার্জিত রুচির বুদ্ধিমান লোক।
রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে টেপ-রেকর্ডারের সুইচ অন করলেন ক্লড র‍্যাবো। দ্রুত হাত সরিয়ে নিলেন রিসিভার থেকে। টেপ-রেকর্ডার থেকে বেরিয়ে এল রূপার কণ্ঠস্বর, 'পারু বলছি।'
'নতুন খবর?'
'নেই,' টেপ-রেকর্ডার থেকে রূপা বলছে, 'করেজে পৌঁছে সূত্র হারিয়ে ফেলেছে ওরা।'
বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে ক্লড র‍্যাবোর কপালে। ক্ষীণ একটু সন্দেহের উদ্রেক হলেই যেখানে আছে সেখান থেকে নিমেষে গায়েব হয়ে যাবে লোকটা। বন্দিনী পারুকে বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। চেহারা দেখে এবং দু'মিনিটের

আলাপেই তিনি বুঝে নিয়েছেন বিপদের তোয়াক্কা করার মেয়ে এ নয়, ভয় দেখিয়েও কোন কাজ হবে না—কথা বলতে দিলে কোন সন্দেহ নেই নারাকে ফাঁদটা সম্পর্কে সাবধান করে দেবে সে। এতবড় সুযোগটা ঝুঁকি নিয়ে নষ্ট করতে চাননি তিনি। তাই পারুকে দিয়ে টেপ করিয়ে নিয়েছেন কয়েকটা নির্বাচিত বাক্য। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তাঁর। অপরপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে নারা।

রিসিভার ফেলে দিয়ে উন্মাদের মত ছুটলেন ক্লড র‍্যাঁবো। কামরা থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন তিনি। 'স্টার্ট!' হুঙ্কার ছেড়ে নির্দেশ দিলেন উঠানে দাঁড়ানো পুলিস কার আর ভ্যানগুলোকে। পর মুহূর্তে উঁচু বারান্দা থেকে লাফ দিলেন। 'উহ্—মরে গেছি!' দু'হাত দিয়ে কোমর চেপে ধরে ককিয়ে উঠলেন তিনি। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে চোখ মুখ। পুলিস কার থেকে একজন কনস্টেবল নেমে এল। লোকটা সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে তাকে শুধু মারতে বাকি রাখলেন ক্লড র‍্যাঁবো। 'রেডিও অন করো, ইডিয়ট! টেলিফোন অপারেটর কি বলে শোনো!'

লোকটা ছুটে গিয়ে বসল পুলিস কারের ড্রাইভিং সীটে। হেডফোন জোড়া দুই কানে এঁটে নিয়ে ব্যস্তভাবে সুইচ অন করল সে রেডিওর। 'উহ্-আহ্,' করতে করতে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন ক্লড র‍্যাঁবো। একটু নড়লেই খ্যাঁচ করে ব্যথা লাগছে কোমরের কাছে। কোন রকমে গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি।

ইতোমধ্যে দুটো পুলিস ভ্যান স্টার্ট নিয়েছে। পুলিস কারের ড্রাইভার কান থেকে হেডফোন নামিয়ে পাশে বসা ক্লড র‍্যাঁবোকে জানাল, 'কোয়াই দেস গ্র্যান্ডস অগাস্টিনের কাছে একটা হোটেল থেকে ফোন করা হয়েছে। চিনি আমি...'

'সাইরেন বাজাও!' গর্জে উঠলেন ক্লড র‍্যাঁবো। 'দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছুতে চাই ওখানে।'

স্টার্ট নিয়ে ছোট্ট বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল পুলিস কার। পিছু নিল সাব-মেশিনগানধারী পুলিস ভর্তি দুটো ভ্যান। তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ তুলে ছুটে চলেছে কনভয়টা।

শ্যেন নদীর তীরে ছোট একটা হোটেল। কাঁচ ঘেরা টেলিফোন বুদে দাঁড়িয়ে আছে রানা। নিঃশব্দে রেখে দিল রিসিভারটা। হতভম্ব দেখাচ্ছে ওকে। চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভিতর। নেই? নেই মানে? অসম্ভব! নতুন কোন খবর না থেকেই পারে না। এক জায়গায় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মানুষ কমিশেয়ার ক্লড র‍্যাঁবো নন। তাঁর নেতৃত্বে ফ্রেঞ্চ পুলিসের লোকেরা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে ঈগলটনের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করেছে। সূত্র ধরে হাউতে শেলনেয়ারে পৌঁছানো পানির মত সহজ ব্যাপার। ব্যারনেস সিবার চাকরবাকরদের কাছ থেকে দুর্গে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সব খবরও নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন ক্লড র‍্যাঁবো। রেনোয়া গাড়িটার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠিয়ে তুল-এ সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করতেও বোধহয় বেগ পেতে হয়নি। গাড়িটা পেয়েই তারা স্টেশনের কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এবং নিশ্চয়ই...তাছাড়া, আড়ষ্ট কেন রূপা আজ?

টেলিফোন বুদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে সোজা উপরতলায় উঠে নিজের কামরায় ঢুকল রানা। লাগেজ নিয়ে নেমে এল তখুনি। রিসেপশনের কেরানীকে বলল, 'আমার বিল দিন।'

সাতটা পঁচিশ। কোয়াই দেস গ্র্যান্ডস অগাস্টিন এলাকার ছোট হোটেলটার সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিস কার। সেটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল একটা পুলিস ভ্যান। দ্বিতীয় ভ্যানটা থামল কারের পিছনে। ভ্যান থেকে ঝপাঝপ নামল কারবাইনধারীরা। দেড় মিনিটের মধ্যে পঞ্চাশজন সশস্ত্র পুলিস ঘিরে ফেলল হোটেলটাকে। সাঁইত্রিশ নম্বর কামরাটাকে তছনছ করে ফেলল ওরা।

'দুঃখিত, মশিয়ে,' দুঃখের সাথে নয়, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কথা বলছে হোটেল মালিক, 'পাদ্রী বেনসন মিনিট সাতেক আগে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন...'

আহত কোমরে হাত রেখে ব্যথা সামলাচ্ছেন ক্লড র‍্যাবো। হোটেল মালিকের কথা শুনে হঠাৎ যেন সাংঘাতিক বেড়ে গেছে তাঁর কোমরের ব্যথাটা। চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর। অস্ফুট দুটো শব্দ বেরিয়ে এল শুধু, 'হায় কপাল!'

আটটায় নিজের অফিসে ফিরে এসে ম্যালকম লয়েডের একটা মেসেজ পেলেন ক্লড র‍্যাবো। তথ্য সরবরাহে দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে ম্যালকম লয়েড জানিয়েছে: মশিয়ে, আপনার অনুমানই ঠিক। সেপ্টেম্বরের চোদ্দ তারিখে একজন ডেনিশ ধর্মযাজক পাসপোর্ট হারাবার একটা ঘটনা রিপোর্ট করেছিল ডেনিশ কনস্যুলারের অফিসে। পাদ্রীর সন্দেহ, ওয়েস্ট এন্ডের একটা হোটেল থেকে চুরি গেছে সেটা, কিন্তু তার সন্দেহের পক্ষে সে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। হোটেল ম্যানেজারের অনুরোধে ঘটনাটা সে পুলিসকে জানায়নি। তার পরিচয় কোপেনহেগেনের Pastor Per Benson. বেনসনের দৈহিক বর্ণনা এই রকম: ছয়ফিট লম্বা, নীল চোখ, লোহায় ধরা মরচের মত চুলের রঙ।

রেলওয়ে স্টেশন গার ডি' অস্টারলিজে পৌঁছে থামল ট্যাক্সিটা। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রানা। গত সন্ধ্যায় ট্রেন থেকে এখানেই নেমেছিল ও, ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সাইরেন বাজিয়ে পুলিস কনভয়কে স্টেশনে ঢুকতেও দেখেছিল। স্টেশনে ওকে না পেয়ে ক্লড র‍্যাবো নিশ্চয়ই সার্চ পার্টি অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন, এই ভেবে আজ আবার এখানে পা দিতে সাহস পাচ্ছে ও। মার্ক রোডিনের কাপড়-চোপড়, মিলিটারি গ্রেটকোট এবং রাইফেল ভর্তি সুটকেসটা লেফট-লাগেজ অফিসে জমা দিল ও। সাথের একমাত্র সুটকেসটায় রয়েছে আমেরিকান ছাত্র স্মার্টি টোয়েনের পোশাক-আশাক এবং কাগজপত্র। মেকআপের সরঞ্জাম রেখেছে ও হ্যান্ডগ্রিপটায়।

এখনও কালো স্যুটটা পরে আছে রানা। তবে ডগ কলারটাকে পোলো সোয়েটার দিয়ে ঢেকে রেখেছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ের একটা সস্তা হোটেলে উঠল ও। রেজিস্ট্রেশন কার্ড পূরণ করার দায়িত্বটা ওর উপরই ছেড়ে দিল

ডেস্ক ক্লার্ক। অলস লোকের কাজে খুঁত থাকে, এর বেলায়ও তাই ঘটল। আগন্তুকের পাসপোর্টের সাথে পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা মিলিয়ে দেখল না সে। লোকটার স্বভাব বুঝতে পেরে সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করল রানা। রেজিস্ট্রেশন কার্ডে পাদ্রী বেনসনের নামটা পর্যন্ত উল্লেখ করেনি ও।

নিজের ঘরে ঢুকে মুখ আর চুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। লোহায় মরচে ধরা লালচে রঙ চুল থেকে ধুয়ে বিদায় করল। চুল তার চকচকে কালো চেহারা ফিরে পেল আবার। এর-উপর কলপ লাগাল রানা। স্মার্টি টোয়েনের নারকেল ছোবড়ার মত ব্রাউন চুলের মালিক বনে গেল ও। নীলচে কন্ট্যাক্ট লেন্স জোড়া একই জায়গায় থাকল, কিন্তু গোল্ড রিমের বদলে এল মোটা ফ্রেমের আমেরিকান এগজিকিউটিভ স্পেকট্যাকলস। সুটকেসে চালান হয়ে গেল কালো ওয়াকিং শু, মোজা, শার্ট, বিব এবং ক্ল্যারিক্যাল স্যুট, সাথে গেল কোপেনহেগেনের পাদ্রী বেনসনের পাসপোর্ট। স্নেকার্স, মোজা, জিনস, টি-শার্ট এবং উইন্ডচিটার পরল রানা। ছদ্মবেশ নেয়া পূর্ণাঙ্গ হলো। ও এখন নিউ ইয়র্ক স্টেটের মার্কিন ছাত্র স্মার্টি টোয়েন।

দুপুরের একটু আগে রওনা দেবার প্রস্তুতি শেষ করল রানা। একদিকের ব্রেস্ট পকেটে মার্কিন ছাত্রের পাসপোর্ট রেখেছে ও, আরেক পকেটে ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাঙ্কের এক তাড়া নোট। ধর্মযাজকের সমস্ত জিনিসপত্রে ঠাসা সুটকেসটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছে ওয়ারড্রোবের ভিতর। ওয়ারড্রোবের চাবিটা পানি নিষ্কাশনের ঝাঁঝরি পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হোটেল ত্যাগ করল রানা ফায়ার এস্কেপের পথ ধরে। কেউ জানল না।

কয়েক মিনিট পর গার ডি'অস্টারলিজের লেফট-লাগেজ অফিসে আবার হাজির হলো রানা। হ্যান্ডগ্রিপটা জমা দিয়ে স্লিপ নিল, সেটা প্রথম সুটকেসের স্লিপের সাথে রাখল ব্যাক পকেটে, তারপর বেরিয়ে পড়ল নিজের পথে।

ট্যাক্সি নিয়ে লেফট ব্যাঙ্কে ফিরল রানা। বুলেভার্ড সেন্ট মিচেল এবং রু দে লা হচেটির মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টার এলাকার ছাত্র এবং সতেজ-প্রাণ যুবকদের ঠাসা ভিড়ে মিশে গেল ও।

ফুটপাথ ঘেঁষে খুদে এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেতে ঢুকল রানা। রাতটা কোথায় কাটাবে তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। মনে কোন সন্দেহ নেই যে ইতোমধ্যে ক্লড র‍্যাঁবো ওর ধর্মযাজকের ছদ্ম পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলেছেন। স্মার্টি টোয়েনকেও চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় দেবেন না তিনি।

অসহায় বোধ করছে রানা। কিন্তু এই অবস্থায় হাসিও পেল ওর। কে জানত, ভাবছে সে, যাকে শ্রদ্ধা করি সেই লোকই আজ সবচেয়ে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 'ড্যাম দ্যাট ম্যান, র‍্যাঁবো,' মনে মনে উচ্চারণ করল ও। কিন্তু উজ্জ্বল হাসল সুন্দরী ওয়েট্রেসকে দেখে, বলল, 'থ্যাঙ্কস, হানি।'

বেলা দশটায় প্যারিস থেকে ক্লড র‍্যাঁবোর ফোন পেল ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপার ম্যালকম লয়েড। ফ্রেঞ্চ গোয়েন্দা প্রধানের অনুরোধ বেশ একটু বিচলিত এবং বিরক্ত করল তাকে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে অত্যন্ত সমীহের সাথে কমিশেয়ার ক্লড

র‍্যাবোকে জানাল, 'মশিয়ে, আমার সাধ্য মত সব করব আমি।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে গত হপ্তার তদন্তে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র একজন ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠাল ম্যালকম লয়েড। তাকে বলল, 'ফরাসীরা আবার সাহায্য চাইছে, বুঝলে? আবার তারা হারিয়ে ফেলেছে লোকটাকে। প্যারিসের মাঝখানে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সে। মশিয়ে ক্লড র‍্যাবোর বিশ্বাস, নতুন আরেক ছদ্ম-পরিচয় গ্রহণ করার মাল-মশলা তার সাথে আছে। অর্থাৎ, এর জন্যে নিশ্চয়ই কারও পাসপোর্ট চুরি করেছে সে।'

'আমাদের কাজ হলো লন্ডনের সব ক'টা কনস্যুলেটে ফোন করে ট্যুরিস্টদের পাসপোর্ট চুরি বা হারানোর যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার একটা তালিকা সংগ্রহ করা, কেমন?'

'রাইট। নিগ্রো আর এশিয়ানদেরকে বাদ দিয়ে, শুধু ককেশিয়ানদের তালিকা যোগাড় করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে লোকটার শারীরিক দৈর্ঘ্য জানতে চাই আমি। পাঁচ ফিট আট ইঞ্চির ওপর সব লোক আমাদের সন্দেহের আওতায় পড়বে। নাও, ফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করে দাও কাজ।'

প্যারিস। দৈনন্দিন মীটিংয়ের সময় বেলা দুটোয় এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

সাদাসিধে, অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে তাঁর রিপোর্ট পড়া শেষ করলেন ক্লড র‍্যাবো। কারও মধ্যে উৎসাহ বা আগ্রহের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। নৈরাশ্যে গুম মেরে আছে পরিবেশটা।

'সাক্ষাৎ শয়তান!' অবশেষে ক্রোধ আর হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুখ থেকে, 'লোকটা যেন শয়তানের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে! গোটা ফ্রেঞ্চ প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে, অথচ এখন পর্যন্ত আমরা তার আসল পরিচয় বা চেহারা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। আমাদের জন্যে এ বড় লজ্জার কথা।'

'না, মশিয়ে। সবটা তার ভাগ্য নয়। সবটা আমাদের ত্রুটি বা অযোগ্যতাও নয়।' কথা শেষ করে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন ক্লড র‍্যাবো।

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই তাঁর দিকে।

'প্রতিটি পর্যায়ে কতদূর এগিয়েছি আমরা সে সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর সরবরাহ করা হয়েছে তাকে,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'সেজন্যেই তাড়াহুড়ো করে সে গ্যাপ শহর ত্যাগ করে, সেজন্যেই জাল গুটাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ব্যারনেস সিবাকে খুন করে লা হাউতে শেলনেয়ারের দুর্গ থেকে কেটে পড়ে সে। রোজ রাতে এই সভাকে আমার অগ্রগতির রিপোর্ট পড়ে শুনিয়েছি আমি। তিনবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তাকে আমরা ধরতে পারিনি। পাব্ধ নামের একটি মেয়েকে আজ সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সাথে কথা বলে এখন পর্যন্ত কোন লাভ হয়নি। হয় সে কথা ফাঁস করে দেয়ার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করছে, নয়তো, আসলে সে কিছুই জানে না। সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করে বলছি, আজ সকালে মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি আমি।

প্রেসিডেন্টের হবু হত্যাকারীর সাথে পারুকে কথা বলতে দেয়াই বোধহয় উচিত ছিল। তা না করে পারুর কিছু কথা টেপ করিয়ে নিই আমি, এবং লোকটা যখন ফোন করে তখন টেপ-রেকর্ডার অন করে দিই। লোকটার প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর যা হওয়া উচিত তাই বেরিয়েছে টেপ থেকে, কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে লোকটার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সেই মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করে সে। কয়েক মিনিট পর সেখানে গিয়ে আমরা তাকে পাইনি। এর জন্যে আমি দায়ী। কিন্তু বাকি দুটো ক্ষেত্রে ভোর রাতের দিকে টেলিফোন করে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল তাকে।'

বিস্ময় আর অবিশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই, গোগ্রাসে গিলেছে এতক্ষণ ক্লড র‍্যাবোর প্রতিটি শব্দ, তিনি থামতেও একচুল নড়ল না কেউ। স্পষ্ট বেঈমানীর, বিশ্বাসঘাতকতার, ডাবল-ক্রসিং-এর অভিযোগ করেছেন তিনি।

অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, 'আমার মনে পড়ছে, এর আগেও এ-ধরনের সন্দেহের কথা বলেছেন আপনি, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো। দয়া করে জানাবেন কি, আপনার সন্দেহের পক্ষে কি যুক্তি আছে?'

'সন্দেহ নয়, মশিয়ে। যুক্তিও নয়। আমি বাস্তব ঘটনার কথা বলছি। যা ঘটেছে তার প্রমাণও রয়েছে আমার কাছে।' কথা শেষ করে ছোট একটা পোর্টেবল টেপ-রেকর্ডার কোটের সাইড পকেট থেকে বের করে টেবিলে রাখলেন ক্লড র‍্যাবো। বোতাম টিপে অন করলেন সেটা।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সবার অন্তরাত্মা। না জানি কার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন ক্লড র‍্যাবো।

দম বন্ধ করে শুনছে সবাই। টেপ করা কথোপকথনের সুরটা যান্ত্রিক আর চঞ্চল শোনাচ্ছে। সকলের সম্মোহিত দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারটা। একটু পরই থেমে গেল সেটা। এখনও হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে সবাই। সুরেত-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বিশাল বপু কর্নেল প্যাপনের মুখ থেকে রক্ত নেমে গেছে, ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে চেহারাটা। সামনে থেকে কাগজপত্র তুলে নিজের ফোল্ডারে ভরছে সে। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে তার।

'কার কণ্ঠস্বর ওটা?' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভরাট কণ্ঠস্বর গুঁড়ো করে দিল জমাট নিস্তব্ধতাকে।

চুপ করে থাকলেন ক্লড র‍্যাবো। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কর্নেল প্যাপন। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে একযোগে তাকাল সবাই তার দিকে।

কোটের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কর্নেল। তার কোলা ব্যাঙের মত ফোলা মুখ দেখে ভয় হলো সবার, এই বুঝি ভ্যা করে কেঁদে দিল!

'আ-আমি দুঃখিত, মন্ত্রী মহোদয়।...ওটা আ-আমার একজন বা-বান্ধবীর গলা।...বর্তমানে সে আমার সাথে আ...বসবাস করছে...আ-আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে, নিজের দফতরে ফিরে গিয়ে পদত্যাগপত্র লেখার উদ্দেশ্যে।

সভার বাকি সবাই মাথা নিচু করে যার যার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভেরি ওয়েল, কমিশেয়ার,' শান্ত গলায় বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, 'আপনার বক্তব্য আবার আপনি শুরু করুন।'

নতুন করে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, এবার সে-বিষয়ে কথা বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'আশা করছি, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই লন্ডন থেকে হারানো এবং চুরি যাওয়া পাসপোর্টের তালিকা এসে যাবে। আমরা যাকে খুঁজছি তার সাথে চেহারার মিল পাওয়া যাবে গুটি কয়েক লোকের, এটা আমার ধারণা। যাদের সাথে মিল পাওয়া যাবে লন্ডনে, তাদের দেশের কনস্যুলেটের কাছ থেকে ফটো চাইব। ফটো পাওয়া গেলে মোটামুটি পরিষ্কার একটা ধারণা করা যাবে পাদ্রী বেনসনের বর্তমান চেহারা কি দাঁড়িয়েছে। সান্তিনো ভ্যালেন্টি, অরগ্যান এবং বেনসনের সাথে বর্তমান চেহারাটা বেশ কিছুটা মিলবে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কাল দুপুরের মধ্যে ফটোগ্রাফগুলো পেয়ে যাব বলে আশা করছি।'

'ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা সঙ্কটে পড়ে গেছি,' বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। 'একজন মাত্র লোককে গোটা ফ্রেঞ্চ প্রশাসন তার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেও ধরতে পারেনি বা তার প্রকৃত পরিচয় এখনও জানতে পারেনি—কিভাবে এ খবর দিই প্রেসিডেন্টকে? জনসাধারণ্যে বা প্রকাশ্যে বের না হতে অনুরোধ করব তাঁকে, এমন সাহস আমার নেই। তাছাড়া, এ অনুরোধ তিনি রাখবেনও না। কি যে করি, বুঝতে পারছি না।' একটু বিরতি নিয়ে আবার তিনি বললেন, 'তবে, আরোপিত একটা নিষেধাজ্ঞা এখন তুলে নেয়া যেতে পারে বলে মনে করি। সান্তিনো ভ্যালেন্টি ওরফে অরগ্যান ওরফে বেনসন এখন একজন সাধারণ খুনী। ব্যারনেস সিবাকে তাঁর দুর্গে সে খুন করেছে। দেশময় এটা রটিয়ে দিতে এখন আর কোন বাধা নেই। পুলিস সূত্র থেকে সংবাদপত্রকে জানাতে হবে ব্যারনেস সিবার দুর্গ থেকে মহামূল্যবান অলঙ্কার এবং মোটা অঙ্কের নগদ টাকাও চুরি করে নিয়ে গেছে সে। জানাতে হবে, পুলিস ধারণা করছে হাউতে শেলনেয়ার থেকে প্যারিসের দিকে এসেছে সে, এবং এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। এ ব্যাপারে কারও কিছু বলার আছে?'

লোকটাকে চোর হিসেবে চিহ্নিত করার এই উদ্যোগ পছন্দ হলো না ক্লড র‍্যাবোর। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। ভাবলেন, এর চেয়ে অনেক বড় বিষয়ে মুখ বুজে আছেন তিনি, আরেকটা বিষয়ে চুপ করে থাকলেই বা কি এসে যায়!

কেউই কিছু বলল না দেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আবার বললেন, 'তাহলে আজ বিকেলের পত্রিকাতেই যাক খবরটা। এবং মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো, লোকটার নতুন পরিচয় জানা মাত্র আপনি তা সংবাদপত্রকে জানিয়ে দেবেন, যাতে আগামী কালকের সমস্ত পত্রিকার প্রভাত সংস্করণে খবরটা মেইন হেডিং হয়। সম্ভব হলে একটা ফটোও দেবেন ওদেরকে ছাপার জন্যে।'

খানিক ভাবলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তারপর আবার বললেন, 'লোকটার নতুন নাম জানা মাত্র, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো, সুরেতের প্রতিটি শাখা, গোয়েন্দা বিভাগ, ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজ, পুলিস এবং এমন কি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে আমার নামে নির্দেশ

পাঠাবেন: প্যারিসের প্রতিটি রাস্তায় চেক পোস্ট বসিয়ে প্রতিটি লোকের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে হবে। প্রতিটি বিভাগের সমস্ত হাই অফিশিয়াল এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে দেবার নির্দেশ এখুনি জারি করা হলো। আপাতত এখানেই আজকের সভা…'

'মাফ করবেন, মশিয়ে,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বাধা দিয়ে বলে উঠল অ্যাকশন সার্ভিস চীফ কর্নেল বোল্যান্ড। 'আমার একটা বক্তব্য আছে।'

সবাই তাকাল তার দিকে।

'পারুল নামে যে মেয়েটিকে মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো অ্যারেস্ট করেছেন,' বলল কর্নেল বোল্যান্ড, 'তার মুখ থেকে কথা আদায় করার দায়িত্ব অ্যাকশন সার্ভিস নিতে চায়। এ ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি আছে?'

বিভাগীয় প্রধানরা ছাড়া বাকি সবাই একযোগে সোচ্চার হয়ে উঠল। 'সেটাই উচিত' 'কোন আপত্তি নেই' এই ধরনের মন্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে কামরার চারদিক থেকে।

হতভম্ব দেখাচ্ছে ক্লড র‍্যাবোকে। এর আগের কোন সভায় এরকম দৃশ্যের অবতারণা ঘটেনি। বেশ একটু অবাক হয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বিভাগীয় প্রধানরাও। সাধারণ একটা প্রস্তাবকে এতগুলো লোক এমন হৈ-চৈ করে সমর্থন কেন দিচ্ছে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবশ্য কেউই বুঝল না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্লড র‍্যাবোর দিকে তাকিয়ে আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন ক্লড র‍্যাবো। তারপর বললেন, 'আমার আপত্তি আছে।'

কর্নেল বোল্যান্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্লড র‍্যাবোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাবার এবং বিশাল শরীর নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে আক্রমণাত্মক একটা ভাব ফুটে উঠল। জানতে চাইল, 'কিসের আপত্তি, মশিয়ে? আপনার আপত্তি আমরা মানবই বা কেন? মহামান্য প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে অ্যাকশন সার্ভিস। সেজন্যে আগেই শর্ত আরোপ করা হয়েছে, আপনি প্রেসিডেন্টের হবু খুনীর অবস্থান নির্ণয় করে দিয়েই সরে পড়বেন—তাকে গ্রেফতার এবং জেরা করার দায়িত্ব নেবে অ্যাকশন সার্ভিস। খুনীর সহকারিণী সম্পর্কেও এই শর্ত প্রযোজ্য। মশিয়ে, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সবাই মিলে আপনাকে যে ক্ষমতা আমরা দিয়েছি আপনি তার অপব্যবহার করছেন। এটা অভিপ্রেত নয়। এ প্রসঙ্গে সভাকে আমি জানাচ্ছি, গ্রেফতার করার পর পারুলকে কোথায় রাখা হয়েছে তাও তিনি আমাদেরকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি।'

সংখ্যায় কর্সিকানরা বেশি। চারদিক থেকে তারা সবাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

'এ বড় লজ্জার কথা,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'এমন কথা কেউ কখনও শুনেছেন?' প্রশ্নটা করে বিস্ময়াভিভূত চেহারা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন তিনি। 'অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বুদ্ধি খাটিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে একটা কাজে সাফল্য অর্জন করল একজন, কিন্তু ফলটা ভোগ করতে চায় আরেকজন। হাসব?'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দিকে চোখ পিট পিট করে তাকালেন ক্লড র‍্যাবো। 'নাকি কাঁদব? আপনিই বলে দিন, মশিয়ে।'

আন্তঃ বিভাগীয় উত্তেজনাটা ঠাণ্ডা করার জন্যে মৃদু হাসলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। ক্লড র‍্যাবোর যুক্তি অকাট্য, তাই তাঁকেই সমর্থন করে বললেন, 'হাসুন, মশিয়ে।'

মুহূর্তে রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল কর্নেল বোল্যান্ডের চেহারা। জেদের সুরে বলল সে, 'কিন্তু, মশিয়ে, নিজেই স্বীকার করেছেন পারুর মুখ থেকে কোন তথ্য আদায় করতে পারেননি—সেক্ষেত্রে, পারুকে নিজের আওতায় কেন রাখছেন তিনি? নিশ্চয়ই তার রূপ দেখার জন্যে নয়?'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে।

'অস্বীকার করব না, মেয়েটার রূপ দেখার মতই বটে,' প্রৌঢ় ক্লড র‍্যাবো রসিকতা করতে জানেন, আজ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি। 'বুড়ো মানুষ আমি, তার ওপর চিরকুমার। এই পরিস্থিতিতে কেউ যদি কল্পনায় রঙিন ফানুস ওড়ায়, দোষ দিতে পারি না। কেন নিজের ডিপার্টমেন্টে পারুকে রাখছি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে, মশিয়ে বোল্যান্ড, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। বলুন তো, পারুকে হাতে পাবার জন্যে অ্যাকশন সার্ভিসই বা এত ব্যগ্র কেন?'

'এই মেয়েটাকে ভয় দেখালেই খুনীর পরিকল্পনা জানা যাবে। এই মেয়েটার পেট থেকে কথা আদায় করার ওপর নির্ভর করছে মহামান্য প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা...'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লড র‍্যাবোর চোখ-মুখ। তাই দেখে বিস্ময়ে হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল কর্নেল বোল্যান্ড। সভায় উপস্থিত বাকি সবাইও বোকা বনে গেছে এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপারে ক্লড র‍্যাবোকে সানন্দে হাসতে দেখে।

'আমি আপনার সাথে একমত নই,' গালভরা হাসি নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার সাথে পারুর কোন সম্পর্ক নেই।'

'হোয়াট!' কামরার ভিতর যেন বোমা ফাটল। 'মশিয়ে, আপনি পাগলের মত কথা বলছেন...'

'পাগলামির দেখেছেন কি!' মৃদু মৃদু হাসছেন এখনও ক্লড র‍্যাবো। 'ভাবছি, এখন যে কথাটা বলব তা শুনে কি বলবেন আমাকে?'

'কি...কি বলবেন আপনি?' কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল কর্নেল বোল্যান্ডের।

'বলতে চাই, প্রেসিডেন্ট বিপদগ্রস্ত নন। বলতে চাই, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। বলতে চাই, যে লোকটাকে আমরা খুঁজছি সে প্রেসিডেন্টকে খুন করতে পারবে না। সে প্রেসিডেন্টকে আদৌ খুন করতে চায় কিনা সে ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

বিস্ময়ে, এবং ঘটনার আকস্মিক নাটকীয় মোড় পরিবর্তনে শুধু বোবা বা স্তম্ভিত নয়—উপস্থিত সবাই যেন হার্টফেল করে মারা গেছে। এই মুহূর্তে কেউ যদি সভাকক্ষে প্রবেশ করে, সে দেখতে পাবে জড় পদার্থের মত বসে আছে সবাই, কারও চোখের পাতা বা মণি নড়ছে না, একটু শব্দ নেই কারও তরফ থেকে।

ঘাবড়ে গেছে কর্সিকানরা। তাদের দুশ্চিন্তা, কতটুকু জানে বুড়ো ভাম ক্লুড র‍্যাবো? রানার আসল পরিচয়? তার প্রকৃত উদ্দেশ্য? রূপা কি সব কথা খুলে বলে ফেলেছে এরই মধ্যে? তাই যদি হয়, ফল্‌স পজিশনে পড়ে যাবে কর্নেল বোল্যান্ড। তার তৈরি রিপোর্টেই বলা হয়েছিল ও-এ-এস প্রেসিডেন্টকে খুন করার জন্যে একজন দুর্ধর্ষ অপরিচিত খুনীকে লেলিয়ে দিয়েছে। এখন যদি জানাজানি হয়ে যায় তার রিপোর্ট মিথ্যে বা ভুল ছিল, মন্ত্রী পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। চাকরিটাও হয়তো থাকবে না।

বিপদ টের পেয়ে গেছে কর্নেল বোল্যান্ড। নড়ার শক্তি নেই তার। আক্রমণটা এল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তরফ থেকে।

'মশিয়ে ক্লুড র‍্যাবো,' গমগম করে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন না?'

সোনালী ফ্রেমের চশমাটা নাকের উপর একটু ঠেলে ঠিক মত বসিয়ে নিলেন ক্লুড র‍্যাবো। প্রশান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন, 'সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আমরা জানি, নতুন ছদ্মবেশ এবং ছদ্ম পরিচয় নিয়ে পাদ্রী বেনসন এখন প্যারিসেরই কোথাও আছে। মহামান্য প্রেসিডেন্ট কোথায় আছেন? শহর থেকে একশো পঁচিশ মাইল দূরে, তাঁর নিজস্ব শ্যাতোয়।'

'এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। তিনি বিশ্রাম শেষ করেই আবার প্যারিসে ফিরে আসবেন।'

'আসবেন। তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারির সাথে কথা বলে জেনেছি, আজ রাতেই ফিরবেন তিনি। রাত সাড়ে ন'টায়। প্যারিসের কোথায়, তা কেউ জানেন আপনারা?' প্রশ্নটা করে সকলের দিকে উৎসুক নয়নে একবার করে তাকালেন ক্লুড র‍্যাবো।

কেউ জানে না, সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন ক্লুড র‍্যাবো। 'দুঃখের বিষয়, আমাদের এই সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি নেই। আরও দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনারা সবাই ফ্রান্সের এক একজন রথী-মহারথী হলেও, দেশের মাথা সম্পর্কে সাধারণ খবরটুকুও মনে রাখেন না। আপনাদের সকলের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আজ থেকে এক বছর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের শীর্ষ সম্মেলনের একটা তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ওয়াশিংটনে আগামীকাল সেই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট প্যারিসের অরলি এয়ারপোর্টে পৌঁছুবেন রাত সাড়ে ন'টায়। এর কয়েক মিনিট পর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিমানে করে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন।'

'আরে, তাই তো!' ঘোর ভাঙতেই কে যেন অস্ফুটে বলে উঠল।

এক পলকেই মনে পড়ে গেছে কথাটা সবার। জানা ছিল, কিন্তু মনে ছিল না কারও।

'সেন্সর আরোপ করে প্রেসিডেন্টের রওনা হবার খবরটা আগাম ছাপতে দেয়া হয়নি,' বললেন ক্লুড র‍্যাবো। 'আগামীকাল সকালের সমস্ত পত্রিকার প্রভাত সংস্করণে শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবার খবরটা ছাপা হবে।'

'প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ একথা আজ সাড়ে ন'টার আগে পর্যন্ত আপনি বলতে পারেন না…'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে ক্লড র‍্যাবো বললেন, 'পারি। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ আজ সাড়ে ন'টা পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দিকটা দেখছে। প্রেসিডেন্টের গাড়িতে বুলেট প্রুফ কাঁচ লাগানো হয়েছে। তাঁর শ্যাতো ঘিরে রেখেছে যোয়ানরা। এয়ারপোর্টে তিনি আসবেন এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টারে চড়ে। চব্বিশ ঘন্টা আগে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত বিমানটাকে পাহারা দেবার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের পাঁচশো গজের মধ্যে অবাঞ্ছিত কেউ ঘেঁষতে পারবে না, এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি।'

'তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ও-এ-এস-এর ভাড়াটে খুনীর উদ্দেশ্য কি?' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সবিনয়ে জানতে চাইলেন। 'সে কি প্রেসিডেন্ট ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?'

'জানি না। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন যাবেন, এ খবর তার অজানা থাকার কথা নয়। ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করবে, এও সম্ভব নয়। অপেক্ষা করার ঝুঁকি না নিয়ে আরও দেরি করে ফ্রান্সে ঢুকলেই তো পারত সে। সেজন্যেই সন্দেহ করছি, প্রেসিডেন্টকে খুন করার কোন উদ্দেশ্য হয়তো নেই লোকটার। তবে, এ কথাও বলছি, আমার সন্দেহের পক্ষে কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারব না আমি এই মুহূর্তে।'

'মেয়েটার কাছ থেকে কিছুই জানা যাচ্ছে না?'

'আমার ডিপার্টমেন্ট চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'এই মুহূর্তেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাকে। তবে, আগেই বলেছি, সব কথা বলার চেয়ে মৃত্যুকেই বোধহয় শ্রেয় জ্ঞান করবে, এই ধরনের মেয়ে পারু। অথবা, সবটুকু সে জানে না।'

'সেক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্ট রওনা হবার আগ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারি না আমরা,' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন। 'তিনি রওনা হবার পরও ব্যাপারটা চুকে যাচ্ছে না। এই লোক প্রেসিডেন্ট এবং রাষ্ট্রের জন্যে একটা হুমকি, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, সে ঘৃণ্য একটা খুনী। একে আমরা চাই। এর বিচার হবে।'

সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো একটু পরই। ক্লড র‍্যাবো কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, পিছন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, 'মশিয়ে, একটা কথা। কর্নেল প্যাপনের টেলিফোনে আড়ি পাততে হবে তা আপনি জানলেন কিভাবে?'

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রৌঢ় ক্লড র‍্যাবো। বললেন, 'জানতাম না। তাই গত রাতে আপনাদের সবার টেলিফোনে আড়ি পাতার আয়োজন করেছিলাম আমি।'

'লুইসা পিয়েত্রো এখন কোথায়?'

'তাকে ধরা যায়নি। আত্মহত্যা করেছে।' প্রৌঢ় গোয়েন্দা ছোট ছোট পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

বাইরে অপেক্ষা করছে একান্ত সচিব চার্লস ক্যারন। ক্লড র‍্যাবো তাকে

বললেন, 'একটা কথা, মানে…'

চীফকে সঙ্কুচিত হতে দেখে অবাক হয়ে গেল চার্লস। 'কি কথা, চীফ?'

'মানে,' ইতস্তত করছেন ক্লড র‍্যাবো, 'বলছিলাম কি, আমার মেয়ে পদেমাকে যে রসুনের চাটনি…'

'প্রায়ই তো সে ওই চাটনির কথা তোলে! আর কি যে প্রশংসা করে…'

'না, মানে, বোতলটা খালি হয়ে আছে কিনা…'

'না, চীফ, এখনও অর্ধেকটার মত আছে…'

'তাহলে,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে ক্লড র‍্যাবো বললেন, 'ধার হিসেবে ওটুকু যদি দেয় সে,…কথা দিচ্ছি, আরও কয়েক বোতল তৈরি করে দেব…হাতে এখন সময় নেই কিনা…'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' ব্যস্ত হয়ে বলল চার্লস। 'অফিসে ফিরেই ফোন করে আনিয়ে নিচ্ছি।' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবল, এ কেমন হলো! একজনকে শখ করে দেয়া, তাও আবার খাবার জিনিস, ফিরে চাওয়ার কি মানে? বয়স বেশি হলে জিভের লালচ অদম্য হয়ে ওঠে, কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়!

সেদিন বিকেল পাঁচটা। প্লেস দে আই' অদেনের অদূরে একটা কাফে। খোলা চত্বরে বসে আছে রানা। সামনে বিয়ার ভর্তি গ্লাস। দু'একবার চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে দিয়েছে ও। তিক্ত, কটু লাগছে। গাঢ় রঙের চশমা পরে বহুদূর পর্যন্ত দৃশ্যমান দু'দিকের রাস্তার উপর অলস ভঙ্গিতে মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই রাজ্যের দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। কোথায় রাত কাটাবে সে? হোটেলে? না। রাত শেষ হবার আগেই ওর এই নতুন ছদ্ম পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলবেন ক্লড র‍্যাবো।

সিগারেট ধরাল রানা। নিজের চারদিকটা ধীরেসুস্থে দেখে নিল একবার। ওর চোখের চশমাটা সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করছে না, আরও অনেকেই চশমা পরে রয়েছে।

দ্বিতীয় টান মারতে যাবে সিগারেটে, কি ভেবে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। ঠোঁটের কাছ থেকে হাতটা নামিয়ে নিল রানা। মনের ভিতর একটা অসন্তোষ ভাব সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কারণটা কি ধরতে পারছে না ও। মনের ভিতর বাস করেন একজন সর্বদর্শী, তাঁর তরফ থেকে রীতিমত তিরস্কার করা হচ্ছে তাকে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। ভাবছে। কোথাও কোন ভুল করেছে কি সে? দেখতে পাওয়া উচিত, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না, এমন কোন বিপদ কাছে চলে এসেছে? রাস্তার ডানদিকে তাকাল রানা। তারপর বাঁ দিকে। এদিক থেকে ওদিকে দৃষ্টি সরাবার ফাঁকে কাফেতেও দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার। তাকিয়ে নেই কেউ ওর দিকে। বাঁ দিকের রাস্তায় যানবাহনের ভিড়ই বেশি, পথিক নেই বললেই চলে। একটা পুলিস কনভয় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এটা নিয়ে পাঁচটা পুলিস কনভয় চোখে পড়ল ওর। ক্লড র‍্যাবো চুপ করে বসে নেই, এ সম্ভবত তারই আলামত। রাস্তার দূর প্রান্তে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিছনে জোড়া লাগানো

একটা ট্রেইলর। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একটা দম্পতি দূর পাহাড়ে বা সাগরবেলায় বেড়াতে যাচ্ছে। ইউরোপীয়ানদের এই এক মজার বেঁচে থাকার ধরন। দু'চার দিনের ছুটি পেলেই হয়, গাড়ির পিছনে ট্রেইলর জুড়ে তাতে গোটা সংসার চাপিয়ে রওনা হয়ে যায় দূরে কোথাও, প্রকৃতির মাঝখানে খোলা আকাশের নিচে ছুটিটা কাটিয়ে আসে। হঠাৎ চমকে উঠল রানা, পরমুহূর্তে খুশির একটা ঢেউ বয়ে গেল দেহ-মন-জুড়ে। বাহ্! কী সুন্দর সমাধান বেরিয়ে গেছে তার সমস্যার। রাত কাটানো এখন পানির মত সহজ হয়ে গেল। সবদিক থেকে নিরাপদ, সন্দেহের উর্ধ্বে, নিখুঁত একটাই মাত্র উপায় আছে ওর জন্যে, সেটা দেখেও দেখতে পাচ্ছিল না ও। সর্বদর্শীর তিরস্কারের অর্থ বোঝা গেল এতক্ষণে।

সেদিন বিকেল ছ'টা। ফ্রান্সের সমস্ত দৈনিক পত্রিকা তাদের সান্ধ্য সংস্করণের হেডিং বদল করল। সর্বশেষ সংস্করণে বড় বড় কালো হরফে হেডিং ছাপা হলো: পরমা সুন্দরী ব্যারনেস সিবা খুন!

প্যারিসের একটা পার্টিতে নাচছে সিবা, বছর কয়েক আগে তোলা তার একটা ফটো সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। হেডিংয়ের নিচে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা।

রাস্তায় ছুটোছুটি করে হকাররা বিক্রি করছে পত্রিকা। 'ব্যারনেস সিবা খুন!' তাদের এই চিৎকারে প্যারিসের অলিগলি মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু রানার কানে এসব কিছুই পৌঁছল না। চার দেয়ালের ভিতর নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত এখন ও।

রাত আটটা। লন্ডন থেকে ফোন এল ম্যালকম লয়েডের। তার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত শোনাল। কিছু কনসুলেট উৎসাহের সাথে সহযোগিতা করেছে, ক্লড র‍্যাবোকে জানাল সে, কিন্তু অধিকাংশ কনসুলেটের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে তাকে।

গত পঞ্চাশ দিনে মেয়েমানুষ, নিগ্রো, এশিয়াটিক এবং বেঁটে বামুনরা ছাড়া আটজন বিদেশী পুরুষ-ট্যুরিস্ট লন্ডনে তাদের পাসপোর্ট হারিয়েছে। ক্লড র‍্যাবোর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, হ্যাঁ, তালিকায় এদের প্রত্যেকের নাম, চেহারার বর্ণনা এবং পাসপোর্ট নম্বর টুকে নিয়েছে সে।

'এবার আসুন,' ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে বলল ম্যালকম লয়েড, 'এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা যাক। তিনজন তাদের পাসপোর্ট হারিয়েছে এমন এক সময়ে, যখন সান্তিনো ভ্যালেন্টি লন্ডনে ছিল না বলে জানি আমরা। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে এয়ারলাইন্স বুকিং এবং টিকেট বিক্রির রেকর্ড চেক করে জানতে পেরেছি আঠারোই সেপ্টেম্বরের সান্ধ্য ফ্লাইটে চড়ে সে কোপেনহেগেন যাবার উদ্দেশ্যে। BEA-এর সূত্র অনুযায়ী ব্রাসেলসে তাদের কাউন্টার থেকে একটা টিকেট কেনে সে নগদ টাকায়, এবং লন্ডনে ফিরে আসে অক্টোবরের ছয় তারিখে।'

'রাইট,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'আমরা আবিষ্কার করেছি লন্ডন ত্যাগ এবং আবার লন্ডনে ফিরে আসার মাঝখানের একটা সময় সে প্যারিসে কাটিয়েছিল।

বাইশে সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।'

'তাহলে এই তিনজনের পাসপোর্ট চুরি করেনি সে, ধরে নিতে পারি,' বলল ম্যালকম লয়েড। 'বাকি পাঁচজনের মধ্যে একজন অস্বাভাবিক লম্বা, ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি—তার মানে, আপনাদের ভাষায় দুই মিটারেরও বেশি। লোকটা ইটালিয়ান, তাই পাসপোর্টে তার শারীরিক বর্ণনা মিটার এবং সেন্টিমিটারে উল্লেখ করা হয়েছে, যা একজন ফ্রেঞ্চ কাস্টমস অফিসার পানির মত সহজে বুঝবে। এই পাসপোর্ট যদি ছয় ফিট লম্বা একজন লোকের কাছে থাকে, অফিসারের সন্দেহ হবেই। সুতরাং এ-ধরনের ঝুঁকি নেবে না খুনী। তার মানে, এই তালগাছের পাসপোর্টও চুরি করেনি সে।'

'বাকি থাকে চারজন।'

'এদের মধ্যে একজন অস্বাভাবিক মোটা। দুশো বিয়াল্লিশ পাউন্ড। এর পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হলে খুনীকে এত বেশি প্যাডের সাহায্য নিতে হবে যে হাঁটতেই পারবে না সে।'

'একেও বাদ দেয়া যায়।'

'অপর একজন বুড়ো। এর উচ্চতা খুনীর সাথে মেলে, কিন্তু বয়স সত্তর। ছদ্মবেশ নিয়ে এতটা বয়স বাড়ানো হয়তো সম্ভব, কিন্তু এর জন্যে তাকে সত্যিকার একজন থিয়েট্রিকাল মেক-আপে এক্সপার্ট লোকের সাহায্য নিয়ে মুখের জিওগ্রাফী বদলে নিতে হবে।'

'একেও বাদ দিন,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'বাকি থাকল মাত্র দু'জন।'

'এরা একজন নরওয়েজিয়ান, একজন আমেরিকান। খুনীর শারীরিক বর্ণনার সাথে মিল আছে দু'জনেরই। লম্বা, চওড়া কাঁধ, বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। নরওয়েজিয়ানের চুলের রঙ সোনালী। তাই ভাবছি, এর পাসপোর্ট খুনী চুরি করবে বলে মনে হয় না। অরগ্যানের চুল সোনালী ছিল, আবার কি সে চুল সোনালী করার ঝুঁকি নেবে? মনে হয় না। আরেকটা কথা। নরওয়েজিয়ান জানিয়েছে, বান্ধবীকে নিয়ে টেমস নদীতে নৌকা বিহারের সময় পাসপোর্টটা পকেট থেকে পানিতে পড়ে গেছে বলে সন্দেহ করে সে। অপরদিকে আমেরিকান ছাত্রটি লন্ডন এয়ারপোর্টের পুলিসকে শপথ করা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছে এয়ারপোর্টের মেইন হলে পোর্টারের খোঁজে মুহূর্তের জন্যে অন্যদিকে তাকিয়েছিল সে, পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখে তার হ্যান্ডগ্রিপটা নেই। এটাতেই ছিল তার পাসপোর্ট। এবার বলুন, মশিয়ে, কি ভাবছেন আপনি?'

'মার্কিন ছাত্রটির নাম?'

'স্মার্টি টোয়েন।'

'স্মার্টি টোয়েন সম্পর্কে সমস্ত তথ্য,' বললেন ক্লড র‍্যাবো, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দিন এখানে। ওয়াশিংটনের পাসপোর্ট অফিস থেকে ওর একটা ফটো যোগাড় করে নিচ্ছি আমি। ধন্যবাদ, মশিয়ে লয়েড, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। যে-কোন সময়, যে-কোন ব্যাপারে আমার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অধিকার পাওনা হয়েছে আপনার।'

সেদিন রাত দশটা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমে দ্বিতীয়বার মীটিং বসেছে। সবচেয়ে কম সময় স্থায়ী হলো মীটিংটা। এর এক ঘণ্টা আগেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ব্যারনেস সিবার হত্যাকারী স্মার্টি টোয়েনের মিমিওগ্রাফ করা বিশদ বিবরণের কপি পেয়ে গেছে। রাতের মধ্যে তার একটা ফটো পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পত্রিকাগুলোর প্রভাত সংস্করণে তা ছাপা হবে।

এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন ক্লড র‍্যাবো। মীটিং শুরু হলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সকলকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'এখানে উপস্থিত আমরা সবাই একমত হয়ে স্থির করেছিলাম যে ও-এ-এস-এর ভাড়াটে আততায়ীর পরিচয় এবং অবস্থান জানতে হলে আমাদের দরকার একজন প্রতিভাবান গোয়েন্দা। ফ্রান্সের গর্ব, বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা মশিয়ে ক্লড র‍্যাবোর জন্ম দিয়েছে সে। এবং আমাদের সৌভাগ্য, তাঁর অমূল্য সহযোগিতা পেয়েছি আমরা।' একটু বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার শুরু করলেন। 'মশিয়ে ক্লড র‍্যাবোর কৃতিত্ব কতটুকু, নতুন করে তা ব্যাখ্যা করা দরকার করে না। তবু, কিছু কিছু কথা স্মরণ করার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। এক কথায়, একের পর এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা টপকে আমাদেরকে তিনি চমকিত করেছেন। প্যারিসের বাইরে না গিয়ে, আততায়ীর পিছু ধাওয়া না করে তিনি নির্ভুলভাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন সান্তিনো ভ্যালেন্টি পরিচয় বদলে অরগ্যান হয়েছে, অরগ্যান থেকে বেনসন হয়েছে, এবং বেনসন থেকে হয়েছে স্মার্টি টোয়েন। তাঁর তদন্তের অগ্রগতির সমস্ত খবর এই কনফারেন্স রুম থেকে আততায়ীর কাছে ফাঁস করে দেয়া সত্ত্বেও তিনবার তিনি লোকটার অস্থায়ী আস্তানায় হানা দিতে সক্ষম হন, এবং প্রতিবারই মিনিট কয়েকের জন্যে তাকে ধরতে ব্যর্থ হন। তাঁর সর্বশেষ কৃতিত্ব হলো আততায়ীর সর্বশেষ ছদ্ম পরিচয় আবিষ্কার করা। এখন আমরা তার নাম জানি, চেহারা কেমন জানি, জানি এই শহরের গণ্ডির ভিতরই কোথাও আছে সে।' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ক্লড র‍্যাবোর দিকে ফিরলেন। 'মশিয়ে, আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

ছোটখাট মানুষটা, ক্লড র‍্যাবো, জড়সড় হয়ে বসে আছেন। এমনিতে সাংঘাতিক লাজুক মানুষ তিনি, তার উপর কেউ তাঁর প্রশংসা শুরু করলে এমন লাল হয়ে ওঠেন যে তাঁর চেহারাটা তখন দেখার মতই হয় বটে! চুরুটটা ধরে আছেন তিনি দু'আঙুলের ফাঁকে, ধরাবার জন্যে হাত নাড়বেন সে-সাধ্য তাঁর কেড়ে নিয়েছে সঙ্কোচ।

'মশিয়ে ক্লড র‍্যাবোর যাদু স্পর্শে,' সকলের দিকে ফিরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আবার শুরু করলেন, 'গোটা পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের অনুকূলে এবং আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে। আমরা এখন আততায়ীর নাম জানি, চেহারার বর্ণনা জানি, তার পাসপোর্টের নাম্বার জানি, পাসপোর্টে উল্লেখ করা তার জাতীয়তা জানি। আর ঘণ্টা কয় পর আমরা তার ফটো পাব। আমার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, আপনাদের সবার

ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাকে আমরা মুঠোর ভিতর নব। ইতিমধ্যেই প্যারিসের প্রতিটি পুলিস, সি-আর-এস-এর প্রত্যেক সদস্য, এসপিওনাজের সকল এজেন্ট, সুরেত-এর সমস্ত লোক, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রত্যেক গোয়েন্দাকে আলাদা আলাদা ভাবে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক কি করতে হবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। রাত পোহাবার আগেই, কিংবা খুব বেশি হলে আগামীকাল দুপুর নাগাদ প্যারিসের কোথাও জায়গা পাবে না সে লুকাবার।

'এবং আবার একবার আপনাকে অভিনন্দন জানাই, মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো। সেই সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি ঘোষণা করছি, তদন্তের গুরুভার এবার নামিয়ে নেয়া হলো আপনার কাঁধ থেকে। শেষের এই পর্যায়ে আপনার অমূল্য সহযোগিতা আর আমাদের দরকার নেই। আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন, এবং পালন করেছেন তুলনাহীন দক্ষতার সাথে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কথা শেষ করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

কি যে ঘটে গেল, পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেননি যেন ক্লড র‍্যাবো। ছোটখাট, নরম মেজাজের নির্বিরোধী মানুষটাকে সাংঘাতিক বোকা বোকা দেখাচ্ছে। কয়েকবার চোখ পিট পিট করলেন তিনি। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইতস্তত করছেন। এখনও যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না ব্যাপারটা। সত্যিই কি এরা তাঁকে দূর করে দিচ্ছে? সবচেয়ে জটিল এবং শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে? এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। দেখলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। হাসছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্লড র‍্যাবো।

নয়

সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর কাফে থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল ধীর পায়ে। ঘণ্টাখানেক আগে রাস্তার শেষ প্রান্তের বাড়িটা থেকে গোটা পরিবার ট্রেইলরে চড়ে রওনা হয়ে গেছে। কবে ফিরবে আবার তারা জানা নেই ওর, তবে যাত্রার আয়োজন লক্ষ করে যতদূর ধারণা করা যায়, হপ্তাখানেকের মধ্যে ফিরছে না। ভিজে বিড়ালের মত হেঁটে গেল ও বাড়িটার সামনে দিয়ে। আড়চোখে দেখে নিল সদর দরজায় তালা ঝুলছে। নিচু বাউন্ডারি ওয়ালের ওপারে বাড়িটার সবগুলো জানালা দরজা বন্ধ। কোথাও এতটুকু আলোর আভাস নেই। ডানপাশে ছোট্ট একটা প্যাসেজ, বাঁক নিয়ে সেটা বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে। সুড়ুৎ করে গলিমুখের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। ভিজে বিড়াল হঠাৎ নেকড়ে হয়ে উঠল। বিশ গজ লম্বা প্যাসেজটা হন হন করে হেঁটে মেরে দিল রানা। বাঁক নিতেই পিছনে চলে এল। এদিকেও খুব নিচু পাঁচিল, পাঁচিলের ওপারে ফুলের বাগান।

পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা। সিগারেট ধরাচ্ছে। এই ফাঁকে দ্রুত দেখে নিল চারদিকটা। সরু গলিতে একা ও। উল্টো দিকের বাড়িগুলোর পিছনের বাগান, এবং বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। বাগানে কেউ নেই। আর বাগানের ওপারে বাড়িটাকে আড়াল করে রেখেছে গাছপালা।

কেউ দেখছে না ওকে, তাই সিগারেট ধরাবার ঝুঁকিটা নিল না রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসল বুক সমান উঁচু পাঁচিলের উপর, আরেক লাফ দিয়ে নামল বাগানের নরম মাটিতে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে বাড়িটাকে কেন্দ্র করে ঘুরে এল একবার রানা। নিশ্চিত হলো, মানুষ বা একটা কুকুর বিড়ালও নেই। কিচেনের জানালার সামনে এসে থামল ও। শার্সি খুলতে দুই মিনিটের বেশি লাগল না।

বাড়িটা একতলা, তবে ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। কিচেনের মেঝেতে নেমে প্রথমে জানালাটা বন্ধ করল রানা। মিটসেফ আর ফ্রিজ পরীক্ষা করল। একজন লোকের তিন দিনের জন্যে যথেষ্ট খাবার রয়েছে দেখে এতই খুশি হলো যে মনে মনে মস্ত এক স্যালুট ঠুকে দিল ভাগ্যকে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না। দুটো শোবার ঘর, একটা বৈঠকখানা। টিভি এবং রেডিও দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল ও।

দেরাজ হাতড়ে একটা পেন্সিল টর্চ পেয়ে গেল রানা। সেটা জেলেই রাতের খাওয়াটা সেরে নিল। ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে অন করল টিভি। নব ঘুরিয়ে স্তব্ধ করে দিল সাউন্ড। শুধু ছবি ফুটে উঠল টিভির পর্দায়। গানের অনুষ্ঠান চলছে। সেটটা অফ করে দিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এল ও।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি না কামিয়েই শাওয়ার সারল রানা। কিচেনে ঢুকে টুলের উপর বসল পা ঝুলিয়ে। দক্ষ, অভ্যস্ত বাবুর্চীর ভঙ্গি ফুটে উঠল তার ব্রেকফাস্ট তৈরির ব্যস্ততার মধ্যে। অবশ্য গরম বাটার অয়েলে হাত পুড়ে যেতেই 'দুত্তোরি ছাই' বলে তিরস্কারও করল নিজেকে। এসব মেয়েলি কাজ কি পুরুষকে সাজে? অমনি সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা ভেসে উঠল মানসপটে। হঠাৎ বাচ্চার কান্না শুনে রান্নাঘর থেকে পাখির মত উড়ে বেরিয়ে আসছে সোহানা শাড়ির আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে, এই ছবিটা প্রায়ই মনের পর্দায় এঁকে নিয়ে বিভোর হয়ে দেখে ও। আর চিন্তা করে, এই ছবিটা সত্যিই কি কোনদিন তার জীবনে জলজ্যান্ত বাস্তব হয়ে উঠবে? বুকের ভিতর থেকে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। ভাবল, রাতারাতি তার জীবনটা যদি নিষ্কণ্টক হয়ে উঠত, যদি হঠাৎ করে সমস্ত বিপদের ভয় দূর হয়ে যেত—কি ভালই না হত! কিন্তু তা কোনদিন হবার নয়। শুধু কি তাই? সেরকম নির্বিঘ্ন জীবন ও নিজেও কি চায়? না চায় না। রোমাঞ্চ, ভয়, বিপদ এবং সোহানা, এই চার প্রেয়সীর কাউকে কারও চেয়ে কম ভালবাসে না ও। অথচ প্রথম তিন প্রেয়সীর সাথে শেষ প্রেয়সীর সহাবস্থান সম্ভব নয়। তাতে দুই পক্ষের সম্পর্ক দাঁড়ায় সতীনের মত।

এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কত আর বয়ে যেতে দেয়া যায় সময়কে। সমস্যার ফয়সালা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখে ব্রেকফাস্ট সেরে বৈঠকখানায় ফিরে

এল রানা। বুক কেস থেকে ক'টা বই নামাল। উল্টে পাল্টে বইগুলো দেখার ফাঁকে রিস্টওয়াচ দেখল দু'বার। বেলা এগারোটায় অন করল টেলিভিশন।

টিভির পর্দায় ঘোষকের ছবি ফুটে উঠল। নব ঘুরিয়ে সাউন্ড বাড়াল রানা। দু'চারটে শব্দ কানে ঢুকতেই ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ব্যারনেস সিবা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে খুন হয়েছেন, ঘোষক জানাচ্ছে, এখনও তাঁর হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে তাকে অবশ্যই গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

পরমুহূর্তে টিভির পর্দা জুড়ে অন্য এক লোকের মুখ ফুটে উঠল। সুদর্শন এক যুবকের চেহারা। মাথায় নারকেল ছোবড়ার মত ব্রাউন রঙের চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। নেপথ্য থেকে আসছে ঘোষকের কণ্ঠস্বর, 'এখন যে লোকটার ফটো পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই-ই হলো ব্যারনেস সিবার হত্যাকারী। এর বর্তমান পরিচয়—মার্কিন ছাত্র, নাম স্মার্টি টোয়েন। আপনারা কেউ যদি এই লোককে কোথাও দেখেন, বা এর সম্পর্কে যদি কোন খবর জানা থাকে...'

সোফা থেকে উঠে কার্পেটের উপর পায়চারি করছে রানা। এই মুহূর্তে নিজের বিপদের কথা ভুলে গেছে ও। কিভাবে মারা গেছে সিবা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। এই নিষ্প্রয়োজন মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণ নিজেকে দায়ী করছে ও। গভীর রাত পর্যন্ত হুইস্কি খেয়েছিল ওরা। এই অবস্থায় বেশি ডোজের ঘুমের ওষুধ নিলে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা। জানা ছিল রানার। কিন্তু কথাটা তখন মনে পড়েনি। মনে পড়লে সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারত। সিবা হয়তো এভাবে মারা যেত না। ভাবতে গিয়ে বিস্মিত হচ্ছে রানা, শুধু ওর কাছে বিশ্বস্ত থাকার জন্যে এমন একটা কাণ্ড করে বসল মেয়েটা, পরিণামে চলেই গেল দুনিয়া থেকে। দুঃখ হচ্ছে রানার।

সোফায় ফিরে এসে বসল আবার রানা। টিভি অফ করে দিয়ে সিগারেট ধরাল। কোলের উপর তুলে নিল একটা বই।

দুটো দিন এই বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতে হবে ওকে।

দু'দিন ধরে গোটা প্যারিস তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো। সস্তা দরের হোটেল থেকে শুরু করে পাঁচ তারা মার্কা বিলাসবহুল প্রত্যেকটি হোটেল, বেশ্যাপাড়া, পেনসন এবং বোর্ডিং হাউজ, হোস্টেল, বার, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে এবং কাফেতে হানা দিল সশস্ত্র পুলিস। প্রতিষ্ঠানের মালিক, ম্যানেজার, কর্মচারী এবং গেস্টদেরকে আলাদা আলাদা করে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখানো হলো স্মার্টি টোয়েনের ফটো। জিজ্ঞেস করা হলো, এই লোককে বা এই লোকের সাথে চেহারার মিল আছে এমন কাউকে তারা দেখেছে কিনা অথবা এর সম্পর্কে কারও কাছে কিছু শুনেছে কিনা। একই জায়গায় কিছু সময়ের ব্যবধানে বারবার হানা দিল একের পর এক বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। ফ্রেঞ্চ এসপিওনাজ বিদায় নিতেই ঢুকল অ্যাকশন সার্ভিসের বদমেজাজী সদস্যরা। বিস্ময় আর অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল গোটা প্যারিস। তিনশো বত্রিশজন লোককে পুলিসের ভ্যানে তুলে নিয়ে

যাওয়া হলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। কারণ হত্যাকারীর সাথে কিছুটা মিল রয়েছে তাদের চেহারার। পরে অবশ্য নিঃসন্দেহ হয়ে এদের সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হয়।

প্যারিসের রাস্তায় বেরিয়েছে এমন সমস্ত ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার এবং বাসকে দু'এক মাইল পর পর একবার করে দাঁড় করানো হলো। গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল প্রতিটি প্যারিসবাসীর। পুলিস কাগজপত্র পরীক্ষা না করে ছাড়ল না কাউকে। প্যারিস থেকে বেরিয়ে যাবার প্রতিটি রাস্তায় রোড ব্লকের পিছনে সাব-মেশিনগানধারী অ্যাকশন সার্ভিসের লোকেরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ওদিকে ইউনিয়ন কর্সের দুই লক্ষের উপর সদস্য বিশেষ জরুরী নির্দেশ পেয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত, শিকারী হাউন্ডের মত শহর চষে বেড়াচ্ছে তারা। সাদা পোশাকে ঘুর ঘুর করছে খারাপ পাড়ায়, যাচ্ছে পকেটমারদের গোপন আস্তানায়, বস্তি এলাকায়।

রাষ্ট্রের হোমরাচোমরা আমলা থেকে শুরু করে সিনিয়র জুনিয়র অফিসার, সাধারণ কর্মী, পুলিস এবং সিপাইরা হত্যাকারীর খোঁজে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যার যার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করে গেল। সিনেমা-থিয়েটারের কর্মচারী, পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডেকে চোখ কান খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। ছাত্রদের কাফে, বার, টকিং ক্লাব, সোস্যাল গ্রুপ, পাড়া ভিত্তিক ক্লাব, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি জায়গায় সুদর্শন ইনফর্মার এবং সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দা পুলিস পাঠানো হলো। বিদেশী ছাত্রদেরকে আশ্রয় দেয় এমন প্রতিটি পরিবারে হানা দিল পুলিস, পরিবারের সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হলো।

চব্বিশে অক্টোবর সন্ধ্যায় একটা ফোন পেল অ্যাকশন সার্ভিসের চীফ কর্নেল বোল্যান্ড। ইউনিয়ন কর্সের কাপু স্বয়ং উ সেন কথা বলবেন তার সাথে।

দুরু দুরু বুকে লাল রিসিভারটা কানে তুলল সে। ব্যর্থতার কি কৈফিয়ৎ দেবে সে?

কিন্তু কাপু তাকে রানা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলেন না। কাপুর কণ্ঠস্বরে নিরুদ্বেগ উদারতা ফুটে উঠতে দেখে বিষম খাবার অবস্থা হলো তার।

'কেঁদে পায়ে পড়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি,' কাপু উ সেন বললেন, 'রানাকে ধরার জন্যে আরেকটিবার সুযোগ ভিক্ষা চায় সে। এ ব্যাপারে তোমাদেরকে যদি সত্যি কোন সাহায্য করতে পারে, এ যাত্রা প্রাণ ভিক্ষা পাবে সে।' কথা শেষ হতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন উ সেন।

এক ঘণ্টা পর। ফ্রেঞ্চ প্রশাসনের কর্সিকান উপপ্রধানদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে কর্নেল বোল্যান্ড। বৈঠকে নতুন একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরির। অভ্যাস মত মস্ত ভুঁড়িতে হাত বুলাচ্ছে সে।

সভাপতির আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল বোল্যান্ড। তার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছে। চেহারায় অস্থিরতা ফুটে উঠেছে। 'সে নেই হয়ে গেছে। আমরা কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না,' শুরু করল সে। 'স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে সে, কোনরকম চিহ্ন না রেখে বেমালুম উবে গেছে মাটির বুক থেকে।' একই কথা কয়েকবার বলা হয়ে গেল এর মধ্যে। [illegible]বন করল সে, কিন্তু সেজন্যে সঙ্কোচ

বোধ করল না। 'গোটা ফ্রেঞ্চ প্রশাসন এখনও মরিয়া হয়ে খুঁজছে তাকে, তাদের সাথে রয়েছে আমাদের দুই লক্ষের ওপর ইউনিয়ন কর্সের লোক—অথচ এখন পর্যন্ত তার ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি। কোথায় সে? প্যারিসে আছে? আমার তা মনে হয় না। প্যারিসে যদি থাকত...'

'এখানেই কোথাও আছে সে,' ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি, বলল, 'কিন্তু এ ব্যাপারে তর্কে না গিয়ে আমি জানতে চাই কাপুকে রক্ষা করার জন্যে আগামীকাল কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে?'

'আগামীকাল?' একটু বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে বলল কর্নেল বোল্যান্ড, 'বিশেষ করে আগামীকালকের কথা জানতে চাওয়ার কারণ কি তোমার?'

'আগামীকাল কাপুর অভিষেক অনুষ্ঠান, কথাটা আপনারা সবাই ভুলে গেছেন নাকি?' বলল লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি। 'বছরের এই একটি দিন জনসমক্ষে বেরুতেই হবে কাপুকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বশরীরে তাঁকে হাজিরা দিতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রথম থেকেই এই বিশেষ দিনটিকে বেছে রেখেছে মাসুদ রানা আঘাত হানার জন্যে।'

সবাইকে হতভম্ব করে দিয়েছে জাঁ থেরি। তাইতো! ভাবছে সবাই।

'এই একটি দিন যদি রানার আঘাত থেকে কাপুকে আমরা রক্ষা করতে পারি, তিন বছরের জন্যে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদেরকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। পরশুদিন থেকে আগামী তিন বছরের জন্যে যে-কোন আততায়ীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবেন কাপু। এবং এই তিনটি বছর হাতে পাব আমরা মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করে ধরার জন্যে।'

'মাই গড!' প্রায় চিৎকার করে উঠল কর্নেল বোল্যান্ড। 'তোমার কথার প্রতিটি অক্ষর বাস্তব সত্য বলে মনে হচ্ছে, থেরি। ইশ্‌শ্‌, পানির মত সহজ অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আমাদের কারও মাথায় আসেনি!'

'কর্নেল বোল্যান্ড,' গম্ভীর হয়ে বলল জাঁ থেরি, 'আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও আমি পাইনি।'

'আজ আর নতুন করে প্রসঙ্গটা আমি তুলিনি,' ম্লান মুখে বলল কর্নেল বোল্যান্ড। 'কিন্তু গতকাল কাপুর সাথে আলোচনার সময় পরিষ্কার বুঝেছি, অভিষেকের দিন অর্থাৎ আগামীকাল রীতি অনুযায়ী প্রতিটি অনুষ্ঠানে যাবেন তিনি—এ ব্যাপারে কারও কোন কথা শুনবেন না। তাঁর প্রোগ্রামের চূড়ান্ত সূচী পেয়েছি আমি,' কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করল সে। ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল, 'অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ করেই সকালবেলা আর্ক ডি ট্রায়াম্পের নিচে চিরঞ্জীব অগ্নিশিখার সামনে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। বেলা এগারোটায় নটরডেম ক্যাথেড্রেলে প্রার্থনায় বসবেন। সাড়ে বারোটায় মন্তভ্যালেরিনের গণ কবরে যাবেন। এখান থেকে সুরক্ষিত দুর্গে ফিরবেন লাঞ্চের জন্যে। বিকেলে মাত্র একটা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন কর্সের বীর এবং কীর্তিমান সদস্যদেরকে পদক এবং উপহার দান করবেন তিনি।

'বিকেল চারটের সময় বরাবরের মত গার মন্তপারনাসের সামনে চৌরাস্তায়

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত কয়েকশো বছর ধরে এই অনুষ্ঠানের জন্যে এটাই নির্দিষ্ট জায়গা ছিল, কিন্তু আগামী বছর এই অনুষ্ঠান এখানে আর হবে না। তার কারণ আপনারা সবাই জানেন। পুরানো রেলওয়ে স্টেশনকে পাঁচশো মিটার পিছিয়ে নিয়ে আসার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।'

'ভিড় সামলাবার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল জাঁ থেরি।

সব কিছু মুখস্থ করা আছে কর্নেল বোল্যান্ডের। গড় গড় করে বলে যাচ্ছে সে, 'প্রতিটি অনুষ্ঠানের কেন্দ্র থেকে দুশো গজের মধ্যে ইউনিয়ন কর্সের বিশেষ পরিচয় পত্রধারী লোকজন ছাড়া বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। ইস্পাতের তৈরি ব্যারিয়ারের সাহায্যে প্রতিটি জায়গা অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে ঘিরে ফেলা হবে, তারপর ব্যারিয়ারের ভিতর ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হবে। নালা, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন, প্রতিটি ফ্ল্যাট, চিলেকোঠা, ছাদ—সার্চ করতে কিছুই বাকি রাখা হবে না। দায়িত্বটা একাধিক দলকে দেয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা কয়েকবার করে সার্চ করা হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে এবং চলাকালে সাব-মেশিনগান এবং রাইফেলধারী কর্সিকানরা কাছেপিঠের ছাদ থেকে উল্টোদিকের ছাদ এবং জানালাগুলোর দিকে নজর রাখবে। অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করছে তারা এবং উচ্চপদস্থ কর্সিকানরা ছাড়া ব্যারিয়ার টপকে ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না।

'এবার আমরা কোনরকম ঝুঁকি নিচ্ছি না। কাপু উ সেনের সাথে যারা থাকবেন, যারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেককে সার্চ করার ঢালাও নির্দেশ দিয়েছি আমি। কাল সকালে চল্লিশ হাজার বিশ্বস্ত কর্সিকানকে স্পেশাল আইডেনটিটি কার্ড সরবরাহ করা হবে। সে-কার্ডটা দেখতে কেমন তা এইমুহূর্তে কারও জানা নেই। মাসুদ রানা যাতে একজন কর্সিকান প্রহরীর ছদ্মবেশ নিয়ে ব্যারিয়ার টপকাতে না পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই কার্ড হাই অফিশিয়াল এবং যারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে তাদেরকেও দেয়া হবে।

'অত্যন্ত গোপনে কাপু উ সেনের রোলস রয়েসে বুলেট প্রুফ কাঁচ ফিট করার কাজটা শেষ করেছি আমরা। দোহাই আপনাদের, একথা যেন কাপুর কানে না যায়। তাহলে রক্ষা থাকবে না কারও। কাপুর গাড়ি চালাবে মেরেক্স। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অন্যান্য দিনের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে যেন গাড়ি চালায় সে। গাড়ি থেকে কাপু নামার আগেই অস্বাভাবিক লম্বা কিছু কর্সিকান গাড়িটাকে ঘিরে ফেলবে। কাপু যখন যেখানেই থাকুন না কেন, তালগাছের মত উঁচু কিছু লোক সবসময় তাঁকে ঘিরে রাখবে।

'এছাড়া, কাপুর দুশো মিটারের মধ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা কেউ করলেই তাকে সাথে সাথে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে, এবং কোন প্রশ্ন না করে চ্যাংদোলা করে তুলে অপেক্ষমাণ গাড়িতে তোলা হবে। যতবড় লাটসাহেবই হোক, নির্দেশ লঙ্ঘন করলে ঠিক এই ব্যবহার করা হবে তার সাথে। সাংবাদিকদের কাল সকালে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হবে অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

জারি করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, অনুষ্ঠানের পাঁচশো গজের মধ্যে কারও হাতে কোন প্যাকেট বা লম্বা আকারের কোন জিনিস থাকলে দেখামাত্র তাকে কর্সিকানরা ঘিরে ফেলবে এবং নিকটবর্তী গাড়িতে তুলে নেবে। সংক্ষেপে মোটামুটি এইরকম ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তোমার বিশেষ কোন সাজেশন আছে, থেরি?'

'খুন হবার ঝুঁকি নেবে রানা,' চিন্তিতভাবে বলল জাঁ থেরি, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। আঘাত হেনে নিরাপদে ফিরে যেতে চায় সে। সেজন্যে অনেক আগে থাকতেই নিজের প্ল্যান সাজিয়ে নিয়েছে। তার সেপ্টেম্বরের শেষ আট দিনের প্যারিস ভ্রমণের কথা বলছি আমি। তার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকত অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে বা কাজ সেরে নিরাপদে কেটে পড়ার ব্যাপারে, আগেই পিছু হটত সে।'

থামল জাঁ থেরি। সবাই অপেক্ষা করছে তার মুখ থেকে আরও কিছু শোনার আশায়।

'সুতরাং কোন একটা উপায়ের কথা জানা আছে তার,' খেই ধরে আবার শুরু করল জাঁ থেরি। 'তিন বছরের মধ্যে অন্তত একটা দিন, অভিষেকের দিন, কাপুকে বাইরে বেরুতেই হবে, একথা জানা আছে তার। তাই এই দিনটাকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু এখন সে জানে তার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জানে গোটা ফ্রেঞ্চ প্রশাসন এবং ইউনিয়ন কর্স তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। অথচ, তবু সে পিছু হটেনি।'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল জাঁ থেরি।

'পিছু হটেনি। হটবেও না। কেন? আত্মহত্যার শখ গজিয়েছে? পিছু হটছে না, তার কারণ তার ধারণা কাজটায় সে সফল হবেই, কাজটা শেষ করে নিরাপদে সরে যেতে পারবেই। অর্থাৎ এমন একটা বুদ্ধি করেছে সে যা আমাদের মাথায় আসছে না। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা ফাটাবে? নাকি দূর থেকে রাইফেল ছুঁড়বে? বোমার অস্তিত্ব গোপন রাখা সম্ভব নয়। বোমা নিয়ে অনুষ্ঠানের কাছেপিঠে ঘেঁষার আগেই ধরা পড়ে যাবে সে। তারমানে রাইফেল না হয়েই যায় না। সেজন্যেই ফ্রান্সে ঢোকার জন্যে গাড়ি ব্যবহার করার দরকার হয়েছিল তার। রাইফেলটা গাড়িতেই ছিল, সম্ভবত চেসিসের সাথে বা প্যানেলিংয়ের ভিতরে কোথাও ওয়েল্ড করে আটকে নিয়েছিল।'

'কিন্তু কাপুর কাছাকাছি রাইফেল নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' নিজের অজান্তে চিৎকার বেরিয়ে এল কর্নেল বোল্যান্ডের গলা থেকে। 'অল্প কয়েকজন ছাড়া কাপুর কাছে যেতেই পারছে না কেউ—এবং এদেরকেও একাধিকবার সার্চ করার ব্যবস্থা হয়েছে। ক্রাউড ব্যারিয়ারের ভিতর রাইফেল নিয়ে ঢুকবে কিভাবে সে?'

পায়চারি থামিয়ে কর্নেল বোল্যান্ডের দিকে তাকাল জাঁ থেরি। বলল, 'কিভাবে ঢুকবে তা আমি জানি না। কিন্তু সে মনে করে ঢুকতে পারবে। এবং আপনাদের সবাইকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ পর্যন্ত যা সে ভেবেছে তাই করেছে—করতে পেরেছে। এখন পর্যন্ত কোথাও হার হয়নি তার, সর্বত্র সে আমাদেরকে টেক্কা মেরে

উতরে গেছে। এটা কম কথা নয়। পৃথিবীর অন্যতম দুই বৃহৎ শক্তির প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে এই প্যারিসে পৌঁচেছে সে। রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে আছে সে, হয়তো আরেক নতুন চেহারা, নতুন এক প্রস্থ পরিচয়পত্র নিয়ে। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কর্নেল। যেখানেই ঘাপটি মেরে থাকুক, গর্ত থেকে আগামীকাল বেরুবেই সে। এবং বেরুলে তাকে আমাদের ধরতেই হবে। প্রথম সুযোগেই।

'না, কর্নেল, দেবার মত নতুন কোন সাজেশন নেই আমার। আগামীকালের আয়োজন ফুলপ্রুফ, না মেনে উপায় দেখছি না। এই ব্যাপক এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস আমার মত দুঃসাহসী এক হাজার জাঁ থেরিরও হবে না। অথচ একা রানা ঠিক তাই করেছে। ভাবতে গেলে লোকটাকে উন্মাদ মনে হয়। কিন্তু উন্মাদ যে সে নয়, তাও ইতিমধ্যে একের পর এক পাহাড় সমান বাধা টপকে প্রমাণ করে দিয়েছে। একমাত্র ওপরওয়ালা জানেন কি সে···মানুষ নাকি অলৌকিক শক্তি···'

'তাকে ধরার ব্যাপারে তুমি নিজে কি করতে যাচ্ছ, থেরি?' জানতে চাইল কর্নেল বোল্যান্ড।

'প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকব আমি,' জানাল জাঁ থেরি। 'এখানে সেখানে ঘুর ঘুর করব। নির্দিষ্ট কিছু ভাবিনি। তবে, চোখ-কান খোলা রেখে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া করার কিছু বাকিও নেই, তাই নয় কি?'

এর দুই ঘন্টা পর সভা মুলতবী ঘোষণা করা হলো।

শুতে যাবার আগে আগামীকালকের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা। বিছানার উপর পড়ে রয়েছে একজোড়া কালো জুতো, গ্রে রঙের উলেনের মোজা, ট্রাউজার, গলা খোলা শার্ট, লম্বা গ্রেটকোট, তার সাথে একসার ক্যাম্পেন রিবন, এবং প্রাক্তন ঝানু ফ্রেঞ্চ যোদ্ধা মার্ক রোডিনের কালো বেরেট। এগুলোর উপর ছুঁড়ে রাখল সে ব্রাসেলসে জাল করা কাগজপত্র। হারনেস এবং পাঁচটা ইস্পাতের টিউব, যেগুলো দেখতে অ্যালুমিনিয়ামের মত, বিছানার এক পাশে রাখল ও। পাঁচটা টিউবে রয়েছে ওর রাইফেলের স্টক, ব্রীচ, ব্যারেল, সাইলেন্সার এবং টেলিস্কোপিক সাইট। এগুলোর পাশে পড়ে আছে কালো রাবারের মাথা-মোটা একটা টুকরো, কাঠের বা ধাতুর তৈরি পায়ার গোড়া মুড়তে ব্যবহার করা হয়। এর ভিতর রয়েছে পাঁচটা এক্সপ্লোসিভ বুলেট।

রাবারের ভিতর থেকে দুটো বুলেট বের করে নিল রানা। খুঁজে পেতে কিচেন থেকে একটা প্লায়ার্স আগেই যোগাড় করে রেখেছে। সেটা দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বুলেট দুটোর নাক ভাঙল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুটো চিকণ করডাইটের পেন্সিল। পেন্সিল দুটো রেখে অকেজো কার্টিজ দুটো ফেলে দিল অ্যাশ-ক্যানে। হাতে থাকল এখন মোট তিনটে বুলেট। ওর কাজের জন্যে তিনটেই যথেষ্ট বলে মনে করছে ও।

দু'দিন দাড়ি কামায়নি রানা, ফলে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে গাল ভরে উঠেছে।

এবার প্যারিসে পৌঁছেই যে ধারাল ক্ষুরটা কিনেছে সেটা দিয়ে অযত্নের সাথে পরিষ্কার করে ফেলল মুখটা। বাথরূমের শেলফে আফটার-শেফ লোশনের ফ্লাস্কটা রয়েছে, তবে ওতে লোশন নেই, রয়েছে গ্রে হেয়ারটিন্ট যা ধর্মযাজক বেনসনের চুল রাঙাবার জন্যে একবার ব্যবহার করেছে ও। এর পাশেই রয়েছে সলভেন্ট স্পিরিট। চুল ধুয়ে নারকেল ছোবড়ার রঙটা আগেই উঠিয়ে ফেলেছে রানা। এবার আয়নার সামনে বসে একটু একটু করে ছেঁটে নিজের চুলের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ফেলছে।

সবশেষে প্রস্তুতিটা সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা চেক করে নিল রানা। সকালের জন্যে কোন কাজ বাকি পড়ে নেই দেখে সন্তুষ্ট হলো। একটা ওমলেট তৈরি করে বৈঠকখানায় ফিরে এসে টিভি খুলে বসল ও। বিছানায় যাবার আগে পর্যন্ত উপভোগ্য একটা ভ্যারাইটি শো দেখে সময়টা কাটাল।

পঁচিশে অক্টোবর। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। পরিষ্কার নীল আকাশ। প্রতিটি অনুষ্ঠানে অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী একদল লোক ঘিরে রেখেছে ইউনিয়ন কর্সের হেড কাপু উ সেনকে। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ করে সুরক্ষিত দুর্গ প্রাসাদ থেকে অবশ্য পালনীয় আরও কয়েকটা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে বেরিয়েছে সে।

প্রথম অনুষ্ঠান আর্ক ডি ট্রায়াম্পে।

অসংখ্য দেহরক্ষীদের নিয়ে এক ঝাঁক গাড়ির মাঝখানে রয়েছে ঝকঝকে একটা রোলস রয়েস। রোলস রয়েস থামতেই চারদিকের হুডখোলা গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝপাঝপ সাব-মেশিনগানধারী দেহরক্ষীরা নেমে পড়ল নিচে। অস্বাভাবিক লম্বা আকৃতির লোকগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল রোলস রয়েসকে। গাড়িটাকে ঘিরে সশস্ত্র প্রহরীদের আরও একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেল দশ গজ দূরে। গায়ে গা ঠেকিয়ে, রোলস রয়েসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীরা। প্রত্যেকের হাতে সাব-মেশিনগান। বিপদের চিহ্ন দেখামাত্র ট্রিগার টেনে ধরার জন্যে সদা প্রস্তুত সবাই।

রোলস রয়েসের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল কর্নেল বোল্যান্ড। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে ইউনিয়ন কর্সের হাই অফিশিয়ালরা। গাড়ি থেকে নামল কাপু। ঝাড়া সাড়ে ছয় ফিট লম্বা। সরু কোমর। চোখে অত্যন্ত গাঢ় সবুজ রঙের চশমা। মুখের চেহারায় হিমালয়ের গাম্ভীর্য ফুটে আছে। উদ্ধত ভঙ্গিতে একবার এদিক, একবার ওদিক তাকাল। মাথার পিছন দিকে চামড়ার নিচে স্টীল প্লেট থাকায় ঘাড় ফেরাতে পারে না সে, ফলে পর পর দু'বার, একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরে গেল পুরো শরীর। সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে এল অপেক্ষমাণ হাই অফিশিয়ালদের সারির দিকে।

এরা সবাই ইউনিয়ন কর্সের এক একটা স্তম্ভ। কাপুর দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে প্রত্যেকে। সবাই জানে, কাপু অন্ধ, কিছুই দেখতে পান না তিনি। কিন্তু দেখতে না পেলেও, কিছুই তাঁর অগোচরে থাকে না। তিনি সাউন্ড ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে চিনে ফেলেন। রাতের অন্ধকারেও তাঁকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

দুই আড়ষ্ট কাঁধ আর খাড়া পিঠ নিয়ে যান্ত্রিক মানুষের ~~ এগিয়ে এসে সারির প্রথম লোকটার সামনে দাঁড়াল উ সেন। কাঁপা হাতজোড়া দিয়ে কাপুর বাঁ হাতটা ধরল লোকটা, মুখের সামনে তুলে নিয়ে এসে কাঁপা ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমো খেল আলতোভাবে। ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল কাপু উ সেনের ঠোঁটে। 'এত মুটিয়ে গেলে কাজ করবে কিভাবে, রেমন্ড?'

প্রত্যেকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল কাপু। সূক্ষ্মতম পরিবর্তনও তার অগোচরে থাকে না। প্রত্যেককে কিছু না কিছু বলল সে, এবং চমকে দিল।

শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে উপায় থাকল না কারও। প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো—আমাদের কাপু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তার আড়ষ্ট দুই কাঁধ, খাড়া পিঠ এবং হাঁটার ভঙ্গিতে প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে কি এক অদ্ভুত রহস্য—আতঙ্কে শিরশির করে শরীর। কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, কিন্তু গুড় গুড় মেঘের ডাকের মত ভরাট, গুরুগম্ভীর। উপরে থেকে গলা বাঁকা করে নিচের দিকে তাকাচ্ছে সে। সবার চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। সবার মাথার উপরে তার মাথা।

চারদিকের সব ক'টা উঁচু ছাদে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ইউনিয়ন কর্সের প্রহরীরা। তাদের প্রত্যেকের চোখে বিনকিউলার, সামনে রাইফেল। সকলের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এলাকা, যার যার এলাকার উপর চোখ রেখেছে সবাই। চোখের দৃষ্টি পৌঁছায় এমন প্রতিটি ইঞ্চির উপর নজর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এক সময় শেষ হলো কাপু উ সেনের অনুষ্ঠান। তার রোলস রয়েসকে ঘেরাও করে নিয়ে গেল দেহরক্ষীদের হুড তোলা গাড়িগুলো। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

একই দৃশ্যের অবতারণা হলো ক্যাথেড্রেলে। আগে থেকেই প্রহরীরা যার যার জায়গা নিয়ে ফেলেছে। কারও চোখে পলক নেই ওদের।

ক্রাউড ব্যারিয়ারের বাইরে, ক্যাথেড্রেলের দরজা থেকে দুশো গজ তফাতে কয়েক সহস্র দর্শকের ভিড় দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে থেকে এগারো জনের ঘাড় ধরে তোলা হলো অপেক্ষমাণ গাড়িতে। এগারো জনের একজন বগলের তলায় হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল চুলকাবে বলে, বাকি দশজন পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল সিগারেট বের করার জন্যে। কেউই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তা বের করার সময় পায়নি। আশেপাশেই ছিল ইউনিয়ন কর্সের লোকেরা।

এখানেও কোন ঘটনা ঘটল না। না শোনা গেল একটা রাইফেলের আওয়াজ, না ঘটল কোন বোমার বিস্ফোরণ। কর্সিকানরাও একজন আরেকজনকে তীব্র দৃষ্টিতে পরখ করে নিতে ছাড়ছে না। প্রত্যেকের কাঁধে নতুন ব্যাজ শোভা পাচ্ছে। এই ব্যাজ দেখেই বুঝে নিচ্ছে সবাই এরা তাদের নিজেদের লোক, মহান কাপু উ সেনের একনিষ্ঠ ভক্ত। তা সত্ত্বেও সন্দেহ হলেই একজন আরেকজনের পরিচয় পত্র দেখতে চাইছে—যেটা মাত্র আজ সকালে ইস্যু করা হয়েছে প্রত্যেককে।

ইউনিয়ন কর্সের একজন হাই অফিশিয়াল, দ্বিতীয় সারির নেতাকে গ্রেফতার করা হলো, চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো একটা ভ্যানে। তার অপরাধ, আজ সকালে ইস্যু করা নতুন পরিচয়পত্রটা প্রহরীকে দেখাতে পারেনি সে, কোথায় নাকি হারিয়ে ফেলেছে।

মন্তভ্যালেরিনের পরিবেশটা হয়ে উঠল বিদ্যুতের মত স্পর্শকাতর। তার কারণ, এখানে সবচেয়ে কঠোরতম প্রহরার ব্যবস্থা করেছে কর্নেল বোল্যান্ড। কাপু উ সেন ব্যাপারটা যদি টেরও পেয়ে থাকে, মুখ দেখে তার কিছুই বোঝা গেল না। সিকিউরিটি চীফেরা এক ফাঁকে কর্নেল বোল্যান্ডকে জানাল ব্যারিয়ারের ভিতর কাপু উ সেন যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ মানুষ তো দূরের কথা, প্রাকৃতিক কোন অঘটনও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ছাদের উপর যারা রয়েছে তারা পিঠ দিয়ে ঠেকাবে ঝড় তুফান, রাইফেলের বুলেট ছুঁড়ে দিক্‌ভ্রান্ত করবে বজ্রকে।

কর্নেল বোল্যান্ড তাদেরকে গম্ভীর ভাবে বলল, 'গুড। কিন্তু আমরা সবাই ধরে নেব এইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে মাসুদ রানা। সুতরাং চোখকান খোলা রাখব।'

কিন্তু রানা তখন অন্যখানে।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে পেরি তেসিয়ারের। তার উপর রোদ মাথায় নিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটোয় ব্যথা ধরে গেছে তার। জিন্‌সের শার্ট ঘামে ভিজে চট চট করছে পিঠে লেগে। সাবমেশিন কারবাইনের স্ট্র্যাপটা কাঁধের মাংসে গেঁথে বসেছে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাবার দশা হয়েছে, অথচ এক ঢোক পানি খেতে যাবার উপায় নেই। কাপু উ সেন আসবেন, কিন্তু কখন আসবেন কেউ বলতে পারে না। আজ সকালে সহকর্মীরা বলাবলি করছিল, যে-কোন মুহূর্তে কাপুর প্রোগ্রামে অদল বদল ঘটানো হতে পারে।

ইস্পাতের তৈরি ক্রাউড ব্যারিয়ারটাকে পাহারা দেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে, সঠিক ব্যাজ এবং সঠিক পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে এপারে ঢুকতে দেয়া চলবে না। তা যতই তার খিদে পেয়ে থাকুক আর মেজাজ বিগড়ে থাকুক, ভাবছে সে, তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এপারে কেউ ঢুকতে পারবে বলে মনে করলে মস্ত ভুল করবে সে। সে চেষ্টা কেউ একবার করেই দেখুক, নির্ঘাত বুটের লাথি মেরে পাঁজর গুঁড়িয়ে দেবে তার। বেশি চালিয়াতি করলে দেবে ফুটো করে মাথার খুলি···

ঘুরে দাঁড়িয়ে রু দে রেনেসের দিকে তাকাল পেরি। দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝখানের রাস্তায় ইস্পাতের লম্বা চেন ঝুলিয়ে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্লেস দু এইটিন জুন-এর কাছ থেকে দূরত্ব প্রায় আড়াইশো মিটার। চৌরাস্তা থেকে আরও একশো মিটার পিছনে রেলওয়ে স্টেশনের সামনের দিকটা। ওটার মস্ত চাতালের সামনেই অনুষ্ঠানের আয়োজন। সেদিকে তাকিয়ে কিছু লোকের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে সে। কীর্তিমান কর্সিকানরা পদক নেবার জন্যে কোথায় দাঁড়াবে, কাপুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে হাই অফিশিয়ালরা কোথায় অপেক্ষা করবে ইত্যাদি নির্ধারণ করছে চিহ্ন দিয়ে। অনুষ্ঠান শুরু হতে এখনও তিনঘণ্টা বাকি, যদি প্রোগ্রাম বদল করা না হয়। ইস্, তার মানে সারাটা দিন আজ না খেয়েই কাটাতে হবে তাকে!

ব্যারিয়ারের ওপারে দু'একজন করে লোক এসে দাঁড়াচ্ছে। ছোট খাটো একটা ভিড় জমে উঠতে দেরি হলো না। কোন কোন মানুষের ধৈর্যের সীমা নেই, ভাবছে

পেরি। তিনশো মিটার দূর থেকে ইউনিয়ন কর্সের কাপুকে দেখার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি যে মজা পায় এরা! বোকার দল, সন্দেহ নেই। দাঁড়িয়ে থাকাই সার, এদের একজনও দেখতে পাবে না কাপুকে। দেহরক্ষীরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে আড়াল করে রাখবে।

ভিড়টা আরও একটু বাড়ল। ঠিক এই সময় বুড়ো লোকটার উপর চোখ পড়ল পেরির। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া, হাঁপাচ্ছে। খানিকটা হেঁটে দম নেবার জন্যে থামছে। এদিক ওদিক পিট পিট করে তাকাচ্ছে, যেন পথ ভুল করল কিনা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। একই দিকে বারবার মুখ উঁচু-নিচু করে তাকাবার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল পেরি, চোখেও কম দেখে বুড়ো। ওই, আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়, ভয় হলো পেরির।

ব্যারিয়ারের কাছে চলে এসেছে বুড়ো। ঘামের দাগ লেগে বিচ্ছিরী চেহারা হয়েছে কালো বেরেটটার। লম্বা গ্রেটকোটটা হাঁটুর নিচে ঝুলছে। বুকের কাছে একগাদা মেডেল এদিক ওদিক দুলছে, টুংটাং শব্দ করছে পরস্পরের গায়ে বাড়ি খেয়ে। ব্যারিয়ারের ওপারে দাঁড়ানো কয়েকজন লোক সহানুভূতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে।

ব্যারিয়ারের কাছে এসে ইতস্তত করছে বুড়ো। পেরির মনে হলো, বুড়ো যেন জায়গাটা ঠিক চিনতে পারছে না। হ্যাঁ, ঠিক তাই, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। চলে যাচ্ছে।

চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে পেরি, এমন সময় দেখল আবার এদিকে ফিরছে বুড়ো। এগিয়ে আসছে আবার। খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। তা তো হবেই, ভাবছে পেরি, এক পায়ে হাঁটা কি চাট্টিখানি কথা? আহা, বেচারা! যুবক বয়সে এই লোকই দু'পায়ে কেমন ছুটোছুটি করেছে, বীরের মত লড়াই করেছে, অথচ আজ...হয়তো যুদ্ধেই বেচারা হারিয়েছে পা'টা।

ইস্পাতের চেনটা টপকে ব্যারিয়ারের ভিতর ঢুকছে বুড়ো। গটমট করে তার দিকে এগোল পেরি। 'কি হচ্ছে?' চেহারায় রাগ রাগ ভাব, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে জানতে চাইল সে।

'কে, বাবা?' বারকয়েক মুখ উঁচু-নিচু করে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল বুড়ো পেরিকে। অ্যালুমিনিয়ামের ক্রাচের উপর ভর দিয়ে ঘনঘন হাঁপাচ্ছে এখনও। একটু চিন্তিত ভাবে আবার বলল, 'পথই ভুল করলাম, না কি...' সামনের বাড়িগুলোর দিকে আঙুল তুলল সে, 'ওই ওদিকটায় যেতে চাই আমি...'

'দেখাও, বাবা, তোমার কাগজপত্র বের করো।' বিরক্ত কণ্ঠে বলল পেরি।

কাঁপা কাঁপা একটা হাত শার্টের পকেটে ঢোকাল বুড়ো। নাক কুঁচকে উঠল পেরির। শার্টটা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। পকেট থেকে দুটো কার্ড বের করল বুড়ো। হাতে নিয়ে সেগুলো দেখছে পেরি। প্রথম কার্ডে বুড়োর পেশাগত পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মজীবী একজন মানুষ। অর্থাৎ, শ্রমিক। দ্বিতীয় কার্ডে তার পরিচয় ছাপা রয়েছে মার্ক রোডিন, ফ্রেঞ্চ সিটিজেন, বয়স তিপ্পান্ন, জন্ম কোলমারে, বাস করে প্যারিসে। কার্ডের নিচের দিকে একটা ঝাপসা হয়ে যাওয়া সীল, সেটা দেখেই টনক নড়ে গেল পেরির। কাপু উ সেনের সীল, সাথে তাঁর সইও রয়েছে।

বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা ফুটে উঠল তার চেহারায়।

দুটো কার্ডে ফটো পরীক্ষা করল পেরি। একই লোকের ছবি, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তোলা। মুখ তুলে তাকাল সে।

'বেরেট খোলো।'

বেরেট খুলে হাত দিয়ে দুমড়ে ধরে রাখল সেটাকে বুড়ো। ফটো দুটোর সাথে লোকটার চেহারা মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে পেরি। কোন অমিল নেই। তার সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে অবশ্য অসুস্থ দেখাচ্ছে। দাড়ি কামাতে গিয়ে এখানে সেখানে কয়েক জায়গায় চামড়া কেটে ফেলেছে, খুদে টয়লেট পেপার সেঁটে রেখেছে জায়গাগুলোয়। সাদা টয়লেট পেপারে ক্ষীণ রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে। মুখের রঙ গ্রে, এবং ঘামে পিচ্ছিল হয়ে আছে। কপালের উপর চারদিকে শুঁড় বিস্তার করে রেখেছে চুলগুলো, দ্রুত বেরেটটা নামাবার সময় সৃষ্টি হয়েছে এই বিশৃঙ্খলা।

'ওদিকে কেন যেতে চাইছ তুমি?'

'ওখানে আমি থাকি,' বলল বুড়ো। 'একটা চিলেকোঠায়।'

ছোঁ মেরে কার্ড দুটো কেড়ে নিল বুড়োর হাত থেকে পেরি। দেখল আইডেনটিটি কার্ডে বুড়োর ঠিকানা লেখা রয়েছে...একশো চুয়ান্ন রু দে রেনেস, প্যারিস। মুখ তুলে মাথার উপরের বাড়িটার দিকে তাকাল পেরি। দরজায় নম্বর লেখা রয়েছে একশো বত্রিশ। বাজে কথা বলেনি বুড়ো, একশো চুয়ান্ন নম্বর বাড়ি নিশ্চয়ই রাস্তার আরও ওদিকে হবে। যেতে দেয়া যায়। বুড়ো একজন লোককে তার বাড়িতে ফিরতে না দেয়ার কোন কারণ নেই। সে-রকম কোন হুকুম দেয়া হয়নি তাকে।

'ঠিক আছে, তুমি বুড়ো মানুষ, তাছাড়া এদিকেই যখন থাকো, ঢুকতে বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু কোনরকম গোলমাল কোরো না যেন। দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছেন কাপু।'

মুখ টিপে একটু হাসল বুড়ো। কার্ড দুটো শার্টের পকেটে রাখতে গিয়ে নড়ে গেল ক্রাচটা, পড়ে যাবার উপক্রম করল। ঝট্ করে তাকে পেরি ধরে ফেলল বলে, তা নাহলে নির্ঘাত একটা আছাড় খেত।

'জানি,' বলল বুড়ো। 'আমার এক বন্ধু মহান কাপুর কাছ থেকে আজ একটা মেডেল পাবে। আমারটা পেয়েছি আমি দশ বছর আগে।' বুকে ঝুলানো একটা মেডেলের গায়ে টোকা দিল সে।

'আচ্ছা, আচ্ছা।' অধৈর্যের সুরে বলল পেরি। 'এবার তুমি যাও, বাপু। ঝামেলা বাড়িয়ো না। সাবধান, এদিক সেদিক ঘুরঘুর কোরো না যেন আবার। সোজা চিলেকোঠায় চলে যাও।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেরি। দেখল সুযোগ সন্ধানী আরেক লোক ব্যারিয়ার টপকে এপারে আসার চেষ্টা করছে। মারমুখো হয়ে তেড়ে গেল তার দিকে সে। 'এ্যাই। তবে রে...'

বিশ সেকেন্ড পর ভিড়টাকে ব্যারিয়ারের কাছ থেকে দশ গজ হটিয়ে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল পেরি তেসিয়ার। রাস্তার শেষ প্রান্তে চৌরাস্তার কাছাকাছি একটা দরজার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে এক পলকের

জন্যে গ্রেটকোটটাকে দেখতে পেল সে।

মাদাম আর্থা তার পোষা কালো বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে বকবক করছে। আগাম নোটিশ দিয়ে আজকের জন্যে সবাইকে বাড়ি খালি করতে বলা হয়েছিল, বিনা প্রতিবাদে সে-নির্দেশ পালন করেছে সবাই। এলাকার প্রায় সব ক'টা দালান কর্সিকানদের। তাদের গুরু কাপু উ সেন কি এক অনুষ্ঠানে আসবেন এদিকে, তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, বলা হয়েছে তাকে। সকাল থেকে তিন দফায় তিনটে দল সার্চ করে গেছে গোটা ফ্ল্যাট বাড়ি। ছাদের উপর কমপক্ষে পঁচিশ জন সশস্ত্র লোক উঠে বসে আছে। আজ আর দরজা পাহারা দেবার দরকার নেই তার। হাতে তেমন করার কাজও কিছু নেই, তাই ইহজগতের একমাত্র ঘনিষ্ঠ আপনজন কালো বিড়ালটার সাথে গল্পগুজব করে সময়টা কাটাচ্ছে মাদাম আর্থা। দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ছে বুড়ীর যোয়ান বয়সের রঙিন সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে। 'বুঝলি রে, ছেলেটো যেমন ছিল ইয়া তাগড়া, তেমনি ছিল হৃদয়টা। তা আমি তাকে পাত্তা না দিলে কি হবে, সে আমাকে এত ভালবাসত, এতই ভালবাসত...'

ঘ-র-ঘ-র আওয়াজ বেরিয়ে এল কালো বিড়ালের গলা থেকে।

একগাল হাসল বুড়ী। 'চটিস কেন? আমি কি বলেছি তোর চেয়ে বেশি ভালবাসত সে আমাকে?' হঠাৎ খোলা দরজার দিকে তাকাল বুড়ী। খট্ করে একটা শব্দ হলো। কেন? কিসের শব্দ? মনে হলো সিঁড়ি থেকে এল।

'আয় তো দেখি,' বলে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠল বুড়ী। বিড়ালটাকে বুকে নিয়ে কামরা থেকে বেরোল সে। সিঁড়ির দিকে তাকাল। নেই কেউ। আর কোন শব্দও পেল না।

কিন্তু এখনও কানে বাজছে শব্দটা—খট্! বাড়ি খালি দেখে ছিঁচকে চোর হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি, ভাবল বুড়ী। সিঁড়ির দিকে এগোল সে। বিড়ালের মাথায় হাত বুলাচ্ছে। বলল, 'চল, তালাগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে আসি ঘুরে।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা সিঁড়ির নিচ থেকে। বুড়ীর কামরার পাশেই চার ফিট একটা অন্ধকার জায়গায় বসে ছিল ও। জায়গাটা সিঁড়ির তলায়, তাই দাঁড়াবার উপায় নেই। সোজা বুড়ীর কামরায় ঢুকে পড়ল ও। টেবিলের উপর চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা। এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে ছোট্ট, পুরানো হাত ব্যাগটা তুলে নিল ও। সেটা খুলতেই ভিতরে দেখা গেল চাবির গোছাটা।

যে তালাটা খুলতে হবে সেটার নাম্বার মনে আছে রানার। গোছা থেকে বাছাই করে নির্দিষ্ট নাম্বারের একটা চাবি খুলে নিল ও। সেটা পকেটস্থ করে চাবির গোছাটা হাতব্যাগে ফেলল, তারপর হাতব্যাগটা রেখে দিল যথাস্থানে।

বিশ সেকেন্ডও হয়নি বুড়ীর কামরায় ঢুকেছে রানা। তালা পরীক্ষা করতে ছয় তলা পর্যন্ত যদি ওঠে সে, ফিরে আসতে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট লাগবে তার। একমুহূর্ত চিন্তা করল রানা। কামরার অপর দরজা দিয়ে দ্রুত বাথরুমে ঢুকে পড়ল ও।

কোটের সামনেটা খুলল রানা। হাত ঢুকিয়ে কোমরের কাছ থেকে হারনেসের হুকটা খুলল। ভাঁজ করা ডান পা'টা নিতম্বের নিচ থেকে ঝট করে নেমে এল নিচের দিকে। হাঁটুর নিচ থেকে অবশ হয়ে গেছে পা, কিন্তু হাঁটুর উপর প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে, চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে পা'টা ম্যাসেজ করতে শুরু করল।

তিন মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরোল রানা। বুড়ী ফেরেনি এখনও। ক্রাচটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কামরার বাইরে। মাথা নিচু করে ঢুকল অন্ধকার সিঁড়ির তলায়।

থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ শুনে বুঝল রানা, ফিরে আসছে বুড়ী। গলা বাড়িয়ে 'হাউ' করে উঠে বুড়ীর পিলেটা পরীক্ষা করলে কেমন হয়? ছেলেমানুষী দুষ্টামি এখনও ত্যাগ করেনি ওকে, এই ভেবে হাসল মনে মনে। গলাটা বাড়াল একটু। বকবক করছে বুড়ী। কি যেন বোঝাচ্ছে বিড়ালটাকে। কামরার ভিতর ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ক্রাচ হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এল ও। নিঃশব্দে ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে উপরে।

ছয়তলায় উঠে থামল রানা। একটা ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল। সাড়া নেই কারও। আবার নক করল রানা। চারদিক নিস্তব্ধ। কেউ নেই ভিতরে। পাশের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবার। নক করল। খানিক অপেক্ষা করে এটাতেও টোকা মারল দ্বিতীয়বার। সাড়া নেই কারও। প্রথম ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলল। ভিতরে ঢুকে আবার বন্ধ করল দরজা, তালা লাগিয়ে দিল। হাতের ক্রাচটা দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে খোলা জানালার দিকে এগোল ও।

রাস্তার ওপারের দালানগুলোর ছাদে শুয়ে রয়েছে অনেক লোক। একটু পিছিয়ে এল রানা। অনেকটা দূরে রয়েছে ওরা, ঘরের ভিতর আধো অন্ধকারে কেউ থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয় ওদের। হাত বাড়িয়ে জানালার শার্সির ক্লিপ খুলে ফেলল ও। শার্সির ফ্রেম দুটো ধরে উন্মুক্ত করল, টেনে আনল দুই দিকের দেয়ালের গায়ে। আরও দু'পা পিছিয়ে এল ও। কার্পেটের উপর চারকোনা একটা আলো পড়েছে। তবে ঘরের বাকি অংশ এরপরও অনালোকিতই থাকল। চারকোনা আলোর বাইরে থাকবে ও, স্থির করল মনে মনে, তাহলে বিনকিউলার দিয়েও কর্সিকানরা দেখতে পাবে না ওকে।

চারকোনা আলোটাকে এড়িয়ে জানালার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। স্টেশনের সামনের চাতাল এখান থেকে একশো ত্রিশ মিটার দূরে। সরাসরি সামনে নয়, একপাশে। কিন্তু উপর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পুরোটা। জানালা থেকে আট ফিট পিছনে এবং একটা দিক ঘেঁষে লিভিং-রুমের টেবিলটাকে দাঁড় করাল ও। টেবিল ক্লথ এবং প্লাস্টিকের ফুলদানীটা সরিয়ে বদলে সেখানে আনল আর্মচেয়ারের কুশন। এগুলো ওর ফায়ারিং রেস্ট হিসেবে কাজ করবে।

গ্রেটকোটটা খুলে ফেলল রানা। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিল। ক্রাচটাকে দরজার কাছ থেকে তুলে নিয়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। এক এক করে সেটাকে কয়েক টুকরোয় বিচ্ছিন্ন করল ও। গোড়ার রাবার থেকে বের করল চকচকে তিনটে

এক্সপ্লোসিভ বুলেট। আগের চেয়ে এখন সুস্থ বোধ করছে রানা। ঘামছে না সে এখন। বমি বমি ভাবটাও নেই আর। করডাইটের প্রতিক্রিয়া কেটে যাচ্ছে দ্রুত।

স্ক্রু খুলে ক্রাচের পরবর্তী অংশটা খুলে সাইলেন্সারটা বের করল রানা। এরপর এক এক করে বেরিয়ে এল টেলিস্কোপিক সাইট, ব্যারেল এবং রাইফেল স্টক। সবশেষে রাইফেলের ট্রিগার বের করল রানা প্যাড দিয়ে মোড়া ক্রাচের যে অংশটা বগলের নিচে থাকে সেখান থেকে। প্যাড দিয়ে মোড়া এই আর্মপিট সাপোর্টটারও একটা ভূমিকা আছে, এটা শোল্ডার-গার্ড হিসেবে ব্যবহার করবে রানা।

অত্যন্ত যত্নের সাথে বিচ্ছিন্ন অংশগুলো জোড়া দিয়ে রাইফেলটা তৈরি করতে বসল রানা। ব্রীচ এবং ব্যারেল, স্টকের উপর এবং নিচের অংশ, শোল্ডারগার্ড, সাইলেন্সার এবং ট্রিগার এক এক করে জোড়া লেগে গেল। সবশেষে রাইফেলের উপর ফিট করে নিল রানা টেলিস্কোপিক সাইট।

টেবিলের পিছনের একটা চেয়ারে বসে আছে রানা। সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাইফেলের ব্যারেলটা উপরের কুশনে বিশ্রাম নিচ্ছে। একটা চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা। অপর চোখটা কুঁচকে টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে তাকাল। জানালার নিচে একশো ত্রিশ মিটার দূরের রোদ ঝলমলে চৌরাস্তাটা লাফ দিয়ে চলে এল দৃষ্টি পথে। সাইটের রেখার উপর দিয়ে একটা লোকের মাথা চলে গেল। লোকটা এখনও মেহমানদের দাঁড়াবার জায়গা চিহ্নিত করছে। একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে লোকটা। ব্যারেলটা চুল পরিমাণ সরিয়ে লোকটাকে দৃষ্টিপথে নিয়ে এল রানা। মাথাটা বড় এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মস্ত একটা তরমুজের মত।

সন্তুষ্ট হয়ে টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। টেবিলের কিনারায় কার্তুজ তিনটে সাজিয়ে রাখল, এক লাইনে দাঁড়ানো তিনজন সুসজ্জিত সোলজার যেন ওরা। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে রাইফেলের বোল্টটাকে টেনে পিছু হটিয়ে দিল রানা, তারপর প্রথম শেলটা ঢোকাল ব্রীচে। এই একটা বুলেটই যথেষ্ট। তবু অতিরিক্ত দুটো সাথে রেখেছে ও। সামনে ঠেলে দিল বোল্টটাকে আবার, যতক্ষণ না কার্ট্রিজের গোড়ায় এসে জায়গা মত বসল। ঝট্ করে একটু মোচড় দিতেই লক্ হয়ে গেল সেটায়। সবশেষে অত্যন্ত সাবধানে কুশনের উপর রাইফেলটা রেখে সিগারেট আর লাইটারের জন্যে হাত ভরল পকেটে।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। হেলান দিল চেয়ারে। চোখের সামনে রিস্টওয়াচ তুলে সময় দেখল। এখনও পোনে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

দশ

ঘন ঘন পানি খেয়ে মস্ত ভুঁড়িটাকে আরও ফুলিয়ে তুলেছে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাঁ থেরি। কিন্তু তৃষ্ণা তবু মিটছে না। মরুভূমির মত সেই শুকনোই থেকে যাচ্ছে গলাটা। জীবনে এই বোধহয় প্রথম ভয়ে পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাবার দশা

হয়েছে তার। মনের ভিতর অবিরাম কে যেন বাজিয়ে চলেছে বিপদের ডঙ্কা। আজ বিকেলে কিছু একটা ঘটবে, এই আশঙ্কায় কাঁপছে বুকটা। কিন্তু কিভাবে, ঠিক কোথায়, কখন, কি ঘটবে তার কোন পূর্বাভাস বা সূত্র কোথাও দেখতে পাচ্ছে না সে।

নিজের প্রাণ যায় যাক—যদি মাসুদ রানাকে ধরতে না পারে সে, যাবেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, কাপু উ সেন বিপদগ্রস্ত। কোন সুযোগে রানা যদি তাঁর উপর আঘাত হানতে পারে···

এরপর কি ঘটবে ভাবতে পারে না জাঁ থেরি। ভাবতে গেলে শুধু শিউরে শিউরে ওঠে। সে ব্যর্থ হলে তার একার প্রাণ যাবে। কিন্তু কাপুর যদি কোন ক্ষতি হয় ইউনিয়ন কর্স তাকে তো খতম করবেই, খতম করবে তার সন্তানদের, তার স্ত্রীকে, ভাই-বোনদের—চোদ্দগুষ্টির কাউকে ছাড়বে না ওরা। ইউনিয়ন কর্সের দৃষ্টিতে ব্যর্থতার শাস্তি সমূলে নিশ্চিহ্ন করা।

আর্ক ডি ট্রায়াম্প, নটরডেম এবং মন্তভ্যালেরিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল জাঁ থেরি। কিছুই ঘটেনি। লাঞ্চের পর পুনঃ নির্বাচিত কাপু উ সেন-এর সুরক্ষিত দুর্গ-প্রাসাদের একটি কামরায় ইউনিয়ন কর্সের হাই অফিশিয়ালরা সংক্ষিপ্ত এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল। উত্তেজনা আর আতঙ্কবোধ এমনভাবে গ্রাস করেছে প্রত্যেককে, কথা বলার শক্তি পায়নি কেউ। সবাই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে মুখের চেহারায় স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে রাখতে। কিন্তু কারও পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। আতঙ্কিত, অসহায় পশুর মত দেখাচ্ছিল সবাইকে।

শুধু কর্নেল বোল্যান্ড কয়েকটা কথা বলল। প্রথমে জানাল, 'আর মাত্র একটি অনুষ্ঠান বাকি আছে। প্লেস দু এইটিন জুনে। গোটা এলাকা নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছে। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল থেকে তিন মাইলের মধ্যে চোখকান খোলা রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইউনিয়ন কর্সের চল্লিশ হাজার সশস্ত্র সদস্য। কর্সিকান নয় এমন কোন লোকের পক্ষে এদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনুষ্ঠানের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব নয়।'

'কাপুর গাড়ি যে-সব রাস্তা দিয়ে যাবে···'

জাঁ থেরির প্রশ্ন শেষ হলো না, কর্নেল বোল্যান্ড বলল, 'অনুষ্ঠানে পৌঁছুবার অনেকগুলো রাস্তা আছে, ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট একটা ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর দশ মিনিট আগে থাকতে সে-রাস্তা খালি করে দেয়া হবে। অনুষ্ঠান শুরুর পরও তাই। কিন্তু কাপুর গাড়ি সে-রাস্তা দিয়ে যাবে না। নিরাপত্তার খাতিরে অন্য একটা রাস্তা ব্যবহার করা হবে। যানবাহনের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে কাপু রওনা হবার সাথে সাথে। অনুষ্ঠানে পৌঁছুবার পাঁচটা রাস্তাতেই ইউনিয়ন কর্সের অসংখ্য লোকজন রয়েছে। এমন কি সবক'টা রাস্তায়, দু'পাশের দালানগুলোর ছাদে, জানালায় বিনকিউলার এবং রাইফেল হাতে পজিশন নিয়ে আছে তারা।'

একজনের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল বোল্যান্ড মাথা নিচু করল। গভীরভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করে জানাল, 'সে চলে গেছে—আমার বিশ্বাস। ভয়ে পালিয়েছে।

অবশ্য কেটে পড়াই তার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। কিন্তু যত গভীরেই ডুব দিক সে, যত দূরেই পালিয়ে যাক—কোথাও তাকে ভেসে উঠতে হবেই। তখন তার নিস্তার নেই।' এই বলে একটু হাসল সে, জাঁ থেরির কাঁধ চাপড়ে বলল। 'রানা যদি দেখা না দেয়, তোমার অবস্থা কি হবে?'

দেখা না দিলে কাপু কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানা নেই, ভাবছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাঁ থেরি, হয়তো রানাকে খুঁজে বের করার হুকুম দেবেন তাকে। কিন্তু দেখা দেবে না রানা একথা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। অবশ্য নিজের সন্দেহের কথা, উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেনি সে বৈঠকে। কেউই তা করেনি। অথচ সে জানে, কর্নেল বোল্যান্ডের কথায় আশ্বস্ত হয়নি কেউ। সবাই বুঝেছে, প্রলাপ বকছে কর্নেল।

একা একা বুলেভার্দ দে মন্তপারনেসের কাছে ঘুর ঘুর করছে জাঁ থেরি। ভিড়ের কিনারা ধরে হাঁটছে সে। দুশো মিটার দূরে অনুষ্ঠান। চৌরাস্তার এতদূর থেকে অনুষ্ঠানের কিছুই চাক্ষুষ করার উপায় নেই। তার মানে ভিড়ের ভিতর কোথাও নেই রানা। প্রত্যেক প্রহরীকে প্রশ্ন করছে সে। সকলের কাছ থেকে একই উত্তর পাচ্ছে—না, ব্যারিয়ারের ভিতর কাউকে ঢুকতে দেয়নি তারা।

প্রধান সড়ক, গলি, উপগলি···সব জায়গায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছাদে নজর রাখার নিখুঁত ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। শুধু স্টেশন পাহারাতেই রয়েছে চারশো লোক। সামনের চাতালের মুখোমুখি দালানগুলোর প্রতিটিতে সত্তর-আশি জন করে প্রহরী তৈরি হয়ে আছে। স্টেশনের এঞ্জিন শেডের মাথায়, প্ল্যাটফর্মের চূড়ায় শুয়ে আছে রাইফেলধারীরা।

একটা সাইড রোড ধরে রু দে রেনেসে ঢুকে পড়ল জাঁ থেরি।

'কাউকে দেখেছ?' পরিচয়পত্র দেখিয়ে ব্যারিয়ার টপকাল সে, প্রশ্ন করল প্রহরীকে।

'না, মশিয়ে,' সসম্ভ্রমে বলল প্রহরী।

'কাউকে আসতে দাওনি এপারে? কাউকে না?'

'না, মশিয়ে।'

'ঠিক মনে আছে? ভেবে দেখো, ভুল করছ না তো?'

'না, মশিয়ে। কেউ ঢোকেনি। কেউ ঢুকতে চায়নি বা চেষ্টা করেনি।'

'সাবধান! কোন অবস্থাতেই নিজেদের লোক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।' বলল জাঁ থেরি, 'কই, তোমার কার্ড দেখি?' প্রহরীর কাঁধের ব্যাজটা পরীক্ষা করে দেখল সে। তারপর কার্ডটা পরীক্ষা করল। 'জায়গা ছেড়ে নোড়ো না। চোখ কান খোলা রাখো।'

চৌরাস্তার দিকে ফিরে এগোতে যাবে, এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল। দূরে এক ঝাঁক সাদা মোটরসাইকেল দেখতে পাচ্ছে সে। পঁচিশ ত্রিশটার কম নয়। প্লেস দু এইটিন জুনে ঢুকছে ঝড়ের বেগে। বাঁক নিয়ে স্টেশনের সামনে চাতালের গেট পেরোচ্ছে। দু'ধারে দাঁড়ানো প্রহরীরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা ঠেকিয়ে, বিশাল কনভয়ের দিকে পিছন ফিরে।

উঁচু ছাদগুলোর দিকে তাকাল জাঁ থেরি। শাবাশ ভায়েরা! ছাদের প্রহরীরা কেউ নিচের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে নেই, সকলের দৃষ্টি উল্টো দিকের ছাদ আর জানালার দিকে।

রু দে রেনেসের পশ্চিম দিকে পৌঁছল জাঁ থেরি। একশো বত্রিশ নম্বর বাড়ির কাছে শেষ ব্যারিয়ার, সেখানে একজন যুবক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। কার্ড দেখাতেই সম্ভ্রমে মাথা নোয়াল প্রহরী।

'এদিক দিয়ে গেছে কেউ?'

'না, মশিয়ে,' বলল পেরি তেসিয়ার।

'কখন থেকে আছ তুমি এখানে?'

'বেলা বারোটা থেকে, মশিয়ে।'

'ব্যারিয়ারের এপারে কাউকে ঢুকতে দাওনি তুমি?'

'না, মশিয়ে।'

'ভুল করছ না তো? ঠিক মনে আছে? কেউ ঢোকেনি? ভেবে দেখে বলো। ভাল করে মনে করার চেষ্টা করো।'

ঘাবড়ে গেল তেসিয়ার। 'না, মশিয়ে··· কাউকে আমি ঢুকতে দেইনি···' হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বুড়োটার কথা। 'হ্যাঁ, মাত্র একজন পঙ্গুকে যেতে দিয়েছি। ওদিকেই থাকে সে।'

'পঙ্গু? কোন্ পঙ্গু? কে পঙ্গু?'

'একটা বুড়ো, মশিয়ে। প্রায় অচল একজন লোক। মহান কাপুর পদক পেয়েছে কয়েক বছর আগে। আমাদেরই লোক। তার কার্ডে কাপুর সীল এবং সইও আছে। এ গ্রেট কর্সিকান, লেখা আছে তাতে। ঢুকতে না দিয়ে কি করি, মশিয়ে—সাংঘাতিক অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে। নোংরা গ্রেটকোট পরে ছিল, চোখে ভাল দেখে না···'

'গ্রেটকোট?'

'জ্বী, মশিয়ে। খুব লম্বা আর ঢোলা গ্রেটকোট।'

দুই হাত শক্ত মুঠো হয়ে গেছে জাঁ থেরির।

'ত্রুটিটা কোথায় তার?' রুদ্ধশ্বাসে, কিন্তু যথাসম্ভব নিচু গলায় প্রশ্নটা করল সে।

'একটা পা নেই, মশিয়ে। টলমল করতে করতে হেঁটে এল; ক্রাচে ভর দিয়ে। একশো চুয়ান্ন নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে বলল···'

চৌরাস্তা থেকে ভেসে আসছে বাদ্যযন্ত্রের ছন্দবদ্ধ ঐকতান। তার সাথে কোরাস ধরেছে গায়করা। দুশো বছরের পুরানো গীতি কবিতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে নব অভিষিক্ত মহান কাপুর অপার মহিমা।

'ক্রাচ?' নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বিকৃত শোনাল জাঁ থেরির।

'জ্বী, মশিয়ে। খোঁড়া লোকেরা যে ধরনের ক্রাচ ব্যবহার করে। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি···'

টেনে চড় কষল জাঁ থেরি, পঞ্চাশ গজ দূর থেকেও শোনা গেল—চটাস। মাথা

ঘুরে পড়ে গেল পেরি তেসিয়ার। কংক্রিটের রাস্তার সাথে প্রচণ্ডভাবে ঠুকে গেল তার মাথা।

পেরির অবস্থা দেখার মত সময় নেই লেফটেন্যান্ট-কর্নেলের, রাস্তা ধরে উন্মাদের মত ছুটতে শুরু করেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ফলো মি, ইউ বাস্টার্ড!'

স্টেশনের সামনের ফাঁকা জায়গায় কয়েকশো যানবাহন সার সার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলোর ঠিক উল্টোদিকে একটা রেলিং, এই রেলিংটাই সামনের চাতাল এবং চৌরাস্তাকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। কাপু উ সেন-এর কাছ থেকে সম্মানজনক পদক গ্রহণ করে কৃতার্থ হবার জন্যে রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দশজন প্রৌঢ় কর্সিকান। চাতালের পুব দিকে উপস্থিত রয়েছে ইউনিয়ন কর্সের হাই অফিশিয়ালরা। চারকোল গ্রে-রঙের স্যুটের বিশাল একটা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেন ওখানে। তার মাঝখানে গোলাপের মত ফুটে আছে লাল ব্যাজগুলো। চাতালের পশ্চিম দিকে রঙচঙে ইউনিফর্ম পরা বাদ্যযন্ত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে। গোটা চাতালটাকে কয়েক দফায় ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র প্রহরীরা গায়ে গা ঠেকিয়ে।

রাইফেল তুলে এক চোখ বুজে টেলিস্কোপিক সাইটে দৃষ্টি রাখল রানা। পদক গ্রহণ করার জন্যে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের লোকটাকে বেছে নিল ও। বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা একজন কর্সিকান, শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, ফুলে উঠেছে বুকটা। টেলিস্কোপিক সাইটে তার মাথাটা পুরোপুরি এবং পরিষ্কারভাবে ধরা দিল। আর ক'মিনিট পরই এই লোকটার সামনে এর চেয়ে আরও এক ফিট লম্বা লোক, উ সেন, এসে দাঁড়াবে।

বুম-বা-বুম! উদ্দাম গতিতে বেজে ইউনিয়ন কর্সের দলীয় সঙ্গীত থেমে গেল। অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল বিশাল চৌরাস্তায়। কয়েক হাজার মানুষকে দেখতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু একচুল নড়াচড়া চোখে পড়ছে না কোথাও। অকস্মাৎ কমান্ডার অভ দি গার্ডের কর্কশ গর্জন চুরমার করে দিল অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে। 'জেনারেল স্যালুট···প্রে-জে-এ-ন্ট আর্মস!' সশস্ত্র কর্সিকান গার্ডদের সাদা দস্তানা পরা হাতগুলো বিদ্যুৎবেগে শরীরের পাশ থেকে উঠে এসে কাত হয়ে কাঁধে ঠেকে থাকা যার যার রাইফেলটাকে উপর দিকে খাড়া করে ধরল, তারপর ঝট করে নামিয়ে আনল খাড়াভাবে নাকের পাশে, একই সাথে একযোগে জোড়া লেগে গেল প্রত্যেকের পা, খটাস করে শব্দ হলো একটা।

সামনের ভিড়টা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে অস্বাভাবিক লম্বা একজন লোক। অদ্ভুত যান্ত্রিক কিন্তু দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে সে রেলিংয়ের দিকে। পিঠটা খাড়া হয়ে আছে। হাঁটছে, কিন্তু হাঁটার দোলায় কাঁধ দুটো একচুল এদিক-ওদিক নড়ছে না বা উঁচু-নিচু হচ্ছে না। গর্বোদ্ধত একটা ভাব ফুটে আছে তার চেহারায়। গাঢ় রঙিন চশমার ভিতর চোখ নেই, পাথর। ব্রেস্ট পকেট থেকে সরু একটা তার কানে গিয়ে ঢুকেছে। সাউন্ড ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ শুনছে সে, তা থেকেই জেনে যাচ্ছে নিজের চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে।

রেলিং থেকে আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে উ সেন। এই সময় তাকে ঘিরে অগ্রসরমান দেহরক্ষী, কর্নেল বোল্যান্ড এবং হাই অফিশিয়ালদেরকে উদ্দেশ্য করে অধৈর্যের সাথে একটা হাত নাড়ল সে, তার ঠোঁট দুটোও নড়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে।

হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। কাপু সবাইকে আর এক পা-ও তার সাথে যেতে নিষেধ করছেন। এভাবে ঘেরাও হয়ে থাকা পছন্দ নয় তাঁর। কিন্তু সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠল কর্নেল বোল্যান্ড। কাপুর নির্দেশ অমান্য করে তাঁর পাশে রয়ে গেল সে। এবং ইঙ্গিত করল দেহরক্ষীদের তারা যেন একটু দূরত্ব বজায় রেখে কাপুকে ঘিরে থাকে।

উ সেন-এর কাছ থেকে দশ ফুট পিছিয়ে গেল দীর্ঘদেহী দেহরক্ষীরা।

রেলিংয়ের কাছে একজন হাই অফিশিয়াল একটা ভেলভেটের কুশন হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে। কুশনে এক সারিতে সাজানো রয়েছে ধাতব পদার্থের তৈরি দশটা মেডেল এবং দশটা রঙিন রিবন।

এগিয়ে আসছে কাপু উ-সেন।

ছুটে এসে ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাঁ থেরি। হাঁপাচ্ছে সে। মুখ তুলে বাড়ির নাম্বার দেখল। একশো চুয়ান্ন। পিছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনে বুঝল প্রহরী অনুসরণ করছে তাকে। কিন্তু তার এসে পৌঁছবার অপেক্ষায় না থেকে ফ্ল্যাটবাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল সে। প্রতি লাফে সিঁড়ির তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে উপরে।

তিন তলায় উঠে জাঁ থেরি নিচের দিকে তাকাল। পায়ের শব্দ পাচ্ছে সে, কিন্তু প্রহরীকে দেখতে পাচ্ছে না। 'টপ ফ্লোরে এসো!' বলেই উঠতে শুরু করল আবার। এক ঝটকায় কোটের বোতাম খুলে শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে আনল সে রিভলভারটা।

সারির প্রথম লোকটার সামনে দাঁড়াল কাপু। পাশ থেকে কর্নেল বোল্যান্ড ব্যাখ্যা করছে, লোকটার বীরত্ব আর কীর্তির কথা। কর্নেল বোল্যান্ড থামতে সরাসরি লোকটার দিকে মুখ তুলল উ সেন। একবার আধইঞ্চি উঁচু-নিচু করল মাথাটা। 'তুমি আমাদের গর্ব,' প্রশান্ত, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে। শরীরের পাশ থেকে একটা সুদীর্ঘ হাত উঠে এল কুশন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাই অফিশিয়ালের দিকে। তার হাতে একটা মেডেল তুলে দিল অফিসার। মৃদু, মধুর সুরে বেজে উঠল যন্ত্র সঙ্গীত। 'কাপু দীর্ঘজীবী হোন, আমরা যেন তাঁর নির্দেশে প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হই'—কর্সিকানদের প্রিয় সঙ্গীতের সুরে দুলে উঠল নিস্তব্ধ পরিবেশটা। বয়স্ক কর্সিকানের বুকে মেডেলটা গেঁথে দিল কাপু। এরপর সে পিছিয়ে এল স্যালুট করার জন্যে।

ছয় তলার উপরে এবং একশো ত্রিশ মিটার দূরে অত্যন্ত যত্নের সাথে, সাবধানে রাইফেলটাকে স্থির করে ধরে রেখে টেলিস্কোপিক সাইট দিয়ে তাকাল রানা।

চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। রোদ লেগে চকচক করছে উ-সেন-এর মস্ত কপাল। গাঢ় সবুজ চশমাটার ফ্রেম, হাতল সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কার্নিসওয়ালা টুপিটা রয়েছে তার মাথায়। স্যালুট করতে উদ্যত হাতটা নড়ে উঠল। ঝট্ করে উঠে গেল সেটা টুপির কার্নিসের কাছে। সাইটের ক্রস চিহ্নের মাঝখানটায় রয়েছে উ সেন-এর উন্মুক্ত কপালের একটা পাশ। মৃদু, আলতোভাবে ট্রিগার টিপল রানা···

পাঁচতলায় উঠে ঘাবড়ে গেল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাঁ থেরি। শেষ পর্যন্ত বোধহয় মাসুদ রানাকে ঠেকানো গেল না। কথাটা মনে হতেই আশ্চর্য দুর্বল হয়ে পড়ল তার শরীর। সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে, মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, ছয়তলায় কোন দিন সম্ভব হবে না ওঠা···

কিন্তু এখনও কিছু ঘটেনি। হয়তো এক সেকেন্ড সময় পাবে সে শেষ রক্ষার। কথাটা মনে হতেই আবার ছুটল সে। এটাই শেষ সিঁড়ি, তারপরই ছয়তলা···

ট্রিগার টানার পর এক সেকেন্ড পেরিয়ে গেছে। নিচে, স্টেশনের সামনে চাতালের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে রানা, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। ব্যারেলের শেষ প্রান্ত থেকে বুলেটটা বেরিয়ে যাবার আগেই ইউনিয়ন কর্সের কাপু কোনরকম আগাম আভাস না দিয়েই ঝট্ করে নামিয়ে নিয়েছে মাথা। চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছে রানা, সামনে দাঁড়ানো প্রৌঢ় কর্সিকানের গালে একটা চুমো খাচ্ছে সে। লোকটার চেয়ে উ সেন এক ফুট বেশি লম্বা, তাই রীতি অনুযায়ী চুমো দেয়ার জন্যে ঘাড়, পিঠ সহ মাথা নিচু করতে হয়েছে তাকে।

মাথাটা যখন নিচের দিকে নামছে সেই সময় মাথার সিকি ইঞ্চি পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা, অনুমান করল রানা। বাতাস কেটে বুলেটের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ উ সেন পেয়েছে কিনা বুঝতে পারল না ও। শুনতে যদি পেয়েও থাকে, তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কর্নেল বোল্যান্ড, হাই অফিশিয়াল এবং সার দিয়ে দাঁড়ানো প্রৌঢ় কর্সিকানরা কিছুই শুনতে পায়নি বা টের পায়নি। দশ ফুটের বাইরে দাঁড়ানো দেহ রক্ষীরা বা পঞ্চাশ মিটার দূরে অপেক্ষমাণ কর্সিকানরাও বুঝতে পারেনি কিছু।

রোদ লেগে নরম হয়ে থাকা চাতালের পিচ ফুটো করে ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে বুলেটটা, এক ইঞ্চি গভীরে ঢুকে বিস্ফোরিত হয়েছে। একই সুর এবং তাল বজায় রেখে বেজেই চলেছে যন্ত্র-সঙ্গীত। প্রৌঢ়ের দ্বিতীয় গালে চুমো খেয়ে সিধে হলো উ সেন, গোটা শরীর নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, এগোল দু'পা, তারপর আবার পুরো শরীর ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো দ্বিতীয় কর্সিকানের।

রাইফেলের পিছনে বসে মুচকি হাসল রানা। অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা কয়েক সেকেন্ড আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে উ সেন-এর। এর আগে টার্গেট প্র্যাকটিসের সময় একশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্বের স্থির কোন লক্ষ্যকে ভেদ করতে ব্যর্থ হয়নি ও। তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু উ সেনের বেলায় কাণ্ডটা ঘটল। মন খারাপ করার

কিছু নেই, নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে, সময় আছে এখনও। রাইফেলের ব্রীচ খুলল রানা। খোলার সাথেই ব্যবহৃত কার্ট্রিজটা পড়ল কার্পেটে। টেবিল থেকে দ্বিতীয় শেলটা তুলে নিল ও। জায়গা মত সেটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ করল ব্রীচ।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছয়তলায় পৌঁছল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাঁ থেরি। বুকের ভিতর থেকে পাঁজরের খাঁচা ভেঙে হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন তার। দালানটার সামনের দিকে দুটো ফ্ল্যাট। দুটো দরজার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাচ্ছে সে। দুটোর একটার ভিতর আছে মাসুদ রানা···ভাবছে সে, কিন্তু কোনটার ভিতর? ইতস্তত করছে, এমন সময় 'পুট্' করে মৃদু শব্দ কানে ঢুকল।

এক লাফে কিছুটা পিছিয়ে এল জাঁ থেরি। শব্দটা ডান পাশের কামরা থেকে এসেছে। হতভম্ব হয়ে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে। পরমুহূর্তে রিভলভারটা কোমরের কাছে তুলে গুলি করল তালার ফুটো লক্ষ্য করে। কাঠের আর পিতলের কণা ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে, কেঁপে কেঁপে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে দরজার কপাট দুটো।

পিছনে পায়ের শব্দ। কিন্তু অপেক্ষা না করে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল জাঁ থেরি।

একটা নয়, লোকটার দুটো পা। গায়ে গ্রেটকোটটা নেই এখন। বগলের সাথে যেভাবে শক্ত করে চেপে ধরে আছে রাইফেলটা, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না জাঁ থেরির, এ লোক শক্তিশালী যুবক, অসুস্থ বুড়ো নয়। হতভম্ব হয়ে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে। টেবিলের পিছন থেকে ওঠার সাথেই সাবলীল ভঙ্গিতে আধপাক ঘুরে গিয়ে কোমরের কাছ থেকে গুলি করল রানা। এক নজরেই চিনতে পেরেছে সে সালমার হত্যাকারীকে। ও যখন ঘুরছে, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা জাঁ থেরির। নিজের ভুলটা বুঝতে পারল সে। গুলি করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু ট্রিগারে আঙুল চেপে বসার আগেই বুকের এক পাশে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল সে।

কোন শব্দই করেনি বুলেটটা। ভিতরে ঢুকেই বিস্ফোরিত হলো সেটা। কাটাকুটি, ছেঁড়াছিঁড়ি এবং অকস্মাৎ প্রচণ্ড ব্যথার একটা তীব্র অনুভূতি গ্রাস করল জাঁ থেরিকে। পরমুহূর্তে তাও দূর হয়ে গেল। দেখতে পেল, এক টুকরো কার্পেট স্যাৎ করে উঠে এসে বাড়ি মারল তার মুখে। আসলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে সে কার্পেটের উপর। সেই সাথে তার খোলা চোখের সামনে থেকে দপ্ করে নিভে গেছে সব আলো।

জানালার দিকে ফিরল রানা। এক পা পিছিয়ে এসে তৃতীয় লোকটাকে স্যালুট করছে উ সেন। ছোঁ মেরে তৃতীয় এবং শেষ বুলেটটা টেবিল থেকে তুলে নিল রানা। রাইফেলে ভরল সেটা। পা বাধিয়ে টেনে আনল চেয়ারটাকে সামনে। সেটার উপর একটা পা তুলে দিয়ে শরীরটাকে স্থির করল, তারপর রাইফেল তুলে চোখ রাখল টেলিস্কোপিক সাইটে।

পায়ের শব্দ পাচ্ছে রানা। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। দেখতে পাচ্ছে, মৃদু হাসি লেগে রয়েছে উ সেন-এর ঠোঁটে। কপালের পাশে ছোট্ট একটা কালো তিল দেখা

যাচ্ছে। সাইটের ক্রস চিহ্নের মাঝখানটা সেটার উপর রেখে লক্ষ্য স্থির করল ও। চতুর্থ কর্সিকানের গালে চুমো খাচ্ছে উ সেন। প্রথমে বাঁ গালে। তারপর ডান গালে। পায়ের শব্দটা পাচ্ছে রানা, এখন আরও কাছে এসে পড়েছে।

সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে উ সেন। সিধে হয়েছে। শব্দটার কথা ভুলে থাকতে চাইছে রানা। ভুলে গেল। তারপর টিপে দিল ট্রিগার।

মাথার উপর খাড়াভাবে উঠে গেল উ সেনের দুটো হাত। কপালের পাশে এইমাত্র তৈরি হওয়া কালো গর্তটা ঢাকা পড়ে গেল একটা হাতের আড়ালে। পাক খাচ্ছে শরীরটা। কিন্তু আধ পাক ঘোরার আগেই কাত হয়ে গেল একদিকে। সটান আছাড় খেল সে চাতালের শক্ত মেঝেতে। মাথার ভিতর বিস্ফোরণের ফলে ফেটে গেছে টুপিতে ঢাকা মাথার খুলি। টুপির তলা থেকে নেমে আসছে হলদেটে মগজ।

চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেছে। থেমে গেছে বাদ্যযন্ত্রগুলো। চোখে দেখেও ঠিক কি ঘটেছে বুঝে নিতে পারছে না কেউ এখনও। পরমুহূর্তে নড়ে উঠল বিশাল এলাকা জোড়া ভিড়টা। গর্জন, ছুটোছুটি—নরক গুলজার হয়ে উঠল। গুলিটা কোন্‌দিক থেকে এসেছে আঁচ করে নিয়ে সব ক'টা মুখ ফিরল ছয়তলা দালানটার দিকে। কয়েক সেকেন্ড বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খোলা অন্ধকার জানালার দিকে। তারপর দুলে উঠল যার যার অস্ত্র হাতে ভিড়টা। ছুটে আসছে সবাই দালানটার দিকে। সবার আগে কর্নেল বোল্যান্ড।

চরকির মত ঘুরেই ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা জাঁ থেরির পাশে, খপ্‌ করে তার রিভলভারটা তুলে নিয়েই লক্ষ্য স্থির করল খোলা দরজার দিকে। এক সেকেন্ড পর দরজায় এসে দাঁড়াল একজন।

ট্রিগার টিপতে গিয়েও টিপল না রানা। ছোটখাট একজন লোককে দেখতে পাচ্ছে ও। দু'হাত দিয়ে ধরে আছে একটা সাবমেশিনগান। হাঁপাচ্ছে এখনও। মেহেদী রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মুখে।

চিনতে পারল রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মশিয়ে ক্লড র‍্যাবো।'

'মশিয়ে মাসুদ রানা,' বললেন ক্লড র‍্যাবো।

'আমাকে চিনলেন কিভাবে?'

'রূপা এখন আমার বাড়িতে,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ক্লড র‍্যাবো। 'উ সেন…?'

'শেষ। কিন্তু আপনি এখানে?'

'জাঁ থেরিকে অনুসরণ করে।'

ক্লড র‍্যাবোর কপাল লক্ষ্য করে ধরে আছে রিভলভারটা রানা। 'মশিয়ে, হাতের ওটা এবার ফেলে দিন।'

মুচকি হাসলেন ক্লড র‍্যাবো। বাঁ হাতে সাবমেশিনগানটা উল্টো করে ধরে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, 'আপনার কাজে লাগতে পারে।'

'ধন্যবাদ, লাগবে না। ফ্রেঞ্চ প্রশাসন কি তাহলে…'

'চোখ খুলে গেছে আমাদের,' বললেন ক্লড র‍্যাবো। 'ইউনিয়ন কর্স এতটা বেড়ে গেছে, জানা ছিল না আমাদের। আমি মনে করি, আত্মরক্ষার জন্যে আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। কংগ্রাচুলেশনস্‌!' চোখে চোখ রেখে দুই গোয়েন্দা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তিন সেকেন্ড। রিভলভারটা পকেটে ভরে ডান

হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হাত রাখলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তচরের হাতে। মৃদু হেসে বললেন ক্লড র‍্যাঁবো, 'আপনার কাজ শেষ, কিন্তু আমাদের কাজ সবে শুরু হলো।'

'মানে?'

'মাথাটাকে কেটে ফেলে দিয়েছেন আপনি, এবার গাছের ডালপালা আর শিকড়গুলো ধ্বংস করব আমরা।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ক্লড র‍্যাঁবো। 'দেরি করিয়ে দিচ্ছি...এক্ষুণি আপনার পালানো দরকার...'

মুচকি হাসল রানা, বলল, 'আপনারও। এখানে এই অবস্থায় ধরতে পারলে চার হাত-পা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে ওরা আপনাকে।'

'জানি। পালাবার পথও ভেবে রেখেছি। আসুন আমার সাথে।'

'নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনার চেয়ে আমার পথটা বেশি নিরাপদ,' বলল রানা।

হেসে ফেললেন ক্লড র‍্যাঁবো। বললেন, 'মানি। এ কদিন যা খেলা দেখিয়েছেন...পালাবার ব্যাপারে আপনার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। তবে, এই মুহূর্তে সারা প্যারিসে একমাত্র আমিই দিতে পারি আপনাকে নিরাপদ আশ্রয়। চলুন। পথ দেখান।'

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে রানা।

পিছনে ক্লড র‍্যাঁবো।

***

মাসুদ রানা

সেই উ সেন

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

কোন্ উ সেন?
সেই যে বার্মায় রানার কাছে হেরে গিয়ে
ক্রোধোন্মত্ত এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু শপথ নিয়েছিল—
'মাসুদ রানা। তুমি মস্ত ক্ষতি করলে আমার।
বাঁচতে পারবে না তুমি আমার হাত থেকে।
প্রস্তুত থেকো, আজ হোক, কাল হোক,
দশ বছর পরে হোক—প্রতিশোধ নেব আমি।' [রক্তের রঙ-২]
—মনে আছে?
এতদিন পর সেই প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে
দুর্ধর্ষ গুপ্ত-সংগঠন ইউনিয়ন কর্সের সর্বাধিনায়ক কাপু—
সেই উ সেন।

মাসুদ রানার বিরুদ্ধে এটা তার ব্যক্তিগত আক্রোশ।
পর পর ছয়বার আক্রান্ত হয়ে
শেষে মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০